ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com
তৃতীয় বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা □ জুলাই ২০১৪ □ ৩০ টাকা

Read Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

সুকুমারীস্মরণ
তাঁর সাম্প্রতিক
চারটি নিবন্ধ সংকলন

সমীর সেনগুপ্ত স্মরণে
সুধীর চক্রবর্তী। দময়ন্তী বসু সিং
অনিল আচার্য। কালীকৃষ্ণ গুহ

স্বগত
সমীর সেনগুপ্ত

বটের ঝুরি
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে
লেখা চিঠি:
• আবু সয়ীদ আইয়ুব
• অমিয় চক্রবর্তী
• নীহাররঞ্জন রায়

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

ছোট মানুষের শেক্সপিয়র
মিহির ভট্টাচার্য

ধারাবাহিক উপন্যাস
জাহাজঘাটা
হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি
অনুবাদ: তরুণ ঘটক

রাজ্যপাট
সুব্রত মুখোপাধ্যায়

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক
ছিন্নবিচিন্তা

কালীকৃষ্ণ গুহর কলমে
গ্রিক কথামৃত

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণপথের পাঁচালি

কেন লিখি
বাণী বসু
কালীকৃষ্ণ গুহ
সাধন চট্টোপাধ্যায়
শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ট্রিট লেন বাই-লেন

রজতশুভ্র মজুমদারের কবিতা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সেকালের কবিতা। চণ্ডীমণ্ডপ: ঝগড়ার ম্যারাথন। ক্ষণের বচন। শব্দবক্র

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান
অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস।
নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।
₹২০০
Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
www.bhraman.com
ছেলেবেলা
www.echhelebela.com
কালের কষ্টিপাথর
www.ekashtipathar.com
স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি
বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময়
তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
₹১২০
নতুন কিশোর উপন্যাস
গরিলার চোখ ₹৮০
শাদা ঘোড়া ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
সপ্তম মুদ্রণ ₹৭০
গৌর
যাযাবর
পরিবর্ধিত
নতুন
সংস্করণ ₹১২০
লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০
কানাইলাল চক্রবর্তীর
চলো দেখে আসি ₹২০
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০
মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
সিডি হীরু ডাকাত বই
অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে
জমজমাট
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
হীরু ডাকাত
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়। ₹৯৯
পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ
করা ডাকাতের গল্প
শিশুসাহিত্যে জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৯ম মুদ্রণ ₹৪৫
স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
১ম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫
কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০
আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com
আমাদের সব বই
সব পত্রিকা ও
হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম
চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি
আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০
এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া।
সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান।
অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।
স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in
স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 Fax: 2287 6448 E-mail: info@swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

স্টলে প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে অর্ধেক দামে

এবার ঘরে বসে
অর্ধেক দামে নিয়মিত
পত্রিকা পেতে গ্রাহক হোন

নীচের নামে ও ঠিকানায়
১৮০ টাকার চেক পাঠান

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

অনলাইন গ্রাহক হতে লগ অন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in
Editor's Website: www.amarendrachakravorty.com

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

₹২০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

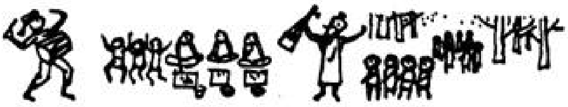

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

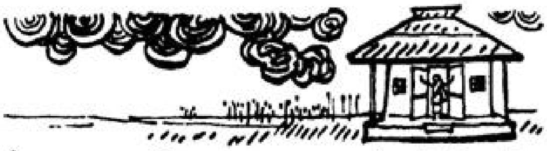

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

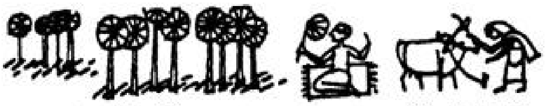

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

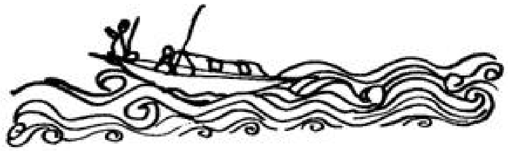

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, *বলাকা বুক স্টল* (কলেজ স্ট্রিট), *স্টার মার্ক*-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

তৃতীয় বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। জুলাই ২০১৪। শ্রাবণ ১৪২১

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৭

ক্ষণের বচন ১০। শব্দবক্র ১০

চণ্ডীমণ্ডপ। ঝগড়ার ম্যারাথন। চণ্ডী লাহিড়ী ৯

স্ম র ণ

সুকুমারীস্মরণ ১৩

চারটি নিবন্ধ। সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৬

● পারস্পরিক সাহায্যের অভাবে দাম্পত্যে চিড় ● সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর জীবনেই বেশি প্রয়োজনীয় ● বিবাহের বহু বিকল্প নিয়ে চলছে পরীক্ষা ● অধিকার জানা, বোঝা ও হাতে পাওয়া খুব জরুরি

সমীর স্মরণে ৫১

● বন্ধু, রহো রহো সাথে । সুধীর চক্রবর্তী ● সমীর, স্বজনেষু । দময়ন্তী বসু সিং
● সমীর সেনগুপ্তর জীবননামা । অনিল আচার্য
● ভেঙে-যাওয়া আসরের সামনে দাঁড়িয়ে । কালীকৃষ্ণ গুহ

নি য় মি ত

বটের ঝুরি ২১

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা নানা গুণীজনের চিঠি। সংকলন ও টীকা: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

আত্মজীবনী

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৪০

গ্রিক কথামৃত। কালীকৃষ্ণ গুহ ১১

ছিন্নবিচিন্তা । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩
কুমারটুলি স্ট্রিট

বি শে ষ র চ না

ছোট মানুষের শেক্সপিয়র। মিহির ভট্টাচার্য ৩১

কেন লিখি ৭৭

বাণী বসু ● কালীকৃষ্ণ গুহ ● সাধন চট্টোপাধ্যায় ● শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

ক বি তা র পা তা

রজতশুভ্র মজুমদারের চারটি কবিতা ৬৬

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সেকালের কবিতা ৬৯

ভ্র ম ণ প থে র পাঁ চা লি

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৬৫

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি। জাহাজঘাটা ৩৩
অনুবাদ: তরুণ ঘটক

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৪৯

অ ন্যা ন্য

পাঠকের চিঠি ৭১

প্রচ্ছদের ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এই সংখ্যায় 'বই-ঠেক' অনিবার্য কারণে প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে যথারীতি।

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** *সংগীত ও পরিচালনা:* **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার** *গান:* **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹৯৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত
বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।
₹২০০

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: info@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

শ্রাবণ ১৪২১ ◻ জুলাই ২০১৪

স ম্পা দ কী য়

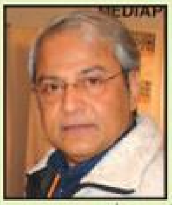

জীবনের সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা, সময়ের তরঙ্গভঙ্গ, সমাজের আলো-আঁধার— যখন লেখকের মনবাস থেকে মুক্তি চায়, কলমের ডগায় ভর করে এক অমোঘ ভাষাস্পন্দন, লেখক তখন সত্য বই মিথ্যা বলার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারায়।

এখানেই একটা প্রশ্ন ওঠে। সত্য কী? মিথ্যা কী? কিংবা, কোনটা কত দূর সত্যি, কোনটা কতটা মিথ্যে?

জলবিছুটির পাতা গায়ে লাগলে গা জ্বলে, জলবিছুটি সম্পর্কে এইটুকুই ধ্রুব সত্যি বলে জানি। কারও কোনও গল্প-উপন্যাসে বা হয়তো কবিতার চিত্রকল্পে এই শব্দটির এমন ব্যবহার খুঁজলে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

কয়েক মাস আগে উত্তরবঙ্গের নেওড়া উপত্যকায় কোলাখামের ঘোর জঙ্গলে জলবিছুটির আর একটা পরিচয় পাওয়া গেল।

সেখানে জঙ্গলভরা বিছুটিগাছ। এক-একটা গাছ বিছুটিফুলে সালংকারা কন্যার মতো সেজে আছে। শুনলাম ওই ফুল নাকি উচ্চ রক্তচাপের অব্যর্থ ওষুধ। ওখানকার পাহাড়ি জঙ্গলের বাসিন্দারা যুগ যুগ ধরে বিছুটিফুলের এই ধ্রুব সত্যিটা জানে, মানে ও ব্যাধিতে ব্যবহার করে। যথারীতি উপকার পায়। আমিও দু'দিন দু'বেলা থোকা থোকা বিছুটিফুলের বাটিভরা স্যুপ খেয়ে কলকাতায় ফিরে দেখলাম জঙ্গলের পাহাড়ি মানুষের কথাটা সত্যি।

গল্পে-উপন্যাসে কোনও চরিত্র যদি জঙ্গলে যায়, কিংবা সন্দেহবাতিক নিষ্ঠুর স্বামী যদি দুর্বলস্বভাব অবলা পত্নীকে জঙ্গলে ভ্রমণছলে ছেড়ে আসে, সেই জঙ্গলে লেখক কল্পনায় বিছুটিগাছ এনে ফেললে জঙ্গলযাত্রী বা নির্বাসিতার যন্ত্রণার ষোলকলা পূর্ণ করবেনই তিনি। বিছুটিফুলের ওষধিগুণ তাঁর গল্পের গতি-প্রকৃতিতে এক চিলতে ছায়াও ফেলতে পারবে না।

এযুগের এক বিস্ময়কর ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় এক সময়ের নকশাল নেতা বিশ্বনাথের জীবন নিয়ে বা তাঁর জীবনের ছন্দকাঠামো ব্যবহার করে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন। জেল ভেঙে পলাতক বিশ্বনাথ অনেক দিন পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাসপাতালে যখন পুলিশবেষ্টিত দীর্ঘকালীন চিকিৎসাধীন বন্দীজীবন কাটাচ্ছেন, তখন আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু দেবেশ রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, তখনকার হোম সেক্রেটারি, আমাদের সাহিত্যানুরাগী রথীনদা অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের হস্তক্ষেপে আমিই শুধু বিশ্বনাথের সঙ্গে সাপ্তাহিক দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলাম। তার কারণ, বিশ্বনাথ আমার ছোট ভাই। বাইরের কারওর সেখানে যাবার অনুমতি নেই।

তাঁর নতুন উপন্যাস লেখার জন্য বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর কথা বলা কতটাই দরকার সে-বিষয়ে দেবেশ রায় আমাকে বিস্তর বুঝিয়েছিলেন মনে আছে। আমি তাঁর তিস্তাপারের ভক্ত আগেই ছিলাম, এবার তাঁর লেখার জন্য জীবিত কারও সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় তাঁর তথ্য-নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টায় দেবেশ রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় আগাগোড়া অসম্মত কর্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করেছিলাম।

এই তথ্য জানাতে এই লেখা নয়। মূল তথ্যের প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় খুব সংক্ষেপে এর উল্লেখ করা হল।

তথ্যটি হল, বিশ্বনাথের জীবনতরঙ্গ নির্ভর যে উপন্যাসটি দেবেশ রায় লিখেছিলেন, এই মুহূর্তে তার নাম মনে পড়ছে না, তার এক জায়গায় আছে বিশ্বনাথের দাদা ফণীভূষণ বা হয়তো শশীভূষণবাবু জীবনবিমার এজেন্ট বা করণিক, তেঘরিয়া বা বেলঘরিয়ায় কী একটা আবাসনে ছোট একটা ফ্ল্যাট কিনে বাস করেন। ঘটনা হল, শাদা ঘোড়া, হীরুডাকাতের লেখক, বিশ্বনাথের দাদার কখনও কোনও সরকারি চাকরি করার সৌভাগ্য হয়নি।

এখানে সত্য-মিথ্যার নির্বিচার ব্যবহার। মূল চরিত্রের পুরো নাম যেহেতু কাল্পনিক নয়, বাস্তব, অর্থাৎ পুরোটাই আসল, তখন তার দাদার নাম ও পেশার কাল্পনিক ব্যবহার কতদূর সংগত? সাহিত্যগুণ যদি ক্ষুণ্ণ না হয়ে থাকে সেটা একটা বড় যুক্তি নিশ্চয়ই, কিন্তু বাস্তব নাম পরিচয়ের খণ্ডিত প্রয়োগ কতদূর অনিবার্য সেটাও বোধহয় একটা বিচারসূত্র হওয়া উচিত। এ প্রশ্ন কখনও লেখকের কাছে তুলিনি, কিন্তু পাঠকমনের এই সংশয়ও কী ভোলবার! ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান আর লেখকের কল্পনার অবদানের সঙ্গে এর তুলনা টানা যায় না।

সাহিত্যের আগে, সমাজের দিক থেকে দেখলে আজকাল সত্যের মুখোশে ঢাকা মিথ্যার বড়ই রমরমা। দেখতে বা শুনতে সত্যের মতো, কিন্তু আদপে সত্য নয়, ওপরে সত্যের আলখাল্লা, আমাদের চারপাশেই এর ভুরি ভুরি নজির।

সত্যি কিন্তু সত্যি নয়, মিথ্যা তবু মিথ্যা নয়— মানুষের সমাজে সাহিত্যে প্রেমে বা পুরাণে এমন দৃষ্টান্ত অনেক।

মনে হয় না কি যে লেখবার সময় আমাদের জলবিছুটির অসহ্য জ্বালাও জানতে হবে, তার অব্যর্থ ওষধিগুণও জানা দরকার? অ্যারিস্টটলীয় 'হয় এটা, নয় ওটা', এই 'হয় অথবা নয়' আমাদের একদিন একচক্ষু হরিণের মতো সত্যের আধখানা মাত্র দেখাবে না তো? দলীয় রাজনীতিতে এই লক্ষণ ক্রমবর্ধমান, সেই রাজনীতির যাবতীয় প্রচল, এমনকী প্রলাপ সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করলেও লেখককে সত্য বুঝে নিতে হয় সত্য-মিথ্যার নিরন্তর প্রতিতুলনায়। এমনও কি মনে হয় না যে সমাজযাপনের সত্য জানতে সংবাদের চেয়েও সাহিত্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি
ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে,
'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে
গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি
পেতে যে এলেম দরকার
আমার তা নেই।
প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার
চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব
দেরি ক'রে ফেলেছি। কী
করব, আমাদের বয়সকালে
তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি।
স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ
ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার
স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো
একবার কপাল ঠুকে দেখা
যেতে পারে। তার চেয়েও বড়
কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে
কাজ না দিলেও অনেক কিছু
শেখায় পড়ায়।

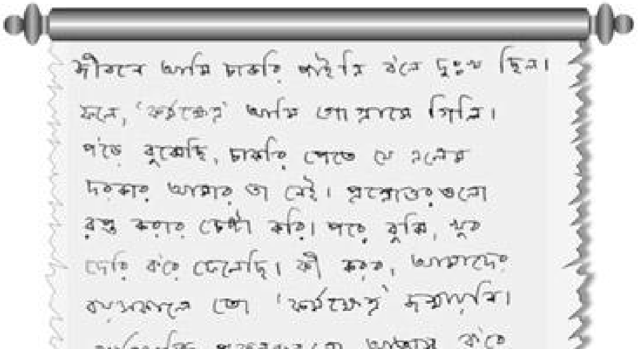

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র : www.ekarmakshetra.com

চণ্ডীমণ্ডপ

ঝগড়ার ম্যারাথন

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ দেখার লোভে দর্শকেরা ঝুঁকি নিয়ে গাছের মাথায় উঠে দেখে এবং নিজ নিজ টিমকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু নিছক ঝগড়া দেখার লোভে পুকুর পাড়ের গাছে সূর্য ওঠার আগেই হাউসফুল নোটিস ঝুলে যায়— এমন দৃশ্য এখন আর দেখা যায় না। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে নদিয়ার এক গ্রামে এমন দৃশ্য দেখেছি। দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপারটা স্বীকৃত নিয়ম হলেও দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যেও নিশ্চয় ছিল। দারিদ্র তো জাত মেনে আসে না।

সকালে পুকুরে কাপড় কাচা, হাঁস চড়ানো এবং জমিতে জল সেচন নিয়ে নান্দীপাঠ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া কোনও পক্ষই হার মানার পাত্র নয়। ঝগড়ায় হেরে গেলে গ্রাম বাংলার পরিবেশে প্রেস্টিজ পাংচার। ঝগড়ার দু-পক্ষই জানে, পুকুরের মালিকানা জমিদারের এবং ছোটলোকদের সামান্য পুকুরের জল নিয়ে ঝগড়ায় নাক গলানো আভিজাত্য বিরোধী। আমার বাবা জমিদারের নায়েব। জমিদারের মাপ ছোট, ততোধিক নগন্য তাঁর ম্যানেজার। বালক আমি নিজে দু-চোখে কৌতূহল নিয়ে যখন দেখতে গিয়েছি তখন 'হাফ টাইম'।

গাছের গায়ে একটি ডালে নোটিস। পরবর্তী অধিবেশন বিকেল চারটে থেকে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত। ঝগড়া যখন তুঙ্গে উঠবে তখন কেরোসিনের টিন (ক্যানেস্তারা) হাতে কৌতূহলী দর্শকরা প্রস্তুত। উত্তাল ঝগড়ার তালে তালে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে গেল ছেলেরা।

বাড়ি ফিরতেই মায়ের বকুনি। ছোটলোকদের ওই ঝগড়ায় তুই গেলি কেন?

ক্ষণের বচন

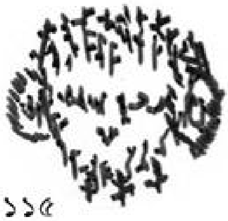

১১৫
কাজে-মনে-বাক্যে যদি বিপরীত অর্থের প্রভাব
স্বার্থের কালিমা ধুতে ব্যর্থ লক্ষ ডাব।

১১৬
ক্রোধ লোভ বড় ভুল
অন্যে দাম করে উশুল।

১১৭
ক্রোধে ঢাকে বোধবুদ্ধি
পুড়ে ছাই আত্মশুদ্ধি।

১১৮
কবি-শিল্পী যদি হয় ক্ষমতার অন্ধ কাছাকাছি
রাজায়-প্রজায় খেলে পৌষমাসে ঘোর কানামাছি।

১১৯
যত বেশি আমি-আমি
তত হাসে অন্তর্যামী

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

১১৪। বেঁচেগণ্ডুষ

ক্রিয়া বিশেষণ; যে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও সমস্যা চুকে গেছে ধরে নিয়ে, আনন্দমগ্ন করার মুহূর্তে, গোটা ঝামেলাটা গোড়া থেকে ফের শুরু হয়ে যায়।
— খানসাহেবের কপালটাই খারাপ। কাঁচা বয়সে নেশার ঘোরে কয়েকজনকে গাড়িচাপা দিয়ে পালিয়েছিলেন, অ্যাদ্দিন পর জানা গেল, কোনও এক মড়া নাকি মরেনি। খামোখা বেঁচে উঠে তাঁকে শনাক্ত করে ফেলল। তারপর দেখো, এত বয়সে জেলখানার কলঘরে একটা আরশোলাকে খতম করে কোনওমতে দু'ঘটি জল দেবেন মাথায়, তো সে বেটাও কেমন ফড়ফড়িয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। বেঁচেগণ্ডুষ আর কাকে বলে।

১১৫। শাকথেরাপি

ক্রিয়া; জীবনে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করা হয়নি বা পুণ্যার্জনে ঘাটতি রয়ে গেছে, এমন গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে নিরামিষাশী হয়ে যাওয়ার সহজ পথটি বেছে নেওয়া।
— তুমি আবার কবে থেকে শাকাহারী হয়ে গেলে?
— বনদপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই। চোরাশিকার তো আর রুখতে পারব না, কাঠচোরদের ঠেকানোও সহজ নয়। অগত্যা শাকথেরাপি।

১১৬। উপরকাঠি

বিশেষ্য; যে অদৃশ্য কাঠিটির হেলনদোলনে সমাজে নানা রকম দুর্বোধ্য পরিবর্তন ঘটে। যেমন, দুর্বৃত্তদের রুখতে গেলে সরকারি কর্মীর বহিষ্কার, নিপুণ তদন্ত করলে পুলিশকর্মীর নির্বাসন, তহবিল তছরুপ করলে পদোন্নতি, প্রকাশ্যে খুন করার হুমকি দিলে জয়জয়কার। সমার্থক শব্দ > আপদৈবং (আপদ + এবং)

১১৭। রিক্তাক্ত

বিশেষণ; সমাজের হতদরিদ্র শ্রেণিকে পরিসংখ্যানের হ্যাঁচকা টানে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে এনে উন্নয়নের জয়গান শোনালে— সেই মানুষগুলোর যে দশা হয়।

১১৮। মন্দাক্রান্ত

বিশেষণ; যে ব্যক্তি বা এলাকা অর্থনৈতিক সংকটে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত।
— পশ্চিমি দুনিয়া মন্দাক্রান্ত, এই বাজারে বিলিতি আপিসে কাজ খুঁজে লাভ কী? তার চেয়ে নিজে সেরকম কিছু একটা করতে পারলে...
— কোনও লাভ নেই। ওরা মন্দাক্রান্ত হলেও মন্দাক্রান্তা নয়, ভালো কিছু বাজারে এলেই খপ করে লুফে নিয়ে টপ করে ঝেপে দেবে। ওদের প্যাকেজিংয়ের সঙ্গে আমরা পারব?

শব্দবক্রমুনি

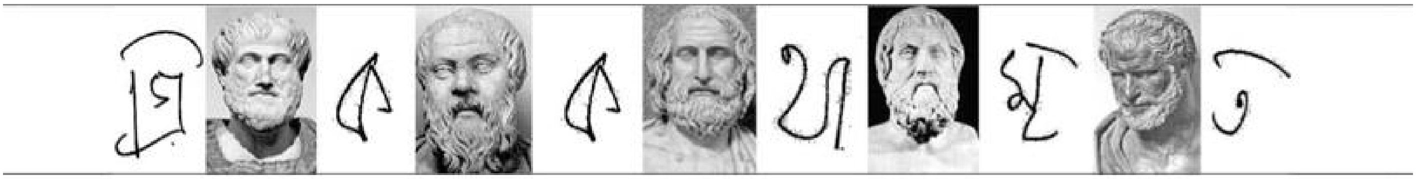

সংকলক ও অনুবাদক

কালীকৃষ্ণ গুহ

পর্ব ৬

আধুনিক সভ্যতার বা ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু বলা যায় গ্রিসে। ভারত, চিন ও এশিয়ার প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির পরিপূর্ণ চেহারা লিপিবদ্ধ নয় বলে সেইসব সভ্যতাকে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলাই হয়তো সংগত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি, তা গড়ে উঠেছিল বলা যায় ৭০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে— এক অন্ধের কাব্যপাঠে। মহাকবি অন্ধ হোমার এক-একটা জনপদে পৌঁছে সারাদিন দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করতেন— গ্রিকদের জয়ের কাহিনি— ইলিয়াড ও ওডেসি। অজস্র দ্বীপে বিভক্ত একটা অঞ্চল বা একটা ছোট ভূ-ভাগ গ্রিসদেশ হিসেবে পরিচিত হয় পরে। জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠ দ্বীপরাজ্য বা নগররাজ্যটি ছিল আথেন্স। যেমন যুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল স্পার্টা। এই আথেন্সে জন্মেছিলেন একের পর এক মহাজ্ঞানী লেখক, ভাবুক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক। বিভিন্ন সময় তাঁরা যে সকল উক্তি করেছিলেন সেইসব কথা বা কথামৃত আজও মনে হয় অব্যর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে এই জ্ঞানীদের উক্তিগুলির সংকলন ও অনুবাদ করেছিলাম একসময়। উক্তিগুলি এতই শক্তিশালী ও মহৎ যে অনুবাদের অনুবাদেও তা মহৎ থেকে গিয়েছে, এই আমাদের বিনীত ধারণা। মনে রাখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জ্ঞানেরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, প্রায় দেড় হাজার বছর পর।

বি ন য়

সন্তানদের জন্য তুমি শ্রেষ্ঠ যে সম্পদ রেখে যেতে পার তা হল একটা বিনয়ের বোধ আর মহৎ লোকদের অনুসরণ করার উপদেশ।

থিওগনিস

হেসে-ওঠার অভ্যাস এড়িয়ে চলবে, কেন না এইরকম ব্যবহার অশ্লীলতায়— গ্রাম্যতায় পর্যবসিত হয়, আর এতে তোমার প্রতিবেশীদের তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যাবে।

এপিক্‌টেটাস

খারাপ ভাষা ব্যবহারে নেমে যাওয়া বিপজ্জনক। ... যদি এইরকম ভাষা ব্যবহারের সত্যিই কারণ ঘটে, তাহলে নীরব থেকে বা নিজেকে লজ্জিত দেখিয়ে বা ভ্রূকুটিতে বুঝিয়ে দেবে যে তুমি খুশি হওনি।

এপিক্‌টেটাস

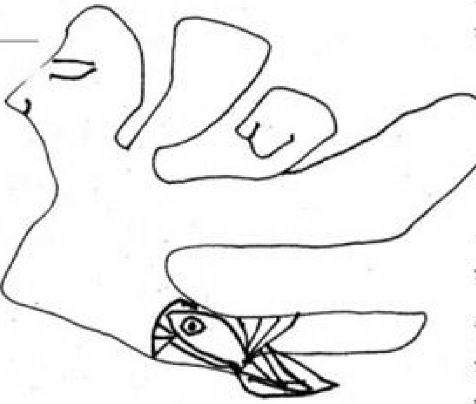

আ ত্ম জ্ঞা ন (নিজেকে জানো)

ডালফির অ্যাপোলোর মন্দিরে খোদিত অপরীক্ষিত জীবন যাপিত হবার যোগ্য নয়।

সক্রেটিস

একজন অশিক্ষিত লোক নিজে ভুল করলেও অন্যকে দোষারোপ করে; নিজেকে সে-ই দোষারোপ করে যার শিক্ষা শুরু হয়েছে; যার শিক্ষা শেষ হয়েছে সে নিজেকেও দোষারোপ করে না অন্যকেও দোষারোপ করে না।

এপিক্‌টিটাস

যা তুমি জান না তা জান ভেবে নিজেকে ঠকানো আসলে পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।

সক্রেটিস

নিজেকে জানার মধ্যেই সমস্ত জ্ঞানের সূত্রপাত।

অ্যারিস্টটল

নিজেকে জেনে ওঠা অতি কঠিন।

মিলিটাসের **থালেস**

নিজে অজস্র ক্ষত নিয়ে অন্যের ক্ষত সারাতে যেয়ো না।

ইউরিপিডিস

সাধারণত অন্যকে পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে আমরা প্রজ্ঞার পরিচয় দিই, কিন্তু নিজেরাও যে ভুল করি, তা দেখতে পাই না।

সক্রেটিস

মানবিক গুণাবলি কী তা জানলে নিজে একজন উন্নততর মানুষ হতে পারবে।
অ্যান্টিফেনিস্‌

তুমি একজন ভালো শিক্ষক হতে পারবে, যদি যেসব কারণে অন্যকে দোষ দাও সেইসব কারণে নিজেকেও দোষ দিতে শেখ।
ডাইয়োজিনিস

আত্মজ্ঞান হল নিজের কাজের প্রতি লক্ষ রাখার ক্ষমতা, আর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক কাজটা করা।
মিনান্ডার

আমি কখনও ভাবি না যে আমি এমন একটা জিনিস জানি যা আমি জানি না, এই কারণে আমি (অন্য একজনের থেকে) সামান্য একটু বেশি জ্ঞানী।
সক্রেটিস

নিজের ভুলগুলি বাজে কথা বলে ঢাকতে চেষ্টা কোরো না। বরং পরীক্ষা করে দেখে ভুলগুলি শোধরানোর চেষ্টা করো।
পিথাগোরাস

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই যেসব শ্রেষ্ঠ জয় বা জঘন্যতম পরাজয় ঘটে তা অন্য কারও কাছ থেকে ঘটে না, নিজের কাছ থেকে ঘটে।
প্লেটো

যেহেতু তুমি মরণশীল, মরণশীল হিসেবেই চিন্তাভাবনা করবে।
মিনান্ডার

ঘুমে ক্লান্ত চোখ বুজে আসার আগে সারাদিনের ঘটনা তিনবার ভেবে দেখবে, 'কী ভুল করেছি? কী ঠিকভাবে করতে পেরেছি? কী করতে ব্যর্থ হয়েছি আর কী করা উচিত ছিল?' তারপর ভুলের জন্য দুঃখ করো, ঠিক কাজের আনন্দ করো।
পিথাগোরাস

দে শা ত্ম বো ধ

বাবা-মা বা সমস্ত পূর্ব-পুরুষদের থেকেও তোমার দেশ বেশি মূল্যবান বেশি শ্রদ্ধার বেশি পবিত্র— যাকে দেবতাদের থেকে বা অন্য মহৎ মানুষের থেকে বেশি সম্মান দেবে।
প্লেটো

বীর নির্দ্বিধায় খাপ থেকে তার তরবারি বের করে

যদি দেশের জন্য যুদ্ধে যেতে হয় তাহলে আহত হবার বা মৃত্যুর ভয় থাকলেও তুমি তা করবে— তা করাই ন্যায়সংগত কর্তব্য— কখনও সেখান থেকে সরে যাবে না, পালাবে না।
প্লেটো

বীর নির্দ্বিধায় খাপ থেকে তার তরবারি বের করে— দেশের স্বার্থের কথা ছাড়া অন্যকিছু ভাবে না সে।
হোমার

স্বা র্থ প র তা ও আ ত্ম ত্যা গ

কবিরা যেমন তাদের কবিতাকে ভালোবাসে, পিতারা যেমন তাদের সন্তানদের ভালোবাসে, সেইরকম যারা অনেক সম্পদ সৃষ্টি করেছে, তারা তাদের পয়সাকড়িকে খুব মূল্য দেয়— তা শুধু সেই সম্পদের ব্যবহার আছে বলে নয়, যেমন অন্য সবাই দিয়ে থাকে— তা দেয় তার সৃষ্টি বলে। এইরকম লোকের সঙ্গে চলা যায় না কেন না তারা শুধু সম্পদের প্রশংসা করে।
প্লেটো

নিজের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত থাকে সমস্ত পাপের কারণ।
প্লেটো

প্রত্যেক মানুষেরই যে নিজের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়; প্রকৃতির নিয়মেই তা ঘটেছে। স্বার্থপরতা যথার্থই নিন্দনীয়, কিন্তু নিজের প্রতি ভালোবাসা স্বার্থপরতা নয়, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মপ্রীতিই স্বার্থপরতা।
অ্যারিস্টটল

আগামী সংখ্যায় আরও

মানবমুখের স্কেচ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

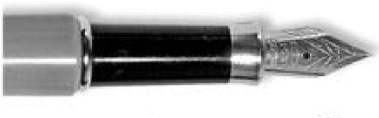

সুকুমারী ভট্টাচার্য

(১৯২১-২০১৪)

শুধু বাঙালি হিসাবে নন, শুধু ভারতীয় বলেও নয়। বিদূষী সুকুমারী ভট্টাচার্যের মধ্যে ছিল একাধারে ত্রিগুণের সমাহার— শব্দের সঙ্গে সার্থক সাযুজ্য রাখা এক জন ক্যাথলিক, মার্ক্সবাদী এবং সংস্কৃতবিদ। ব্যক্তিগত জীবনে কখনও কাউকে ডেকে কিছু শেখাতে যাননি, দর্শনার্থীদের আমন্ত্রণ জানাতেও কখনও হননি ব্যস্ত, কিন্তু তিনি যখনই কিছু বলতেন, দেখা যেত কোনও মার্ক্সবাদী কিংবা সংস্কৃত পণ্ডিত নিজের নিজের নোটবই খুলে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। পোলিশ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক লেসজেক কোলাকোওস্কির সঙ্গে তাঁর মিল অনেক। কোলাকোওস্কি বিখ্যাত মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার তীক্ষ্ণ সমালোচক হিসাবে, বিশেষত মার্ক্সের ধর্মীয় দর্শন নিয়ে তাঁর প্রশ্নগুলির জন্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতির উত্তরাধিকারী সুকুমারীর জন্ম ক্রিশ্চান পরিবারে, ১৯২১ সালের ১২ জুলাই। মজা করে বলতেন, জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে তিনি জন্মদিনটা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। পারিবারিক আদি নিবাস চিত্রা নদীর তীরে শিঙে-শোলপুর গ্রাম, কিন্তু সুকুমারী ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মেদিনীপুরের মামাবাড়িতে। মা শান্তবালা, বাবা সরসীকুমার দত্ত। পিতামহ বিপিনবিহারী হিন্দু সমাজের কঠোর আচার-অনুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাই জন্মের আগে থেকেই সুকুমারী ক্রিশ্চান। অথচ এই ক্রিশ্চান ধর্মীয় পরম্পরাই স্নাতকোত্তরে সংস্কৃত বিষয় নিয়ে তাঁর পড়ার ইচ্ছার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি, পরে ১৯৫৪ সালে প্রাইভেটে সংস্কৃতে

মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ায় ধর্ম সম্পর্কে সুকুমারী দেবীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবেগবর্জিত ও বস্তুনিষ্ঠ। নিজের 'লেজেন্ড অব দেবীজ' বইতে দেবীদের বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখান, প্রাক-আর্য কৃষিপ্রধান সমাজে পূজিতা শস্যের দেবী লক্ষ্মী কী ভাবে আর্য সমাজে অলক্ষ্মী হয়ে উঠলেন।

এমএ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। শৈশবের কয়েক মাস মেদিনীপুরের স্কুলে কাটানোর পরে ভর্তি হন কলকাতার ক্রাইস্টচার্চে। পরে সেন্ট মার্গারেট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন। ইন্টারমিডিয়েটের পরে প্রেসিডেন্সির দরজাও তাঁর জন্য খোলা ছিল না, কারণ সেই সময়ে প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৪২-এ অতীব মেধাবী সুকুমারী সব বিষয়েই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ইংরেজিতে স্নাতক হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্য ঈশান স্কলারশিপ পাননি ওই ক্রিশ্চান হওয়ার কারণেই। দাতা ঈশানচন্দ্র ঘোষের লিখিত নির্দেশ ছিল, বর্ণহিন্দু ছাড়া এই স্কলারশিপ কাউকেই দেওয়া যাবে না। তবে জুবিলি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ পেয়েছিলেন তিনি। সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে সুকুমারী দেবী যখন ইংরেজিতেই এমএ ক্লাসে ভর্তি হন, পরীক্ষা প্রায় ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। ১৯৪৪-এ সেই পরীক্ষাও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন তিনি। পরের বছরেই লেডি ব্রেবোর্নে ইংরেজির বিভাগীয় লেকচারার পদে যোগদান। ১৯৫৭-এ বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দেন। এক বছর পরে অধ্যাপক সুশীল কুমার দে তাঁকে নিয়ে যান সংস্কৃত বিভাগে। সেখানেও সুকুমারীর ধর্মীয় পরিচয় ঘিরে কূপমণ্ডূক সহকর্মীদের একাংশের আপত্তিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবু শেষ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছিলেন সংস্কৃত বিভাগেই, অবসর নেন ১৯৮৬ সালে। ইংরেজি ও সংস্কৃত, দুই ভাষাতেই বিরল দক্ষতা ছিল সুকুমারী দেবীর। এ ছাড়াও জানতেন পালি, ফরাসি, জার্মানি এবং গ্রিক ভাষা। সুকুমারী দেবীর অধীনে গবেষণা করেছেন অভিজিৎ ঘোষ, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির মতো কৃতী শিক্ষাবিদেরা। অথচ আজীবন অবিচারের শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি জানান, দীর্ঘ দিন সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করে যাওয়া সত্ত্বেও সুকুমারী দেবীকে 'প্রফেসরশিপ' দিতে অনেক দেরি হয়। জীবনের প্রথম দিন থেকে পদে পদে ঈর্ষা-অসূয়ার মহান প্রাপ্তিযোগ বয়ে বেড়াতে হওয়ার দুর্লঙ্ঘ্য কারণে অবসর নেওয়ার মাত্র বছর দুই আগে 'অধ্যাপক' পদের স্বীকৃতি পান তিনি। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে একটি পুরস্কার নেওয়ার সুপারিশও তাঁর জন্য করেনি এ রাজ্যের কোনও সরকার।
প্রাচীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে লিখেছেন ৩৫টিরও বেশি বই। কেমব্রিজ থেকে প্রকাশিত হয় শিক্ষক মহলে আলোড়ন ফেলে দেওয়া সুকুমারী দেবীর বই 'ইন্ডিয়ান থিয়োগনি'। গবেষণার কাজে যখন তিনি কেমব্রিজের গ্রন্থাগারে যাতায়াত করছেন, তখনই গ্রন্থাগারিক মারফত তাঁর গবেষণার কথা কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে। তাঁরা সুকুমারী দেবীকে অনুরোধ করেন, গবেষণাপত্রটি যেন তাঁদেরই প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একবার বলেছিলেন, ''হিন্দু দর্শন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সুকুমারী ভট্টাচার্যের ওই বইটি পড়তে হবে।''
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির কথায়, ''ছাত্রছাত্রীরা ওঁর সঙ্গে তর্ক করে আলোকিত হতেন। কারণ তিনি কখনওই নূপুরের মতো চরণে চরণে বাজতে শেখাননি। সুকুমারীদি যে যুগের থেকেও এগিয়ে ভাবতেন, 'ইন্ডিয়ান থিয়োগনি' বইটিই তার প্রমাণ।''
তবে শুধু গুণগ্রাহী বিশিষ্ট জনেরাই নন, সহজ-সরল রচনাশৈলীর জন্য সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। 'প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য' বইটির জন্য সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন সুকুমারী দেবী। একেবারে অন্য ভাবে সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা করেছেন 'হিস্ট্রি অব লিটারেচার' গ্রন্থে। তৎকালীন সমাজভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এই বইতে। মার্ক্সীয় ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের কথায় ''ওঁর কাজ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে আছে।''
মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ায় ধর্ম সম্পর্কে সুকুমারী দেবীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আবেগবর্জিত ও বস্তুনিষ্ঠ। নিজের 'লেজেন্ড অব দেবীজ' বইতে দেবীদের

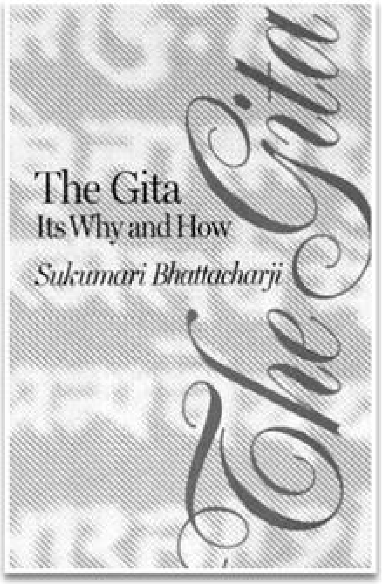

একের পর এক নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণায় মেতে থেকেছেন সুকুমারী দেবী। নিজের পড়াশোনা, তরুণতরেরা কে কী ভাবছেন, এ সব নিয়ে আগ্রহে কোনও দিনই ভাটা পড়েনি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পুরাণ, ইতিহাস, রীতি-আচারকে নিজে বুঝে অন্য সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন সমকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে।

বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখান, প্রাক-আর্য কৃষিপ্রধান সমাজে পূজিতা শস্যের দেবী লক্ষ্মী কী ভাবে আর্য সমাজে অলক্ষ্মী হয়ে উঠলেন। সুকুমারী দেবীর এমন সব মৌলিক বিশ্লেষণী চিন্তাধারার বিচ্ছুরণ পাওয়া যায় 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য', 'নিয়তিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ', 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য', 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা', 'বাল্মীকির রাম', 'দ্য গীতা: ইটস হোয়াই অ্যান্ড হাউ', 'হিউম্যান অ্যান্ড সোসাইটি ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া', 'ফেটালিজম ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থটি ছিল তাঁর প্রিয় রচনা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন নিয়তি ছেড়ে নিজের কর্মোদ্যমের উপরে ভরসা রাখায়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও জড়তা ছেড়ে কোনও এক স্পষ্ট জগতের দাবিদার হতে পারায়। বয়স কোনও সময়েই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই আশি-নব্বইয়ের কোঠায় পৌঁছেও একের পর এক নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণায় মেতে থেকেছেন সুকুমারী দেবী। নিজের পড়াশোনা, তরুণতরেরা কে কী ভাবছেন, এ সব নিয়ে আগ্রহে কোনও দিনই ভাটা পড়েনি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পুরাণ, ইতিহাস, রীতি-আচারকে নিজে বুঝে অন্য সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন সমকালের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। জীবনের একেবারে শেষ দিকে 'স্বর্ণাক্ষর' প্রকাশিত 'নারীযুগ' পত্রিকার পাতায়ও রেখে গিয়েছেন তাঁর চিন্তাভাবনার ফসল বেশ কয়েকটি নিবন্ধ। এরই কয়েকটি হল, 'বিয়ের ধারণা: প্রাচীন ও আধুনিক', 'পারস্পরিক সাহায্যের অভাবে দাম্পত্যে চিড়', 'সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর জীবনেই বেশি প্রয়োজনীয়', 'ভারতীয় ঐতিহ্যে অন্নের অধিকার' এবং 'বিবাহের বহু বিকল্প নিয়ে চলছে পরীক্ষা'। লোকসভা ভোটের ঠিক আগে নতুন সরকারের কাছে তাঁর কী প্রত্যাশা, তা জানিয়ে 'নারীযুগ' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'অধিকার জানা, বোঝা ও হাতে পাওয়া খুব জরুরি।' নবনীতা দেবসেনের কথায়, ''শরীর ভাঙলেও মন ছিল তাঁর তাজা। বয়সকালে অনেকেই আত্মকরুণায় পীড়িত হন, শারীরিক কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকেন। সুকুমারীদি সে সবের শতহস্ত দূরে।''

এত বিদূষী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও মেলামেশায় কিংবা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুকুমারী দেবী ছিলেন অতীব আন্তরিক। বস্তুত, ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাঁর মায়ার অন্ত ছিল না। দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে নিজের বিভাগেই একটি কল্যাণ তহবিল চালু করেন তিনি। আজও সেই তহবিল চালু আছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর পরে ওই তহবিল থেকে নেওয়া অর্থসাহায্য শুধু ফেরতই দিতেন না, বাড়তি কিছু অর্থ নিজেদের কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য হিসাবে দিয়েও যেতেন।

প্রাচীন সামগ্রী বিশারদ নির্মল চন্দ্র কুমারের মৃত্যুর পরে তাঁর কাছ থেকে পড়তে নেওয়া ভারততত্ত্ব সংক্রান্ত একগুচ্ছ বই সুকুমারী দেবী নিজে ফেরত দিতে যান প্রয়াত কুমারের বাড়িতে। এগুলির মধ্যে ছিল দুষ্প্রাপ্য হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজের ১২০টি গ্রন্থ। নির্মল চন্দ্রের পুত্রের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে সব বই আর নিজের কাছে রাখতে চাননি সুকুমারী দেবী। উপহার হিসাবে নিয়ে যান শুধু আনন্দ কুমারস্বামী ও সিস্টার নিবেদিতা রচিত 'মিথস অব দ্য হিন্দুজ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস' বিরল গ্রন্থটি। জরা তাঁর চিন্তাকে গ্রাস করতে পারেনি, যদিও তা শেষ পর্যন্ত গ্রাস করল তাঁর শরীরকে। গত ২৪ মে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। সেই শেষ দিনেও রিক্ত তবু নিঃস্ব হননি তিনি। তাই চিকিৎসায় গবেষণার স্বার্থে নিজের দেহ দান করে বিদায় নিলেন এই উদারমনস্বিনী মহীয়সী। স্বামী, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির বিশিষ্ট অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য অনেক আগেই প্রয়াত। কন্যা ও জামাতা, তনিকা ও সুমিত সরকার দু'জনেই ইতিহাসবিদ। সুমিত আর এক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, প্রয়াত সুশোভন সরকারের পুত্র।

পারস্পরিক সাহায্যের অভাবে দাম্পত্যে চিড়

দাম্পত্য বলতে যে সব ফাঁকফোকর বোঝায়, তা নিয়ে অনেক কথাই বলার রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, এ সব বলাটা আরও জরুরি হয়ে উঠছে। বিবাহই একমাত্র সম্পর্ক যেখানে রক্তের সম্পর্কে সম্পৃক্ত নয়, এমন দু'টি মানুষ একটি মিলিত জীবনের সূত্রপাত করে। এই একটিমাত্র সম্পর্কের শিকড় হল যৌনমিলনে। গাছ যেমন তার শিকড়কে মাটির নীচে প্রচ্ছন্ন রাখে, যৌন সম্পর্কও সে রকমই থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ দেশে বহু পরিবারে সন্তান জন্মটা আপতিক, তার কোনও মানসিক পূর্বপ্রস্তুতি থাকে না। এবং প্রায়শই এটা মায়ের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত, চাপিয়ে দেওয়া।

সন্তান আসার পরে অনেক দম্পতির জীবনে আর একটা সংঘর্ষ দেখা দেয়। ছেলেমেয়েকে মানুষ করার অধিকাংশ দায়িত্ব থাকে মায়েরই, অন্তত তারা কৈশোরে পদার্পণ করা পর্যন্ত। কিন্তু শৈশব থেকেই তাকে কী ভাবে মানুষ করতে হবে, এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার থাকে বাবার। কখনও কখনও ছেলে-মেয়ে নিজেদের রুচি নিয়ে তর্ক করে, ইচ্ছামতো শিক্ষাক্ষেত্রে বেছে নেয়।

দাম্পত্য জীবনে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে আড়াই হাজার বছর ধরে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে, উত্তম নারীর সংজ্ঞা হল যে স্বামীকে তুষ্ট করে, পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর উক্তির প্রতিবাদ করে না। আবার বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও এই ধরনের কথা পাই। পুত্রসন্তানই কাম্য, তাই যে স্ত্রী শুধু কন্যার জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পরে পরিত্যাগ করা যায়। নিঃসন্তান স্ত্রীকে দশ বছর পরে এবং মৃতবৎসাকে পনেরো বছর পরে ত্যাগ করা যায়। অর্থাৎ বোধটি ভারতীয়দের মনে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই দৃঢ়প্রোথিত। নিঃসন্তান নারীকে স্বামী পরিত্যাগ করতে পারত, নেহাত ত্যাগ না করলেও তাকে অসম্মানে নির্বাসিত করা হত। ইউরোপে কোনও কোনও অঞ্চলে সন্তান ধারণ না করতে পারলে সে নারীকে পরিহার করা হত, অন্তত তাকে খুব নিচু চোখে দেখা হত।

সন্তানহীনতার জন্য এ তাবৎকাল শুধু নারীকে দায়ী করে বহু ক্ষেত্রে দাম্পত্য তিক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যদিও আজ আমরা জানি, বন্ধ্যা নারীর মতো নিষ্প্রজ পুরুষও আছে, এবং দু'জনেই সুস্থ ও প্রজননে সমর্থ হলেও বহুক্ষেত্রে সন্তান আসে না। প্রাচীনকাল থেকেই নারী পেয়েছে সম্পদের উত্তরাধিকারী ভোক্তা উৎপাদন করার দায়িত্বটি। যে দাম্পত্যে পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী নিরন্তর আশঙ্কায় ত্রস্ত থাকে, স্বামী তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করবে, সে দাম্পত্য তো নিরন্তর দোলাচলে থাকবেই। দাম্পত্য অশান্তির অনেকটা অংশেই নারী সম্পর্কে সমাজের এই তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞাই দায়ী। এমনকী হৃদয়বৃত্তিতেও নারীর ন্যূনতা, ক্রূরতা, কামুকতার কথাও শাস্ত্র বলেছে, যাতে সে অবজ্ঞার পাত্রী হয়। প্রাচীন যুগে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, নারী প্রেমে উৎসাহিনী নয়, সে শুধু যৌন মিলনেই আকাঙ্ক্ষিনী।

ঋগ্বেদে স্বয়ং উর্বশী তার প্রেমিক পুরূরবাকে বলেছে, 'একটি নারীর জন্য কেন তুমি আত্মহত্যা করবে? কোরো না। নারীর সঙ্গে কোনও বন্ধুত্বই হয় না, এদের হৃদয় নেকড়ে বাঘের মতো।' লক্ষণীয়, এ ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে তার হৃদয়হীনতাকে প্রতিপাদন করার ভার নিয়েছে নারীই। এবং মনে রাখতে হবে, এই অংশটির রচয়িতা একজন পুরুষ। তবে কেন নারীর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যাচার? পুরুষ কি সত্যিই বিশ্বাস করে যে, নারী প্রেমে অক্ষম কামনাসর্বস্ব জীবমাত্র? কামসর্বস্ব নারীই যে পুরুষের পদস্খলনের হেতু, এমন একটি মিথ্যা সমাজে চালু থাকলে পুরুষের অনৈতিক জীবন সম্বন্ধে নৈতিক দায়িত্ব অনেক কমে যায়।

১৭৯২ সালে মেরি উলস্টনক্রাফট লিখেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, পুরুষের একচ্ছত্র অধিকারের দাপট থেকেই নারীর স্বভাবে বহু ভ্রমপ্রমাদ জন্ম নেয়। স্বাধীনতা পেলে তার চরিত্র অনেক বেশি পরিপূর্ণতা পাবে।' নারীর নিকৃষ্টতার এই বোধ নিয়েই পুরুষ বিয়ে করে। আরও দুঃখের বিষয়, নারী নিজেও এই বোধবিশ্বাসের পরিবেশেই লালিত হয়। বারে বারে

সুকুমারী ভট্টাচার্যের জীবনের একেবারে শেষ দিকে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'নারীযুগ' পত্রিকায় তাঁর চিন্তাভাবনার ফসল কয়েকটি নিবন্ধের চারটি পুনর্মুদ্রিত হল।

শোনা যায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারিত 'মেয়েমানুষ' এবং গর্ব ও দম্ভের সঙ্গে উচ্চারিত 'পুরুষ'। এখন শহরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যৎসামান্য কিছু অংশ নিজেদের এই ধারণা থেকে মুক্ত করে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে যুগ্মজীবন রচনায় উদ্যত হয়েছে।

শুধু আর্থিক সাবলম্বিতাতেও এ সুপ্রাচীন বৈষম্যবোধ ঘোচে না। এমনও দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীর সমান বা তার চেয়ে বেশি উপার্জন করা সত্ত্বেও গৃহকর্ম ও সন্তান পালনের দায়িত্ব প্রায় সবটাই নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। চাষি-বউ বা মজুরিনী সারা দিন বাইরে খেটে ফিরে স্বতন্ত্র উপার্জন থাকা সত্ত্বেও সংসারের যাবতীয় কর্তব্য একাই সমাধা করেছে। স্বামী তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছে না, স্ত্রী চাইতে সাহস পাচ্ছে না। কাজেই শুধু অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নারীকে এই বোধ দিতে পারছে না যে, সে সংসারে পুরুষের সমকক্ষ। এর জন্য চাই চেতনার মুক্তি। সেটা সময়সাপেক্ষ ও তার জন্য চাই দীর্ঘ সচেতন প্রস্তুতি ও সংগ্রাম।

একটি শুভলক্ষণ খুব মৃদু হলেও ইদানীং দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিছু কিছু মুক্তমনা পুরুষ স্ত্রীকে গৃহকর্মে সাহায্য করছেন। আবার বেশ কিছু দাম্পত্যে এই সাহায্যের অভাবে চিড় ধরেছে। মেয়েটি একলাই সন্তান, সংসার, শ্বশুরবাড়ির পরিজনদের পরিচর্যা করবে এই আশা করে ছেলেটি বলে, 'ও সব তো মেয়েদের কাজ।' এই কাজের বোঝার গুরুভারে ক্লিষ্ট এবং সংসারের কাজে স্বামীর সহযোগিতা না পাওয়ায় যে অসহায়তা ও প্রচ্ছন্ন অত্যাচারের আভাস থাকে তাতে মেয়েটি স্বভাবতই বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হয়।

মুশকিল হল, আমাদের শাস্ত্রে, সাহিত্যে, সমাজে এই পারস্পরিক সাহায্যের কোনও নজির নেই বরং উল্টোটাই আছে। মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলেছিলেন যে, প্রত্যূষে উঠেই সারা দিন তিনি অবিশ্রাম গৃহকর্ম করে চলেন। এমন কথাও আছে যে, নারী সর্বদাই গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকলে সে অন্যায় কর্ম থেকে নিরস্ত থাকে। সব প্রাচীন সমাজেই বিশ্বাস ছিল যে, নিরন্তর কাজের মধ্যে না থাকলে নারী দুশ্চরিত্র হয়ে যাবে এবং তাকে সে সুযোগ না দেওয়া তার চরিত্র-রক্ষারই একটা উপায়।

বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধে সমাজের যে বোধগত ভিত্তি ছিল তা হল, সংসারটা পুরুষের স্বচ্ছন্দ, নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার জন্যই, তার কোনও ব্যত্যয় যদি স্ত্রী ঘটায় তা হলে তার জন্য দরজা খোলা আছে। ফলে বহু দাম্পত্যের ভিত্তিটা গোড়া থেকেই নড়বড়ে হয়। কত অসংখ্য পরিবারে মাতাল, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী, কটুভাষী স্বামী দাপিয়ে প্রতাপ জাহির করে স্ত্রীকে পদানত রাখে। স্বামীর শারীরিক বৈকল্যে সন্তান না এলে স্ত্রীকেই নিষ্ঠুর ভাবে নিন্দা করেছে স্বামী ও তার পরিজন।

বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধে সমাজের যে বোধগত ভিত্তি ছিল তা হল, সংসারটা পুরুষের স্বচ্ছন্দ, নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার জন্যই, তার কোনও ব্যত্যয় যদি স্ত্রী ঘটায় তা হলে তার জন্য দরজা খোলা আছে। ফলে বহু দাম্পত্যের ভিত্তিটা গোড়া থেকেই নড়বড়ে হয়।

কারণ, সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর অধিকার, ব্যক্তিত্ব ও তার সামাজিক অধিকার একেবারেই উপেক্ষিত।

ফলে তার নিজের ও আশপাশের সকলের ধারণা ও বিশ্বাস জন্মায় যে, দু'মুঠো ভাত ও দু'খানা কাপড়ই তার একমাত্র অধিকার। এই বোধ-বিশ্বাসের ফলে তার পুষ্টির কথা পরিবার ভাবে না। এবং সে শুধু প্রাণধারণের মতো খাদ্য ও লজ্জা নিবারণের মতো বস্ত্র পায়। রোগে চিকিৎসা কমই জোটে এবং মানসিক বিকাশের কোনও ভার কেউ নেয় না। এর প্রতিকার হচ্ছে না, অথচ হওয়া প্রয়োজন।

❖

সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর জীবনেই বেশি প্রয়োজনীয়

বিবাহ ব্যাপারটাই নানা কারণে বড় গোলমেলে। এখনও এ দেশে অধিকাংশ মেয়ের জীবনের পরিণতি দাম্পত্যে। তার বিবাহোত্তর জীবনের সুখ-দুঃখ সাচ্ছন্দ্য-অসাচ্ছন্দ্য সবই নির্ভর করে প্রভু অর্থাৎ স্বামীর ওপরে। সে কারণেই স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে তার এমন স্বাধীনতা থাকা উচিত যে, যতক্ষণ না মনোমত স্বামী পায় ততক্ষণ যেন পরিবর্তন করতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল, প্রায় দেড়শো বছর আগে, ১৮৬৯ সালে বলেছিলেন, 'যেহেতু তার জীবনের সব কিছুই নির্ভর করছে একটি ভালো প্রভু লাভ করার ওপরে, সেই কারণে তাকে বার বার পরিবর্তন করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না সে তেমন একজনকে পায়।... দাসত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনতাই একমাত্র উপশম, যদিও তা-ও পর্যাপ্ত নয়। এ অধিকার প্রত্যাখ্যাত হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ ভাবে ক্রীতদাসীতে পরিণত হয়ে যায়।'

দাম্পত্যে সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নারীর পক্ষে বেশি প্রয়োজন, কেন না সমাজ তাকে নানা ভাবেই পুরুষের অধীন করে রেখেছে। অতএব পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে প্রভুর কাছ থেকে জীবনে তার নিষ্কৃতি নেই, সে তার মনোমত হওয়া অনেক বেশি জরুরি ও বাঞ্ছনীয়। বিশেষত, সমাজ যখন এ স্বাধীনতা পুরুষকে দিয়েছে। কিছুকাল আগেও পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারত এবং এখনও গণিকালয়ের দ্বার তার কাছে খোলা। পরস্ত্রীর সান্নিধ্যও সে সদর রাস্তায় না পেলেও খিড়কি দরজা দিয়ে পায়। অবশ্যই কিছু বিবাহিত নারীও কখনও কখনও পর-পুরুষের সঙ্গ পায়। কিন্তু একে তো দেশের অধিকাংশ নারীর পক্ষে সে পথে দুস্তর বাধা, তার ওপরে তার কলঙ্কের বোঝাও অনেক অনেক গুরুভার। একটি পরস্ত্রীকামুক পুরুষের চেয়ে এই নারীদের অবস্থা প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'বাঁশি বাজে বনে বসন্ত রাগে/ জটিলা, কুটিলা দুয়ারে জাগে।'

বিবাহের উদ্যোগপর্ব থেকে নারীকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় রাখা হয়, বিবাহের পরেও পুরুষতন্ত্রে সে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তার স্বার্থ, তার চিন্তা, সিদ্ধান্ত, আবেগ, অনুরাগ-বিরাগ, এমনকী তার স্বাস্থ্যও পরিবারে গুরুত্ব পায় না। সন্তানপালনে তার ভূমিকা স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সে ব্যাপারে তার মতামত উপেক্ষণীয়। অ্যালফ্রেড টেনিসনের একটি কাব্যাংশ এখানে প্রযোজ্য, 'তারা উত্তর করতে পারে না/ তারা প্রশ্ন করতে পারে না/ তারা শুধু করে আর মরে।' এ বৈষম্য বিবাহিত জীবনের পদে পদে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, এমনকী শিক্ষিত নারীর ক্ষেত্রেও। এবং এ ব্যাপারটা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নারী বা পুরুষ কেউ-ই এর গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়। সোলোমন দেখিয়েছেন, নারী নিজের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারত না, স্বামীই ছিল পরিবারের প্রভু, সন্তানরা ও ক্রীতদাসরা ছিল নিম্নবর্গের জীব। শুধুমাত্র পিতার অবর্তমানে মায়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী ছিল স্বামীর অধীনে।

বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যেকার বাধা মাঝে মাঝেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিবাহ দু'জনের কাছেই, কখনও বা এক জনেরই কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। আর্থিক অসঙ্গতি, রুচির বৈষম্য, সন্তানপালন সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা ইত্যাদি এর নানা কারণ থাকতে পারে। যথাকালে অর্থাৎ সূচনাতেই পারস্পরিক

আলোচনার মধ্যে এর নিষ্পত্তি না ঘটলে অভিযোগ ক্রমে মৃদু থেকে দুর্বিষহ কটুতায় পরিণত হয়। তখন পরস্পরকে সহ্য করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে, বিয়ের ভিত টলে যায় এবং বিচ্ছেদ যেন অনিবার্য বলে মনে হয়। এ তো গেল বাইরের কারণ। এ ছাড়াও যা ঘটে, তা হল প্রেমের মৃত্যু। বোধ হয় পূর্বরাগের পরের বিবাহে প্রেমের মৃত্যুর সবটা আর্তি ধরা পড়েছে প্রাচীন ভারতের নারী কবি শীলা ভট্টারিকার একটি বিখ্যাত কবিতায়। যে প্রেমের আকুতিতে এক দিন কুমারী শরীর প্রেমিককে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেছিল সে পরে তাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। সেই পুরনো অভিসারের কুঞ্জ আজও আছে রেবা নদীর তটে, তেমনই কদম আর মালতীর গন্ধে উদ্দাম সমীরণ, অথচ আজকে মিলনলগ্নে চিত্ত কেন এমন নিরুৎসুক? এমন উদাসীন? কেন, তা কে জানে?

প্রেমের অপর এক কবি অমরুর 'শতক কাব্যে' এমনই আর একটি দুর্লভ রত্ন আছে, 'যেখানে ভ্রূকুটি রচনাই ছিল ক্রোধের প্রকাশ, চুপ করে থাকা ছিল অত্যাচার, পরস্পরের দিকে চেয়ে স্মিতহাসি ছিল অনুনয়, দৃষ্টিপাত ছিল প্রসন্নতা-দেখ, সেই প্রেমের আজ এ কী মৃত্যু: তুমি আমার পায়ে লুণ্ঠিত, তবু এই হতভাগিনীর ক্রোধ যায় না।' অন্য একটি কবিতায় কবি বলছেন, 'যে প্রেম একদা সজীব ও উদ্বেল ছিল সেই প্রেমে নেমে এসেছে বিমুখ ঔদাসীন্য।' বহু স্থলে তৃতীয় বা তৃতীয়ার সমাগমে পূর্বপ্রেমে ক্লান্তি অনুভূত হয়। নতুনের সম্বন্ধে কৌতূহল, আগ্রহ অধীরতায় পৌঁছয়, দীর্ঘ দিনের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী গৌণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আবার কখনও বা অন্য কারও উপস্থিতির আগেই প্রেমে শৈথিল্য দেখা দেয়। ক্লান্ত, পুরনো, একঘেয়ে লাগে পূর্ব-প্রণয়ের সমস্ত অনুষঙ্গকে। তার পরে কখনও নতুন অনুরাগ জন্মায়। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে নতুন প্রেমে উজ্জ্বল পুরুষরাও অল্পক্ষণের জন্য হলেও সত্যই ক্লেশ ভোগ করেছিলেন অনুরাগিনী বধূ ঔশীনরী সম্বন্ধে তাঁর ঔদাস্যে।

ফলে বিয়ে ভাঙে। কখনও ধীরে ধীরে, কখনও সহসা। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে আছে, বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক পতিকে যদি স্ত্রী ত্যাগ করে তবে তাকে স্বামী কিছুই দেবে না। বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে ত্যাগ করলে তাকে তার যা প্রাপ্য তা দিতে হবে। যদি দু'জনে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ পোষণ করে তা হলে সে বিবাহ থেকে দু'জনেই মুক্ত হতে পারে। তা হলে কৌটিল্য স্বীকার করেছেন যে, যেখানে বিবাহের মানসিক ভিত্তি ভেঙে গিয়েছে, অনুরাগের স্থানে এসেছে বিরাগ, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারে। মনুসংহিতা প্রায় পাঁচশো বছর পরের রচনা। মনুতে নারী তার বহুবিধ অধিকার একে একে হারিয়েছে।

> **বর্তমান আইন কৌটিল্যের মতো বিবাহ বিচ্ছেদের অবকাশ রেখেছে। কার্যত দুঃসাধ্য হলেও এখন অন্তত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারী আইনত স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে। সে নিজে উপার্জন না করলে তার ভরণপোষণের দায়ও থাকে স্বামীর, অন্তত আইনে।**

মনুতে শুধু সতীদাহই নেই, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার নির্দেশ আছে। মনুতে দেখি, উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, নির্বীর্য, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পতির পরিচর্যায় অনিচ্ছুক স্ত্রীকেও ত্যাগ করা চলবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি পাগল, সুরামত্ত, রোগাক্রান্ত পতিকে ত্যাগ করে তা হলে তিন মাস অপেক্ষা করে তার বসনভূষণ কেড়ে নিয়ে তাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

এ ভাবে লজ্জিতা এবং লাঞ্ছিতা স্ত্রী গৃহত্যাগে উদ্যত হলে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকাতে হবে, নয়তো প্রকাশ্যে পরিজনসমক্ষে তাকে ত্যাগ করতে হবে। মনুর ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীর মন বলে কিছু থাকতে পারে না, বিদ্বেষ থাকলেও মুক্তি অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদে অধিকার নেই, যে অধিকার কৌটিল্যে ছিল। সমাজ ক্রমে ক্রমে বিবাহকে নারীর পক্ষে কারাগার করে তুলেছে। বর্তমান আইন কৌটিল্যের মতো বিবাহ বিচ্ছেদের অবকাশ রেখেছে। কার্যত দুঃসাধ্য হলেও এখন অন্তত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারী আইনত স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে। সে নিজে উপার্জন না করলে তার ভরণপোষণের দায়ও থাকে স্বামীর, অন্তত আইনে। যদিও বাস্তবে এটা আদায় করা বহু ক্ষেত্রে খুবই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়।

❖

বিবাহের বহু বিকল্প নিয়ে চলছে পরীক্ষা

বিবাহ কী? বিশেষ ভাবে বহন করা? বিবাহ কি আত্যন্তিক ভাবে অনুষ্ঠান বা রাষ্ট্রবিধি নির্ভর? অর্থাৎ পুরোহিত, পাদরি বা মোল্লার মধ্যস্থতায় নিষ্পাদিত একটি চুক্তি অথবা রেজিস্ট্রেশনে সম্পাদিত একটি পারস্পরিক চুক্তি? এইগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহে যে দু'টি মানুষ যুগ্ম জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয়, তার মধ্যে পরে নানা অসঙ্গতি ও বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং অনেক সময়ে দেখা দেয়ও। অথচ অনাদ্যন্ত কাল ধরে নারী ও পুরুষ পরস্পরকে পেতে ও সে পাওয়াকে স্থায়ী করতে চেয়েছে। এটা একটা সুস্থ, স্বাভাবিক চাওয়া, যার রূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পাঁচ-ছয় হাজার বছর ধরে সাহিত্যে চিত্রিত ও অভিনন্দিত হয়েছে। সেই চিত্র মানুষকে মুগ্ধ করেছে, আগ্রহী করেছে আপন উপলব্ধিতে এই মিলনকে পেতে, স্থায়ী করতে।

তা হলে ধর্ম বা আইনের সমর্থন ছাড়াও এই মিলনের জন্য আকুতির একটি প্রকৃতিগত ভিত্তি আছে। ধর্ম বা আইন এই মিলনকে বাইরে থেকে একটা ছকের মধ্যে ভরে একে নিরাপদ ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করেছে। তাতে সমাজ স্বস্তি পেয়েছে। সন্তানেরা এবং দম্পতিও এক ধরনের একটা নিরাপত্তা বোধ পেয়েছে। কিন্তু, এই মিলনের ভিত্তি যদি হয় একটি নারী ও একটি পুরুষের অন্তরের টান, তা হলে যথার্থ নিরাপত্তার ভিত্তি তো সেই অন্তরের টানেই। সেই টান যদি এক দিন শিথিল হয় তা হলে আইন বা ধর্ম তখন বাইরে থেকে চাপানো বন্ধন মাত্র হয়ে ওঠে এবং সেই বন্ধনের মধ্যে সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি, লালন ইত্যাদির নিরাপত্তা থাকলেও দম্পতির মানসলোকে সে নিরাপত্তা তো ততক্ষণে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে।

এ কথা ভুললে চলবে না যে, ঐক্যদাম্পত্যে মানুষ পৌঁছেছে ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে। গোষ্ঠী দাম্পত্য, কৌম দাম্পত্য, কৌল দাম্পত্য পার হয়ে তবে দাম্পত্য পৌঁছেছে ঐক্যদাম্পত্যে। এবং দাম্পত্যের ইতিহাসে এর স্থায়িত্বও নেহাত কম নয়। এর আশ্রয়ে দাম্পত্য এমন এক স্থিতি লাভ করেছে, যা সভ্যদেশে একে এত দীর্ঘস্থায়ী করেছে। আজ অবশ্য এ নিয়েই একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। পরিবার নিয়ে এঙ্গেলস, দাম্পত্য নিয়ে সিমোঁ দ্য বোভয়া অনেক সংশয় প্রকাশ করে এ দু'টির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এখন বিবাহ সম্বন্ধে আইন খোলা রেখেছে অবাঞ্ছিত দাম্পত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ, ফলে অনিচ্ছায় আমরণ বন্দিত্ব মেনে নেওয়া আজ আর বাধ্যতামূলক নয়।

বিয়ে না করে একত্রবাস, বিয়ে ভেঙে অন্যের সঙ্গে একত্রবাস, বিয়ে রেখেও যুগপৎ এক বা একাধিক সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাহচর্য, সদর রাস্তায় না হলে খিড়কির রাস্তায়, এ সবের ফলে বিবাহ ব্যাপারটাই আর একবার কাঠগড়ায় উপস্থিত। এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের প্রতি এক ধরনের অনুচ্চারিত প্রতিস্পর্ধা। এ ছাড়াও বর ও

কন্যাপক্ষের চেষ্টায় সংঘটিত বিয়ে ও প্রেমের বিয়ে ছাড়াও নতুন এক ধরনের বিয়ে ইতস্তত ঘটছে। সেখানে সম্ভাব্য পাত্র বা পাত্রী প্রেমে না পড়ে বিজ্ঞাপন দেখে বা অন্য কোনও ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে দু'জনে একত্রে বসে সেই সব আলোচনা করছে, যার অনেকটাই আগে দু'পক্ষের মা-বাবারা করতেন। এই দাম্পত্যে যৌন সম্পর্ক আছে, আর আছে বৈষয়িক, ব্যবহারিক সহযোগিতা, হয়তো চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু সাযুজ্য, রুচির ক্ষেত্রে ঐক্য। কিন্তু প্রেম এই সব বিয়েতে কদাচিৎ দেখা যায় এবং এই সব দম্পতি প্রেমের জন্য উৎসুকও নয়, প্রেমের অভাবে ক্লিষ্টও নয়। এটা একটা আধুনিক বিকল্প, কার্যকর এবং নিরাপদ।

বিনা বিবাহে একত্রবাসও অধুনা-আচরিত আর একটি বিকল্প। বিচ্ছেদের পথে এখানে আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। মতানৈক্য হলেই তল্পি গুটিয়ে যে যার পথে রওনা হতে পারে। প্রশ্ন হল, প্রাতিষ্ঠানিক কারণে বিবাহ তা হলে আজ অবান্তর হয়ে গিয়েছে? এতগুলো বিকল্প দেখে তাই মনে হওয়া সম্ভব। বিনা বিবাহে সহবাস, বিবাহ ভেঙে অপর সঙ্গী বা সঙ্গিনীর নিবিড় সান্নিধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সহবাস, একে অপরের স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য সহবাস-এ সবগুলির দ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের সংশয়। বিকল্পের অনুসন্ধান এবং নানা বিকল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবন্ধনের শৈথিল্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় এবং তখন থেকেই সাহিত্যে এটি বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত।

সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণাতেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা উচ্চারিত হয়, যাতে বিবাহের ভিত্তি সম্বন্ধেই মানুষ সন্দিহান হয়। মনস্তাত্ত্বিকরা এমন কথাও বলেন যে, মানুষ মাত্রেরই যৌনবৃত্তিতে দ্বিচারিতা বা বহুচারিতা প্রকৃতিদত্ত। সমাজ তাকে গোপন করতে শেখায় এবং তার ফলে নানা মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। এমনই এক প্রবণতা বহুগামিতা। বহুচারিতার প্রবৃত্তি যদি নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ না করা হয়, তা হলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে তা শুধু দাম্পত্যের ভিতই টলিয়ে দেবে তা নয়, সমাজ দেহে এমন আঘাত করবে যা সহ্য করার কোনও দায়িত্ব সমাজের নেই। সমাজের পক্ষে যা হানিকর তেমন প্রবণতা দমন করার দায় নিশ্চয়ই যে কোনও সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ মানুষের আছে। সমস্ত উদ্দাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সুযোগ কোনও সমাজই দিতে পারে না। দিলে সমাজে উন্মত্ত তাণ্ডব দেখা দেবে এবং বহু নিরপরাধ মানুষ অকারণে কষ্ট পাবে।

❖

অধিকার জানা, বোঝা ও হাতে পাওয়া খুব জরুরি

একটা নতুন নির্বাচন মানেই আবার নতুন নতুন বহু প্রত্যাশা। কিন্তু এত বছর ধরেই দেখছি, কোনও প্রত্যাশাই শেষ পর্যন্ত পূরণ হয় না। তবু আমরা আশা করি। এবারও করছি। সত্যি কথা বলতে কী, এ ছাড়া আর কী-ই বা আমরা করতে পারি?

আমার মতে, সবচেয়ে আগে জোর দেওয়া উচিত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর। যারা হতদরিদ্র, তারা অনেক সময়ই ওই দু'টি ব্যাপারে সঠিক সুযোগ ও যত্ন পায় না। এর কারণ হল, ওই দু'টিই যত দিন যাচ্ছে, তত আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। জীবনের দু'টি অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। তাদের জন্য নামমাত্র ব্যয়ে চিকিৎসা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়, আমাদের দেশে অনেক ভেদাভেদ। জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ এবং ধর্মের বৈষম্য যে ভাবে বাড়ছে, তা শঙ্কিত হওয়ারই মতো। এত এত ভেদ ও বৈষম্য দেশের ঐক্য ও নৈতিকতাকেই দুর্বল করে দিচ্ছে! এগুলোর ঊর্ধ্বে আমাদের উঠতেই হবে। সেটা একটা মস্ত বড় কাজ। প্রয়োজনে আইনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আরও একটা সমস্যা, আমরা নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নই। এই না জানা থাকায় অনেক ক্ষতি হয়ে যায় আমাদের। সরকারের কর্তব্য, সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। তাদের আইন জানতে দেওয়া। সে ব্যাপারে সচেতন করা। অধিকার জানা, বোঝা, হাতে পাওয়া, খুব জরুরি বলে মনে হয়।

শিল্প ব্যাপারটাও আমাকে ভাবায়। এই যে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, নাচ করা, এই সব কিছুই যত দিন যাচ্ছে অল্প সংখ্যক মানুষের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এগুলো দেখা বা শোনা হয়ে উঠছে খুবই ব্যয়বহুল। ছবি, নাচ, গান, এই সব কিছুকে কি সাধারণের উপযোগী করে তোলা যায় না? কম ব্যয়ে এমন কিছু করা যায় না, যাতে সমস্ত মানুষ এর অংশীদার হতে পারবে ও রসাস্বাদন করতে পারবে?

সৌজন্য : নারীযুগ

অনলাইনেও গ্রাহক হওয়া যায়
www.swarnakshar.in

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

ঘরে বসে নিয়মিত 'পেশাপ্রবেশ' পেতে ২৩০ (ক্যুরিয়ারে ৪৯০) টাকার চেক/ড্রাফট নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হোন:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19
Ph: 2283-2320 □ **E-mail:** info@swarnakshar.in

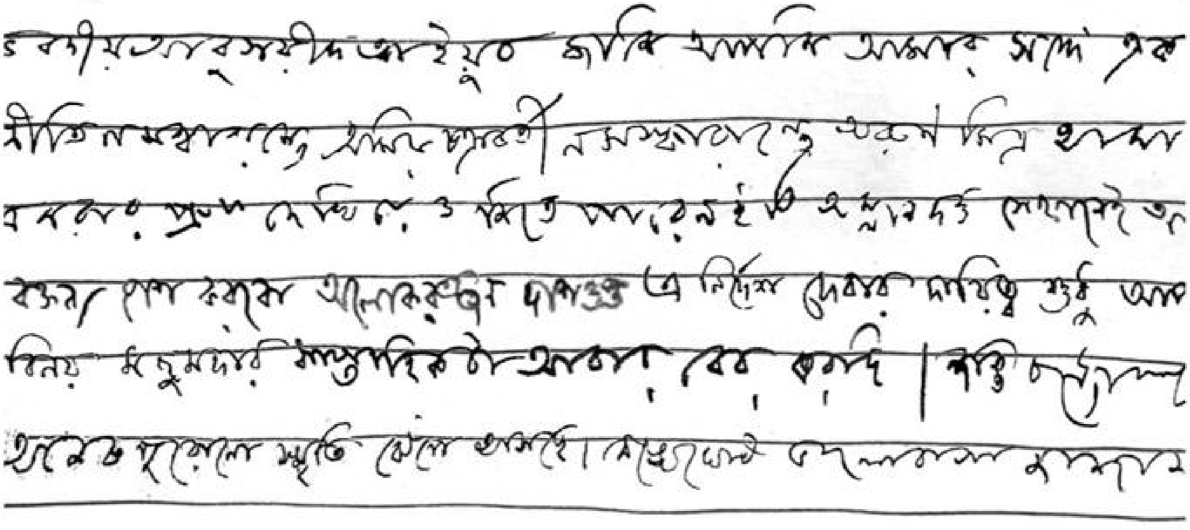

বটের ঝুরি

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা নানা গুণীজনের চিঠি

সংকলন ও যৎসামান্য টীকা: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বটগাছের যেমন ঝুরি নামে, এই চিঠিগুলিও অনেকটা সেইরকমই। সবই 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকা ঘিরে, *তবে বটের ছায়ার যে সঞ্জীবনী গুরুত্ব, হালকা-পাতলা 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার ভার সে তুলনায় সামান্যই। তা সত্ত্বেও জন্মবর্ষের হিসেবে বটের ঝুরি নামাবার বয়েস পার হয়েছে এই অবলুপ্ত পত্রিকা। সেই জন্যই প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের অল্পবয়সী অবিদ্যাধর সম্পাদককে লেখা নানা গুণীজনের চিঠি বটগাছের স্বতোঃস্ফূর্ত ঝুরি নামানোর মতো মনে হয়। এতে আমার কোনওরকম হাত ছিল না।*

বটবৃত্তের বাইরেও কয়েক জনের চিঠি এখানে সংকলিত হবে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর চিঠি

৫, পার্ল রোড
কলকাতা-১৭
৯-৭-৬৬

প্রীতিভাজনেষু,

শঙ্খ ঘোষের দ্বিতীয় লেখা পড়ে তাঁর দু'টি ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখে ফেলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। 'কবিতা-পরিচয়'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা আমার হাতে আরও আগে এলে আমার লেখাটা তৃতীয় সংখ্যায় ছাপতে পারতেন। যাই হোক, শীঘ্র একদিন এসে লেখাটা আপনার পছন্দসই কি না দেখে যাবেন। আর যদি শঙ্খ ঘোষকেও সঙ্গে আনতে পারেন তবে আরও ভাল লাগবে। কিছু মতান্তর এবং সমালোচনা থাকলেও তাঁকে আমি প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র জ্ঞান করি।

ভবদীয়
আবু সয়ীদ আইয়ুব

চিঠি/২

৫, পার্ল রোড
কলকাতা-১৭
৩-৮-৬৬

প্রীতিভাজনেষু,

কাল টেলিফোনে আপনাকে বলেছিলাম আমার লেখার মাঝখানকার কয়েকটি বাক্য কেটে দিয়ে অন্য কয়েকটি বাক্য বসিয়ে দিতে। কাটা অংশটা ঠিকই বলেছিলাম, কিন্তু substitute হিসেবে টেলিফোনে যা বলেছিলাম তার পরিবর্তে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দিলে ভাল হয়: "তুমি যাকে বলো সুন্দর তা বহুরূপী পঞ্চভূতে, চিত্রণ

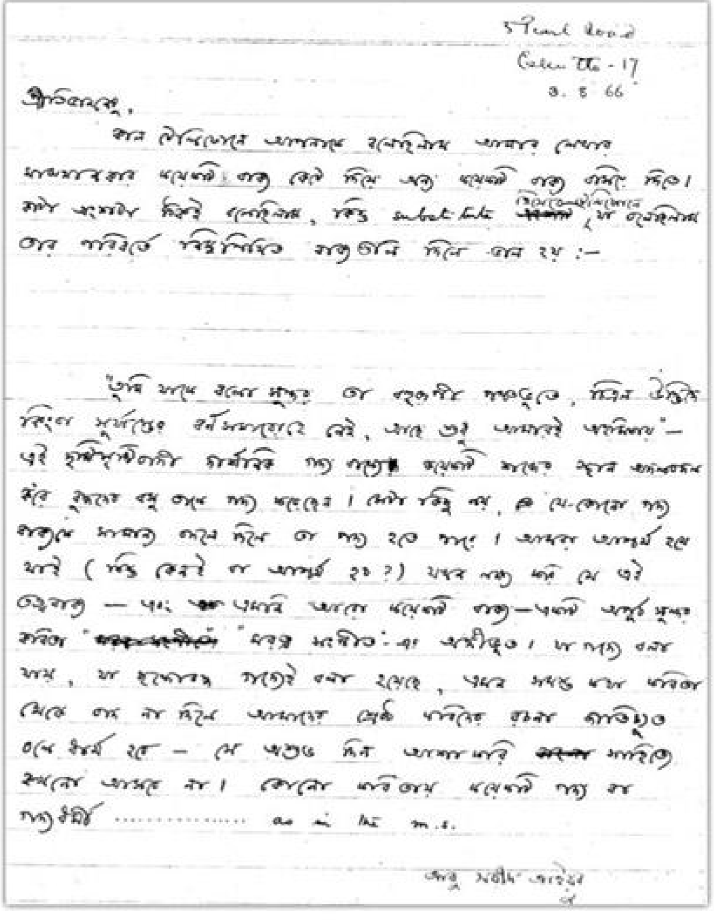

5 Pearl Road
Calcutta - 17
3. 8. 66

প্রীতিভাজনেষু,

কাল টেলিফোনে আপনাকে বলেছিলাম আমার লেখার মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটি বাক্য কেটে দিয়ে অন্য কয়েকটি বাক্য বসিয়ে দিতে। সেই অনুসারে কিছু বলেছিলাম, কিন্তু substitute ... যা বলেছিলাম তার পরিবর্তে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দিলে ভাল হয়:—

"তুমি যাকে বলো সুন্দর তা প্রকৃতির সত্যে(?), বিরল উদ্ভিদে কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে নেই, আছে শুধু আমারই অহমিকায়"— এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী দার্শনিক গদ্য বাক্যে কয়েকটি শব্দের স্থান অদলবদল করে বুদ্ধদেব বসু তাকে পদ্য করেছেন। সেটা কিছু নয়, যে-কোনো গদ্য বাক্যকে সামান্য বদলে দিলে তা পদ্য হতে পারে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই (কিন্তু কেনই বা আশ্চর্য হব?) যখন লক্ষ্য করি যে এই তত্ত্ববাক্য — এবং এমনি আরো কয়েকটি বাক্য — একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা 'মরত্ব সংগীত'-এর অঙ্গীভূত। যা গদ্যে বলা যায়, যা ছন্দোবদ্ধ গদ্যেই বলা হয়েছে, এমন সমস্ত কথা কবিতা থেকে বাদ না দিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা জাতিচ্যুত বলে ধার্য হবে — সে অশুভ দিন আশা করি সাহিত্যে কখনো আসবে না। কোনো কবিতায় কয়েকটি গদ্য বা গদ্যধর্মী .... as in the m.s.

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুবের মূল চিঠি

আসল কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের অধিকাংশ কবিতা শঙ্খ ঘোষের ভাল লাগে না, আমার লাগে। এ নিয়ে তো তর্ক চলে না। সাহিত্য তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে অবশ্য চলতে পারে।

উদ্ভিদে কিংবা সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে নেই, আছে শুধু আমারই অহমিকায়''— এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী দার্শনিক গদ্য বাক্যে কয়েকটি শব্দের স্থান অদলবদল করে বুদ্ধদেব বসু তাকে পদ্য করেছেন। সেটা কিছু নয়, যে-কোনো গদ্য বাক্যকে সামান্য বদলে দিলে তা পদ্য হতে পারে। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই (কিন্তু কেনই বা আশ্চর্য হব?) যখন লক্ষ্য করি যে এই তত্ত্ববাক্য— এবং এমনি আরো কয়েকটি বাক্য— একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা 'মরত্ব সংগীত'-এর অঙ্গীভূত। যা গদ্যে বলা যায়, যা ছন্দোবদ্ধ গদ্যেই বলা হয়েছে, এমন সমস্ত কথা কবিতা থেকে বাদ না দিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা জাতিচ্যুত ব'লে ধার্য হবে— সে অশুভ দিন আশা করি সাহিত্যে কখনো আসবে না। কোনো কবিতায় কয়েকটি গদ্য বা গদ্যধর্মী ... as in the m.s.[১]

আবু সয়ীদ আইয়ুব

[১] পাণ্ডুলিপিতে বাক্যের বাকি অংশ: *পংক্তি থাকলেই তার মূল্যহানি ঘটে না।*

চিঠি/৩

৫-৯-৬৬

প্রিয়বরেষু,

কয়েকটি সংযোজন পাঠাচ্ছি, আমার প্রত্যুত্তরে যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত করবেন অনুগ্রহ করে।

(২) অনুচ্ছেদের শেষে 'কবিতা-পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায়-এর পর যুক্ত হবে— ঐ প্যারাগ্রাফেই:

'প্রশ্ন'-এর নিন্দাপ্রসঙ্গে শেষ দশ বছরের কবিতা সাধারণভাবে নিন্দিত হল, কিন্তু 'প্রথম দিনের সূর্য্য' যখন দ্বিধাহীন ভাষায় প্রশংসিত হল তখন সাধারণ ভাবে শেষ দশ বছরের কবিতা তো দ্বিধাজড়িত কোনো প্রশংসাও পেল না। সমালোচনার এই ভেদনীতি কি তাৎপর্যহীন, অ্যাক্সিডেন্টাল?

(৩) অনুচ্ছেদের শেষে 'অভাব সূচনা করে না'-এর পর যুক্ত হবে ঐ প্যারাগ্রাফে:

তা ছাড়া, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে' চাননি, অনেক কথাই বলেছেন; উপলব্ধির বৈচিত্র্যে এ পর্ব বিশেষরূপে ঐশ্বর্যবান।

আসল কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বছরের অধিকাংশ কবিতা শঙ্খ ঘোষের ভাল লাগে না, আমার লাগে। এ নিয়ে তো তর্ক চলে না। সাহিত্য তত্ত্ব ও নীতি নিয়ে অবশ্য চলতে পারে। কিন্তু এমনও হতে পারে যে আমাদের সাহিত্যনৈতিক ভিন্নতার মূলে রয়েছে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ। আমি রবীন্দ্রনাথের (শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের) মানসিক প্রতিবেশী— এত নিকট না হলেও খুব দূরের নয়। সন্দেহ করছি শঙ্খের মানসিক স্বদেশ বহু নদী প্রান্তর এবং হয়তো বা পাঁচ-সাত সমুদ্র পারে। উত্তর আসতে পারে— জগৎ-নিরীক্ষয়ে মৌলিক দুরন্বয়তা থাকলেও সাহিত্যরসসম্ভোগে গরমিল ঘটবে কেন? পেশাদারি সাহিত্যবিচারে নাও ঘটতে পারে, কিন্তু একেবারে ভিন্ন মনঃপ্রতিন্যাস যাদের তারা গানের একই ঝর্নাতলায় গভীর অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। এ প্রশ্নের স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন; ইচ্ছা রইল।

(৪) শঙ্খ যখন বুঝতেই পেরেছিলেন ইত্যাদি, পূর্ববৎ।

৪র্থ অনুচ্ছেদে 'পাঁসে বিশুদ্ধ গদ্য নয়, গদ্য কবিতাই'-এর বদলে হবে 'পাঁসে বিশুদ্ধ গদ্য নয়। গদ্য কবিতার সমষ্টি'।

প্রুফ অবশ্যই দেবেন। টেলিফোনে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

৫, পার্ল রোড, কলকাতা-১৭
ফোন: ৪৪-৪৭৭১

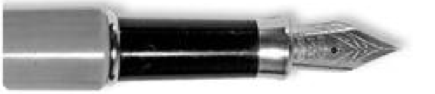

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি

প্রিয়বরেষু,
অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে স্বীকার করছি যে আমার একটা কথা মনে ছিল না; কেন জানিনা হঠাৎ ভুল ধারণা জেগেছিল যে আপনারা স্বতন্ত্র নতুন কবিতাও ছাপান। আপনাদের দুই সংখ্যা পত্রিকা এখন পেয়েই সব মনে পড়ে গেল। অনর্থক আপনাকে কবিতা পাঠিয়ে এবং নানারকম অবান্তর দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছি এ জন্যে ক্ষমা করবেন।

কবিতাটা অনুগ্রহ করে আমাকে ফেরৎ পাঠাবেন। এক যদি সম্ভব হয়: অপ্রকাশিত নতুন কবিতার উপর মন্তব্য সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো— তাহলেই রাখবেন। কিন্তু বোধ হয় তা সম্ভবপর নয় (আমি জানি শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অথবা শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য ঐ কবিতাটার আধুনিক পশ্চিমজড়িত উপমা নিয়ে আলোচনা করতে হয়তো রাজি হতেন)। এ বিষয়ে আপনি যা সমীচীন মনে করেন তাই আমার পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। সে কথা বলাই বাহুল্য।

আপনাদের ৩ এবং ৪ সংখ্যা খুবই অভিনব মননশীল সাহিত্যরুচির এবং গভীর অনুশীলনের পরিচয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি কবিতার উপর ঐভাবে মন্তব্য রচনা করে আপনার কাছে পাঠাবো। কিন্তু 'ভবিষ্যতে' কথাটা ভবিষ্যতের জন্যেই রাখতে বাধ্য হলাম কেননা সবেমাত্র এই সম্পূর্ণ নূতন কলেজের কাজে যোগ দিয়ে একেবারে জড়িত হয়েছি। পুরোনো জালজঞ্জালও পূরোমাত্রায় রয়েছে। তার থেকে ছিন্ন হতে পারিনি। হয়তো তা হতেও চাই না। সুতরাং এখনো দুতিন মাস পর্যন্ত আমি স্বাধীন একটুও হবার আশা রাখি না।

তার পূর্বে ইচ্ছা আছে আপনাদের সম্পাদকের দপ্তরে একটি চিঠি পাঠাব— শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ এবং আইয়ুব সাহেব আমার 'বৃষ্টি' কবিতা নিয়ে যে অতি নিপুণ অতি সূক্ষ্মদর্শী আলোচনা করেছেন তাই নিয়ে দুএকটা কথা যোগ করতে চাই। কবিতাটার শেষ কয়েকটা লাইন বিষয়ে সামান্য কিছু বলবার ছিল। সত্যই আমি ঐ আলোচনাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি— আঙ্গিকের অমন ধারালো অভিজ্ঞ বিচার আমার কাছে আশ্চর্য এবং অপ্রত্যাশিত আনন্দের ঘটনা। টেকনীকের তত্ত্ববিচারের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে লীরিক কবিতার মর্মগামী পরিচয়। 'দার্শনিক দৃষ্টি' বলতে যা বোঝায় তাও বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে ঐ আলোচনায়। সাধারণ ভাবে বলা চলে আপনাদের 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার সমালোচনাগুলি উচ্চ দরের। প্রাঞ্জল সংহতি, ঔদার্য এবং স্থিতপ্রজ্ঞ সার্বিক সাহিত্য বোধের দিক থেকে রচনাগুলি উজ্জ্বল। আমি এই চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে 'বৃষ্টি' কবিতাটার সমালোচনা নিয়ে কিছু উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু বলবার কথা কেবল ঐটুকুর সম্পর্কে নয়। পরে এই নিয়ে লিখব।

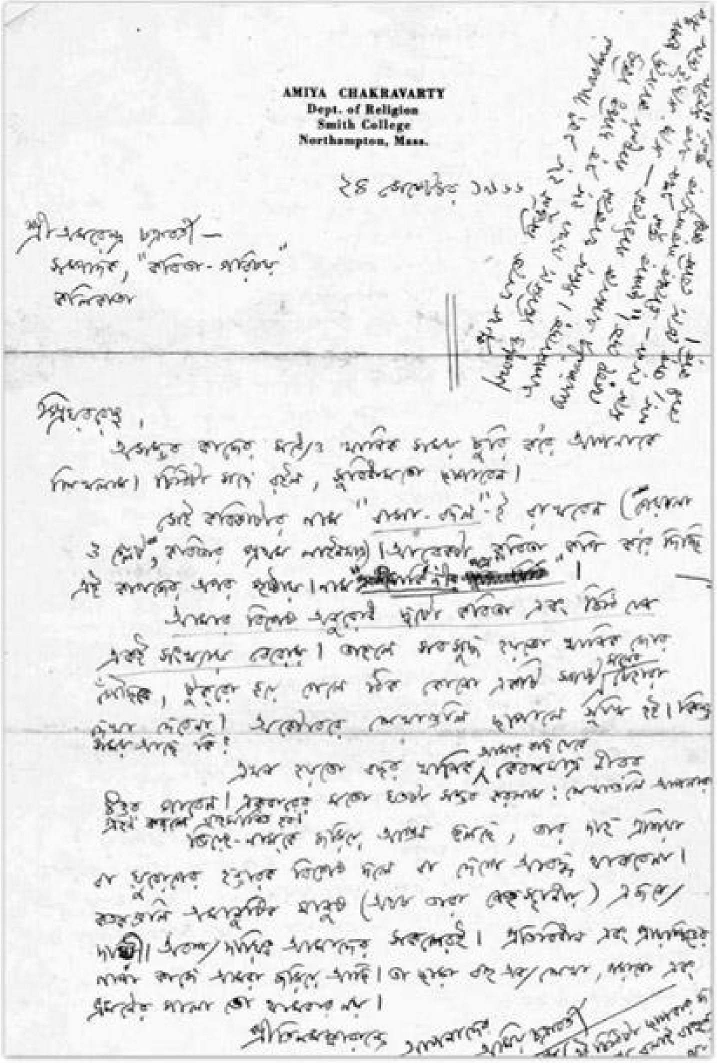
AMIYA CHAKRAVARTY
Dept. of Religion
Smith College
Northampton, Mass.

অমিয় চক্রবর্তীর মূল চিঠি

আবার উল্লেখ করি 'পেয়ালা ও প্লেট' কবিতাটার বিষয়ে। ঐ ক্ষুদ্র রচনায় আমি অতিমাত্র বাস্তব এবং আধুনিক পশ্চিমী রান্নাঘরের বাস্তবকে ব্যবহার করেছি হৃদয়ের গভীরতম বিচ্ছেদ এবং জন্মমৃত্যুর প্রতীক রূপে— হয়তো এই নির্লজ্জ নিঃশঙ্ক ব্যাবহারিক বাস্তবতার ঐ রচনাটা আপনাকে পাঠাতে সাহস পেয়েছিলাম। কিন্তু অন্য আর সব কথা ভুলেছি! এ জন্যে পুনর্বার মার্জন কামনা ক'রে এই চিঠি শেষ করি।

প্রীতি নমস্কারান্তে
আপনাদের অমিয় চক্রবর্তী

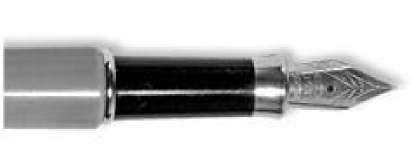

ভিয়েৎ-নাম্‌কে জড়িয়ে আগুন জ্বলছে, তার দাহ এশিয়া বা য়ুরোপের হন্তারক বিশেষ দলে বা দেশে আবদ্ধ থাকবে না।

অমিয় চক্রবর্তী

আমাদের ওংকৃত জীবনেও বিরহ এসে পৌঁছয়, বৃষ্টির ধারাবর্ষণে যে-বেদনা নেই তাকে মিশ্রিত করি আমাদের বেদনায়— হঠাৎ দাঁড়াতে চাই সত্যসত্যই যা বর্ষাজল তারি কাছে। মানুষ দুঃখ চায়, সুখ চায় কিন্তু সীমানা-বহির্ভূত বোধকেও হারাতে চায় না।

চিঠি/২

Amiya Chakravarty
Dept. of Religion
Smith College
Northampton, Mass
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

প্রিয়বরেষু,
অসম্ভব কাজের মধ্যেও খানিক সময় চুরি ক'রে আপনাকে লিখলাম। চিঠিটা সঙ্গে রইল, সুবিধামতো ছাপাবেন।

সেই কবিতাটার নাম 'বাসা-বদল'-ই রাখবেন (পেয়ালা ও প্লেট, কবিতার প্রথম লাইনমাত্র)। আরেকটা কবিতা কপি ক'রে দিচ্ছি এই কাগজের অপর পৃষ্ঠায়। নাম 'প্রবাসী মার্কিনীর পত্র'।

আমার বিশেষ অনুরোধ দুটো কবিতা এবং চিঠি যেন একই সংখ্যায় বেরোয়। তাহলে সবসুদ্ধ হয়তো খানিক জোর পৌঁছবে। টুকরো হয়ে গেলে ঠিক কোনো একটি স্পষ্ট মনের চেহারা দেখা দেবে না। অক্টোবরে লেখাগুলি ছাপালে সুখি হই। কিন্তু সময় আছে কি?

এখন হয়তো বছর খানিক আমার কাছ থেকে কেবলমাত্র নীরব উত্তর পাবেন। একবারের মতো যতটা সম্ভব করলাম: লেখাগুলি আপনারা গ্রহণ করলে বহুমানিত হব।

ভিয়েৎ-নাম্‌কে জড়িয়ে আগুন জ্বলছে, তার দাহ এশিয়া বা য়ুরোপের হন্তারক বিশেষ দলে বা দেশে আবদ্ধ থাকবে না। কতকগুলি অমানুষিক মানুষ (অথচ তারা নেতৃস্থানীয়) এ জন্যে দায়ী। অবশ্য দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। প্রতিবিধান এবং প্রায়শ্চিত্তের নানা কাজে আমরা জড়িয়ে আছি। তা ছাড়া বহু অন্য লেখা, পড়ানো এবং ভ্রমণের পালা তো থামবার নয়।

প্রীতিনমস্কারান্তে
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

প্রবাসী মার্কিনীর পত্র
অমিয় চক্রবর্তী

'শোনো বন্ধু এখানেও দেখি যুগ-ছায়ার সঞ্চার
মধ্যধরণী সিন্ধু যদিও প্রশান্ত দুই ধারে—
আগে বলি কোথা আছি, সূর্য সম্ভব
আঙুরলতার দেশ, গ্রামশ্রী ফুটেছে বৈভবে;
শৈল-সন্ধি আরণ্য-অন্দর
লেরিটি-র ইতালি বন্দরে
একদিকে মধ্যযুগ পরিখা প্রাসাদ
নীল বায়ু কেটে ওঠে, নিচু অন্যদিকে খাদে
অগণ্য জল জ্বলে নুড়ি মসৃণ রঙিন
বর্ণাঢ্য দেখিনি এত কোনো দিনে,
জাল-ফেলা তীরে নৌকো, মাস্তুল, কাছেই ঘর বাড়ি
শ্যামস্তর বৃক্ষদোল ছায়া-প্রফালিত উঁচু পাড়ে;
অদূরে কারারা গিরি, নদী বিসর্পিত
—ওখানে মার্বেল খুঁজে সৃজন নিভৃতে
মাইকেল্‌ এঞ্জেলো নিজে এসে বারবার
পেয়েছেন পূর্বকালে আপন পাথর ভারে ভারে—
পাশেই তাঁবুতে আছি আমার শিশুকে নিয়ে ঘর,
মধ্যাহ্নে জীবনসুধা দুচোখে উঠছে ভ'রে ভ'রে,
আমি চিত্রী, ছবি আঁকি, এখানে সহজ প্রতিবেশ
রেস্তরাঁয় প্রদর্শনী, উৎসাহ মধুর হয়ে মেশে,
ফলে ফুলে সবজি স্তরে দোকানে তৃপ্তির কত সাজ,
স্বচ্ছ শূন্যে অভিমান গোলাপি— সোনালি ভোরে সাঁঝে,—
লাতিন আলোর স্বর্গে তবু তীব্রহ হানে ভিয়েৎ-নাম,
কী যুদ্ধে নেমেছে মন্ত্রী বলতে পারো কেন, কার নামে?
সেই হিরোসিমা আজো যথেষ্ট হয়নি অভিশাপ?
হাঙ্গেরিও হার মানে নেপামে দগ্ধানো গ্রাম্য তাপে;
মাথা নিচু করি, বন্ধু, পাপের পবন স'রে যায়—
তবু লজ্জা মেঘ হয়ে লাগে দূর থেকে সারা গায়ে।।'

নর্থ হ্যাম্পটন
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬

চিঠি/৩

সম্পাদক সমীপেষু
'বৃষ্টি' কবিতা নিয়ে নরেশ গুহ যে সূক্ষ্ম নিপুণ আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর সৌজন্য এবং প্রখর অনুশীলনবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধের পাঠকরূপেই বলছি; নিজের কবিতার মূল্যনির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার সাধ্যেরও অতীত।

প্রসাদগুণ এবং সতর্ক বিচারবুদ্ধির যুগ্ম পরিচয় সমালোচনা সাহিত্যে দুর্লভ; ঐ সামঞ্জস্যের অভাবে চাক-ভাঙা ভিমরুলের আক্রমণ নয়তো অসতর্ক প্রশংসাবৃত্তি বাংলা পত্রিকার (এবং অন্যত্র) বারবার ব্যর্থতা এনেছে। আরেকটি উপদ্রব সৃষ্টি হয় অনাবশ্যক জটিল এবং অস্বচ্ছ বাক্‌-বিস্তারে। আসলে যা মননশীল নয়, কেবলমাত্র অতিমননশীলতার ব্যক্তিগত বা যৌথ অভ্যাস তাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া চলে না। যে-আর্শিতে মূল কাব্যের একটি সমগ্র পরিচয় পাঠকের পক্ষে কাম্য তা যদি শব্দের ওজনে এবং দুর্বোধ্য মনোবিকলনে চাপা পড়ে তাহলে সেটা সাহিত্যদর্শনের নামে অত্যাচার। কবিরা অনেক দোষ করেন সন্দেহ নেই; কিন্তু কে চায় কবিতার বদলে কন্টকারণ্য?

আপনাদের পত্রিকা বহু সংকট এড়িয়ে সমালোচনার উদার প্রমিত পথে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার এই বিশ্বাস।

'বৃষ্টি'-র আলোচনায় দুএকটি প্রশ্ন আছে, তার উত্তরে কিছু বলতে চাই। নরেশ গুহ ঠিক বলেছেন 'দাঁড়ানো মানুষ দরজায়' এই লাইনের শেষে অন্তত কমা বসলে অর্থ সুস্পষ্ট হত। আমার আর্জি এই যে দুটো ছবি— আদিম যুগের একলা মানুষ এবং প্রাক্‌-ঐতিহাসিক গুহা চিত্র— একই সুদূর সংশ্লিষ্ট আবহাওয়ায় জাগাতে চেয়েছি। বৃষ্টিময় আলো-অন্ধকারের হঠাৎ দৃষ্টিতে, ঘন মেঘের হৃদ্‌গত সঞ্চার

সেই একত্রীকরণ ঘটেছে কিনা জানি না। কবিতার বাইশ পংক্তিতে 'সেই' কথাটা ব্যবহৃত হল সর্বপ্রথম সৃষ্টিক্ষণের উদ্দেশে, যেখানে আদি প্রৈতি, বৃষ্টিরও সৃষ্টিরত্ন; মানুষের দুঃখানুভূতির পূর্ব সূচনা সেইখানে। যদিও সচেতন কাল এল পরে, মানুষের সৃজনভূমিতে, সংসারে। 'মৃত্তিকার সত্তা'-কে 'স্মৃতিহীনা' বলা হয়েছে কেননা স্মৃতির শুরু চৈতন্যে, অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যে। যাকে বলা হয় প্রকৃতি তাতে সেই বোধের প্রমাণ নেই যদিও প্রসঙ্গ আছে, না হলে মানুষ ভিজে আকাশ, বর্ষার মাঠে তার বেদনা নিয়ে দাঁড়াতো না। বৈদিক পুরুষ সূক্তের প্রভাব মেনেছি— যদিও আমার সামান্য এবং ক্ষীণ কাব্যে তার প্রতিধ্বনিটুকুও পৌঁছয়নি। প্রেমের অনুরঞ্জিত মুহূর্ত নিয়েই এই লীরিকের বিস্তার।

'প্রশস্ত, প্রাচীন' সেই সামগ্রিক সত্তা যা মানুষের অধিকার ছাড়িয়ে আছে অথচ যা মানবচেতনার যুক্তাধিকারে আমাদের কাছে অর্থময়, পূর্ণতর ব্যঞ্জনাময়। যে-কটি লাইনের প্রসঙ্গ আলোচনায় তোলা হয়েছে তার বাক্যমালা বারম্বার ঐ 'আদিতম' সৃজন এবং মানুষের স্মৃতিময় যোগের চতুর্দিকে আবর্তিত। যা বলা শক্ত তাকে ধ্বনি এবং ইঙ্গিতে ব্যক্ত করার দুরাশা প্রত্যেক শিল্পীকে মধ্যে মধ্যে পেয়ে বসে।

প্রাথমিক সৃষ্টিক্ষণকে 'মুগ্ধক্ষণ' বলা বিপজ্জনক স্বীকার করি কিন্তু এই মুগ্ধতা (অথবা 'মত্ত দিনের' সমাসীন উত্তেজনা) ঠিক মানবিক চেতনার অর্থে নয়; এ যেন অপ্রতিহত, কালহীন কেবলমাত্র ২হওয়া'-র চিন্তাহীন উদ্দীপনা। যেমন আদিত্যবর্ণ যে-কোনো দিন, ধানের সবুজ, অথবা আউল-বাউল কীর্তিত 'তিলের মধ্যে ত্যাল'। দুর্নিবার বেদনায় মানুষ হঠাৎ যা-আছে তাকে আবিষ্কার ক'রে আত্মস্থ হয়; যাকে আমরা বলি 'প্রকৃতিস্থ' সেই ডাক; রোদে-জলে জানে সেই 'জলের রানীকে' যাকে বারেবারে জীবনের প্রেমাশ্রুতে ধরা গেল না। আমাদের অনেকখানি উৎসব সেই 'বেশির' বা 'অন্যের' উৎসব, হয়তো একান্ত জীবনের নহবৎখানা তখন নিস্তব্ধ। 'অবিরহ প্রথম ঝংকার' ঐ কবিতায় ঝংকৃত করার চেষ্টা বা ইচ্ছা ছিল কারণ আমাদের ওংকৃত জীবনেও বিরহ এসে পৌঁছয়, বৃষ্টির ধারাবর্ষণে যে-বেদনা নেই তাকে মিশ্রিত করি আমাদের বেদনায়— হঠাৎ দাঁড়াতে চাই সত্যসত্যই যা বর্ষাজল তারি কাছে। মানুষ দুঃখ চায়, সুখ চায় কিন্তু সীমানা-বহির্ভূত বোধকেও হারাতে চায় না।

ইত্যাদি। অনেকখানি লিখলাম, কিন্তু আর নয়। আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথিত মন্তব্য আমার কাছে ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত। একই সমালোচনায় দুই বিদগ্ধ মনের পরিচয় সুদূর শহরে আমার কাছে পৌঁছল, সহযোগিতার ভারতীয় স্পর্শ অনুভব করলাম।

অমিয় চক্রবর্তী

নর্থ হ্যাম্পটন
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬

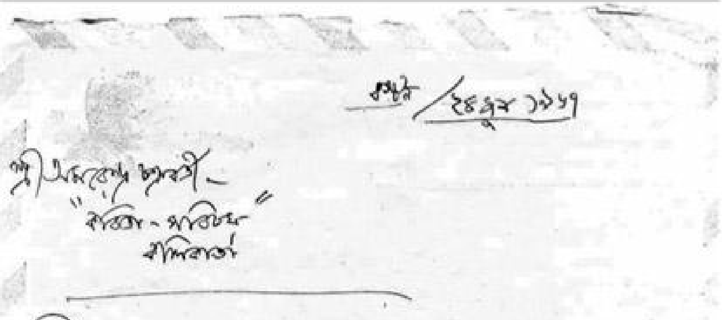
শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী —
"কবিতা-পরিচয়"
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

চিঠি/৪

Dept of Religion, Smith College
Northampton, Mass
১২ই মার্চ, ১৯৬৭

প্রিয়বরেষু,

আমার বহুদিন পূর্বে পাঠানো কবিতা এখনো আপনারা ছাপান নি তাই সেটা অন্যত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করব। নিশ্চয়ই কোনো অনিবার্য কারণে আপনাদের পত্রিকা বের হয় নি, আমার কবিতাটাও পড়ে আছে। এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই— কেবল এই আশা করব যে আপনাদের সুন্দর এবং সার্থক পত্রিকাটি আবার কোনো সময়ে নূতন হয়ে দেখা দেবে।

কয়েকদিন অপেক্ষা করব— তার পরে কবিতাটার ছাপা বিষয়ে অন্য আয়োজন করছি।

প্রীতিনমস্কারান্তে
ভবদীয়
অমিয় চক্রবর্তী

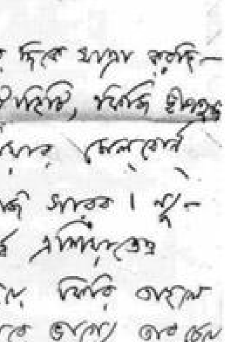
নরেশ গুহ

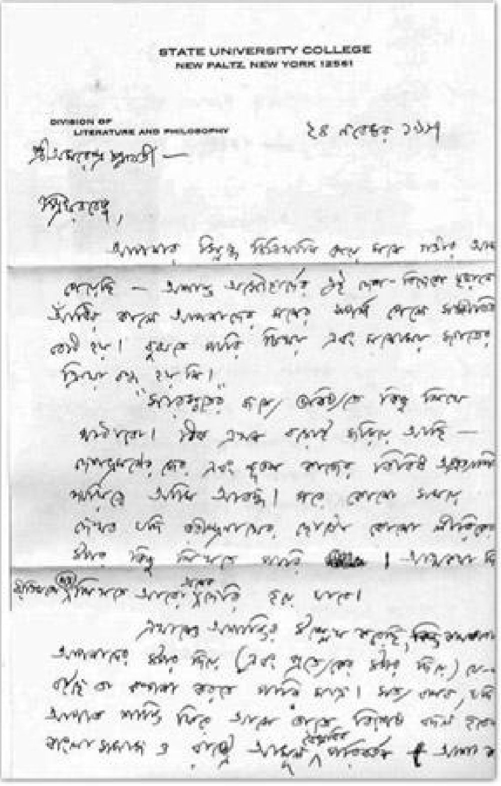
STATE UNIVERSITY COLLEGE
NEW PALTZ, NEW YORK 12561

DIVISION OF
LITERATURE AND PHILOSOPHY

চিঠি/৫

Smith College,
Northampton,
Mass
April 14, 1967

প্রিয়বরেষু,
কবিতাটা শীঘ্রই আপনাদের নতুন সংখ্যায় বার করবেন জেনে আনন্দিত হলাম।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা সচরাচর ঘটে না তা আপনি জানেন— আমার কবিতা আপনাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে মাসের পর মাস পড়ে থাকবে কল্পনাও করতে পারি নি।

কিন্তু আপনাদের বিশেষ নানারকম বিপর্যয় অর্থ-সংকটের কথাও বুঝতে পারি। নতুন কবিতা না-ছাপানোই ভালো কারণ আপনাদের প্রতিষ্ঠিত রীতি অন্য। পুরোনো (অর্থাৎ পূর্বে প্রকাশিত) কবিতার নতুন প্রকৃষ্ট আলোচনার ক্ষেত্র আপনাদের পত্রিকায় বিস্তৃত হলেই ভালো হবে।

নবম সংখ্যাটির জন্যে অপেক্ষা করছি। (কবিতাটার প্রুফ অতি সাবধানে যাতে নির্ভুল হয় তা আপনারা দেখবেন জানি।) প্রীতিনমস্কারান্তে

অমিয় চক্রবর্তী

এ ধরনের অভিজ্ঞতা সচরাচর ঘটে না তা আপনি জানেন— আমার কবিতা আপনাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে মাসের পর মাস পড়ে থাকবে কল্পনাও করতে পারিনি।

চিঠি/৬

Smith College, Dept of Religion
Northampton, Mass

৫ই জুন ১৯৬৭

প্রিয়বরেষু,
সেই কবিতাটা এতদিনে বেরিয়েছে কিনা জানি না। যদি শীঘ্রই বেরোবার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে এক ছত্র লিখে জানাবেন, অন্য কোনো ব্যবস্থা করব।

এটা আমার দিক থেকে অধৈর্যের ব্যাপার নয় তা আপনি বুঝবেন জানি। আমার অভিজ্ঞতায় কখনো এরকম ঘটেনি— মাসের পর মাস কবিতা না-ছাপা হয়ে মাসিকপত্রের দপ্তরে পড়ে আছে এটা আমার পক্ষে সত্যই অবিশ্বাস্য।

কবিতার নাম বদলিয়েছি— ইতালি প্রবাসিনীর পত্র এই নামটাই বসবে। কবিতায় কিছু বিদেশী নাম ইত্যাদি আছে— অত্যন্ত সাবধানে প্রুফ দেখা দরকার।

প্রীতি নমস্কারান্তে
অমিয় চক্রবর্তী

চিঠি/৭

বস্টন
২৪ জুন ১৯৬৭

প্রিয়বরেষু,
দুএকদিনের মধ্যেই হাওয়াই-দ্বীপের দিকে যাত্রা করছি— এবারে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া, টাহিটি, ফিজি দ্বীপপুঞ্জগুলিতে ঘুরব এবং ২০ জুলাই নাগাদ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুএকটা বক্তৃতা দেবার কাজ সারব। ন্যু-জীল্যাণ্ড হয়ে জাপান এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও ভ্রমণের কথা আছে। যদি স্বদেশ হয়ে ফিরি তাহলে হয়তো দিন দুয়েকের পালা— এবারে ভাগ্যে তার চেয়ে বেশি সময় নেই। পরের বছরে যদি পারি আরো বেশি কিছুদিনের জন্যে দেশে যাবো।

যাই হোক, আমার অনুরোধ এই যে আপনাদের পত্রিকার সমাপ্তি সংখ্যা যেন অস্ট্রেলিয়ার ঠিকানায় আমাকে এয়ার-মেলে পাঠিয়ে দেন। এই নামের পিছনে পুরো ঠিকানা রইল— ২০ থেকে ২৬/২৭ জুলাই ঐ ঠিকানায় আমার কাছে চিঠি পৌঁছবে।

'সারস্বত' যখন শ্রাবণে বেরোবে তখন আমার ঠিকানা এই মার্কিন দেশ— আগস্টের শেষে ফিরব। কবিতাটা ঐ নূতন পত্রিকায় বার করা সম্বন্ধে আমার পুরো সম্মতি রইল। (প্রুফ দেখার বিষয়ে আমার চিরাচরিত সাবধানী অনুরোধ জানিয়ে রাখি।)

বিশ্বসংসারকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে দেখবার সাধ— বিশেষ ক'রে যেসব দেশের কথা শৈশব থেকে শুনেছি অথচ দেখিনি সেই প্রান্তে যাবার বাসনা। R.L.S.-এর দ্বীপে সেই South Pacific রাজ্যে কোনোদিন তাঁর জীবনস্মৃতিজড়িত স্থানে গিয়ে দাঁড়াবো ভেবেছি— এতদিনে বোধ হয় আশা পূর্ণ হবে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কিছু অনুশীলনের কাজ নিয়েছি। এদেশে ফিরে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পড়ানোর বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি ন্যুইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চলাচলের হাওয়া বইছে— এই নির্যাতিত যুদ্ধজর্জরিত মানুষের সমাজে আরো আজ একান্ত প্রয়োজন ঘটেছে ব্যাধির অতীত আত্মিক শক্তির যেন সন্ধান পাই— সেই শক্তির প্রত্যেক মানুষের পরামায়ুর সঙ্গে জড়িত কিন্তু মধ্যে মধ্যে তারি খোঁজে কাছে দূরে ঘুরতে হয়। ভিয়েৎ-নামের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যধরণীর অঞ্চলে দুঃস্থ জনসাধারণের উপরে যে-পাশবিক

আক্রমণ ঘটল তাতে মর্মাহত হয়েছি— কারণ যেমনই হোক এ ভাবে তার প্রতিকার হবে না।

প্রীতি নমস্কারান্তে
অমিয় চক্রবর্তী

Amiya Chakravarty
C/o. American Express
140 Scottish Am. House
Melbourne, Australia

চিঠি/৮

State University College
New Paltz,
New York 12561
Division of Literature and Philosophy

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

প্রিয়বরেষু

অত্যল্প সময় এবারে কলকাতায় ছিলাম— তারই মধ্যে আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সফল হইনি। আমাদের বন্ধু অলোকরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁরই কাছে আপনার বিষয়ে এবং 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকা সম্বন্ধে কথা কয়ে তৃপ্ত হলাম।

এ দেশে ফিরে এসেই শেষ সংখ্যা 'কবিতা-পরিচয়' পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। যদিও এই পর্যায়ের এটি শেষ সংখ্যা তবু এতে অবসানের চেয়ে নূতন অধ্যায়ের ইঙ্গিতই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ত্রৈমাসিক শীঘ্রই দেখা দেবে এই প্রত্যাশায় থাকব।

যদিও আলোচনাটি আমারই ক্ষুদ্র লীরিকের, তবু না ব'লে পারব না যে মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। তিনি যে গভীর নিপুণ মানসের যোগে আমার একান্ত একটি রচনার নিহিতার্থ উদ্ধার করেছেন তা আমার কাছে বিস্ময়কর, অমিত প্রেরণার ইন্ধনস্বরূপ। তাঁর উৎসাহে আমি শক্তি লাভ করেছি। আমার আন্তরজীবনদর্শন কয়েকটি চরম পংক্তিতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম— সমালোচকের সূক্ষ্ম অনুভূতির জালে তা ধরা পড়েছে। অর্জিত কোনো অধিকার আমার নেই, কিন্তু প্রাণের চরম সঞ্চিত উপলব্ধি ব্যক্ত করবার চেষ্টায় আজ এই নূতন সমর্থন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

পৃথিবী পরিক্রমার একটি বৃহৎ পর্ব শেষ করে মার্কিনে ফিরেছি— এখনো এশিয়া অস্ট্রেলেশিয়া য়ুরোপের তীর্থস্মৃতি মনে সর্বক্ষণ জেগে উঠছে— চিঠি লেখার চেয়ে এখন স্তব্ধতাই প্রশস্ত। কিন্তু আপনাদের কাছে এই ক্ষুদ্র পত্র না পাঠিয়ে পারলাম না।

প্রীতি নমস্কার জানবেন—
ভবদীয়
অমিয় চক্রবর্তী

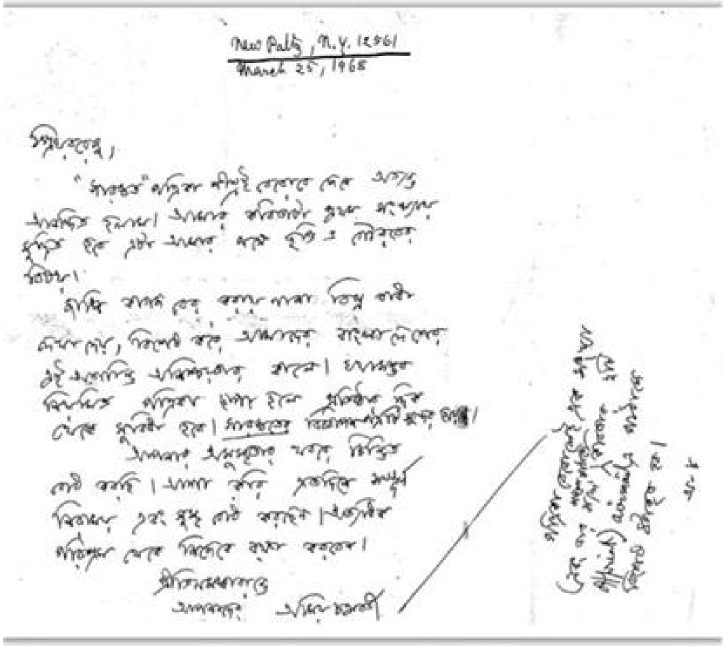
New Paltz, N.Y. 12561
March 25, 1968

চিঠি/৯

State University College
New Paltz, New York 12561
Division of Literature and Philosophy

২৪ নভেম্বর ১৯৬৭

প্রিয়বরেষু,

আপনার স্নিগ্ধ চিঠিখানি পেয়ে মনে গভীর আনন্দ পেয়েছি— অশান্ত অসৌহার্দের এই দেশ-বিদেশে ছড়ানো আঁধির কালে আপনাদের মনের স্পর্শ পেলে সঞ্জীবিত বোধ হয়। বুঝতে পারি চিন্ময় এবং মনোময় জগতের ক্রিয়া বন্ধ হয়নি।

'সারস্বতের' জন্যে ভবিষ্যতে কিছু লিখে পাঠাবো। ঠিক এখন বড়োই জড়িয়ে আছি— দেশভ্রমণের জের এবং নূতন কাজের বিবিধ অপ্রত্যাশিত দায়িত্বে আমি আবদ্ধ। পরে কোনো সময়ে দেখব যদি রবীন্দ্রনাথের ছোটো কোনো লীরিকের উপর কিছু লিখতে পারি। আত্মকথা দিয়ে রীতিমতো পত্র লিখতে আরো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এখানেও অশান্তির উল্লেখ করেছি, কলকাতায় আপনাদের উপর দিয়ে (এবং প্রত্যেকের উপর দিয়ে) যে-ঝড় বইছে তা কল্পনা করতে পারি মাত্র। সত্য বলব, যদি বা আপাত শান্তি ফিরে আসে তাতে বিশেষ বদল হবে না। বাংলা সমাজ ও রাষ্ট্রে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন (আশা করি সেই বিপ্লব 'রুধির প্রদিগ্ধ' হবে না, যথার্থই প্রতিকারী হবে) না ঘটলে বাংলার অর্থসামর্থ সবই তলিয়ে যাবে।

এরি মধ্যে আপনারা সাহিত্যের সংস্কৃতির কেতন

যদি বা আপাত শান্তি ফিরে আসে তাতে বিশেষ বদল হবে না। বাংলা সমাজ ও রাষ্ট্রে আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটলে বাংলার অর্থসামর্থ সবই তলিয়ে যাবে।

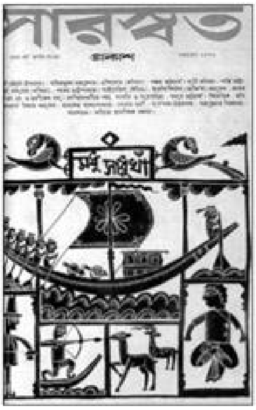

'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকার একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ

কাম্বোডিয়ায় মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র তাদের দুর্নীতির বিপক্ষে এই আন্দোলন। ফলে এদের সরকার স্বদেশী ছাত্রছাত্রীদের গুলি করে মারতে দ্বিধা করল না— তাতে দুঃখ আক্রোশ শতগুণ বেড়ে গেল।

কোনোরকম উড্ডীন রাখুন এই কামনা করি।

সম্প্রতি 'অয়ন' পত্রিকাপত্র পেয়েছি অলোরঞ্জনের কাছ থেকে। খুব ভালো লাগল। ক্ষুদ্র একটি শ্যামল তৃণও মরুর চেয়ে বেশি— বাঙালির সৃষ্টিশীলতা সহজে ধ্বংস হবে না। অলোকরঞ্জনকে আমার প্রীতি জানাবেন— তার ঠিকানা আমার কাছে খুঁজে পাচ্ছি না। তার ভাষায় একটি ধারালো অথচ প্রসন্ন ভাব আমাকে মুগ্ধ করে। যথার্থ সংস্কৃত ভাষায় প্রতিষ্ঠিত তার খাঁটি বাংলা-লেখা যেমন প্রাণবান তেমনি দুর্লভ মানসে অলংকৃত।

'সারস্বত' জানুয়ারি মাসে পাবো সেই আশায় রইলাম।

প্রীতি নমস্কার।
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

চিঠি/১০

State University College
New Paltz, New York 12561
Division of Literature and Philosophy
March 14, 1968

প্রিয়বরেষু,
আপনাদের পত্রিকা এবং আমার সেই কবিতার বিষয়ে কোনো সংবাদ পেলাম না। বোধ হয় কাগজটা বের করা সম্ভব হয়নি।

এখন অন্য কোথাও কবিতাটা বার করতে চাই। অনেক সময় চলে গেল। এভাবে দেরি করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না— রচনা দীর্ঘদিন ফেলে রাখা লেখকের দায়িত্বহীনতা প্রমাণ করে। জানি আপনি আমার সঙ্গে একমত।

প্রীতিনমস্কারান্তে অমিয় চক্রবর্তী

চিঠি/১১

New Paltz, New York 12561
March 25, 1968

প্রিয়বরেষু,
'সারস্বত' পত্রিকা শীঘ্রই বেরোবে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমার কবিতাটা প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হবে এটা আমার পক্ষে তৃপ্তি ও গৌরবের বিষয়।

জানি কাগজ বের করায় নানা বিঘ্ন বাধা দেখা দেয়। বিশেষ করে আমাদের বাংলা দেশের এই অশান্তি অনিশ্চয়তার কালে। যথাসম্ভব নিয়মিত পত্রিকা ছাপা হলে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সুবিধা হবে। সারস্বতের বিজ্ঞাপনপত্রটি সুন্দর হয়েছে।

আপনার অসুস্থতার খবরে চিন্তিত বোধ করছি। আশা করি এতদিনে সম্পূর্ণ নিরাময় এবং সুস্থ বোধ করছেন। অত্যাধিক পরিশ্রম থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন।

প্রীতি নমস্কারান্তে
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

পত্রিকা বেরোলেই এক সংখ্যা (এবং তার সঙ্গে পাৎলা কাগজে কবিতার দুটি offprint) airmail-এ পাঠালে বিশেষ উপকৃত হব। অ-চ

চিঠি/১২

State University College
New Paltz, New York 12561
USA
২০ জুন ১৯৬৮

প্রিয়বরেষু,
সারস্বত উৎকৃষ্ট পত্রিকা হয়েছে। আপনার 'নিরন্তর' বিশেষ ভালো লাগল। শ্রীযুক্ত অন্নদা শঙ্কর রায়ের লেখা প্রমথ চৌধুরীর প্রসঙ্গে মনোজ্ঞ, সুচারু রচনা। আরো অনেক লেখাই উজ্জ্বল। জনমনুষ্য লেখাটায় কথা ও নক্সা সুন্দর বসেছে। নরেশবাবুর সমালোচনাটি চমৎকার। আমার কবিতা সম্পূর্ণ নির্ভুল ছাপা হয়েছে— মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এই নতুন পত্রিকায় সেটা ঠিক মানিয়েছে। (আশা করি ছন্দ ও মিলের তির্যক বৃত্তি পাঠকের চোখে পড়বে; তা ছাড়া দূর ইতালির হাওয়া কল্পনায়-বাস্তবে মিলিয়ে ধ'রে দিতে চেয়েছিলাম)

আপনাদের পত্রিকার পূর্ণ জীবন এবং অক্ষুণ্ণ যৌবন কামনা করি। এখানে কাজে চিন্তায় ভ্রমণে আমার গ্রীষ্মের পাত্র একেবারে ভরে উঠেছে।

অভিনন্দন জানাই।

প্রীতি নমস্কারান্তে,
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

চিঠি/১৩

State University College
New Paltz, New York 12561
Division of Literature and Philosophy
May 27, 1970

প্রিয়বরেষু,
ভেবেছিলাম এর আগেই ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। দেরি হয়ে গেল। নিশ্চয়ই জানেন এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপক এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় মহলে তুমুল বিপ্লব চলেছে। কাম্বোডিয়ায় মার্কিন

বর্বরতার বিরুদ্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র তাদের দুর্নীতির বিপক্ষে এই আন্দোলন। ফলে এদের সরকার স্বদেশী ছাত্রছাত্রীদের গুলি করে মারতে দ্বিধা করল না— তাতে দুঃখ আক্রোশ শতগুণ বেড়ে গেল। এই কলেজেও ঝড় উঠেছিল। পড়াশোনা বন্ধ— সবেমাত্র একটু জেগে উঠেছে। রাষ্ট্রিক নই বলে এই আশ্চর্য চৈতন্যময় ঘটনায় জড়িত হব না, শান্তি ও সত্যের সপক্ষে দায়িত্ব নেবো না এমন মনস্তত্ব আমার পক্ষে অচিন্তনীয়— এরকম আলোড়ন জীবনে কমই অনুভব করেছি। গান্ধীজির সময়কার বহু ভারতীয় দৃশ্য মনে পড়ে যায়।

যাই হোক, লেখার উপযুক্ত মন ছিল না এইটেই আমার বক্তব্য। পাঁচ-ছ-দিনের মধ্যে একটা রচনা পাঠিয়ে দেবো, শুরু করেছি। কিন্তু খুব সম্ভব আপনাদের কাগজ তার মধ্যে বেরিয়ে যাবে। তাহলে অন্য কোনো সংখ্যার জন্যে বা অন্যত্র ব্যবহারের জন্যে যা ঠিক মনে হয় করবেন।

আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

অমিয় চক্রবর্তী

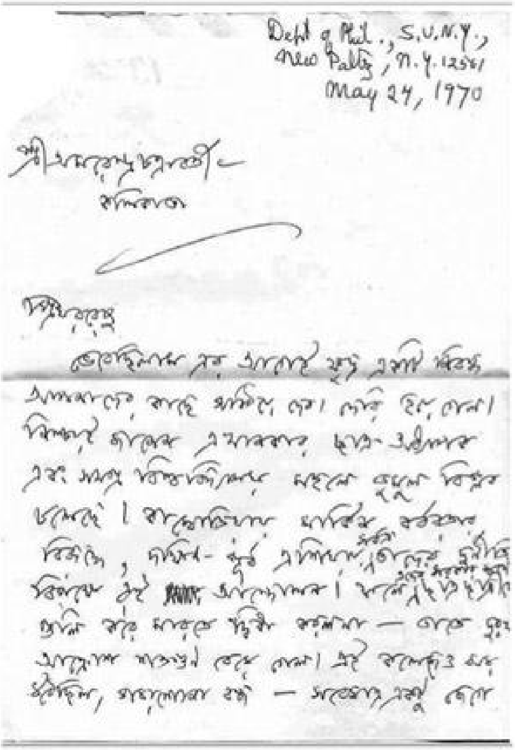
Dept of Phil., S.U.N.Y.,
New Paltz, N.Y. 12561
May 24, 1970

চিঠি/১৪

State University College
New Paltz, New York 12561
Division of Literature and Philosophy
১২ই জুন ১৯৭০

প্রিয়বরেষু,

পাঠাতে বড় দেরি হয়ে গেল। দরকারমতো লেখাটাকে সংস্কৃত করবেন, ভুল ভ্রান্তি বাদ দেবেন।

প্রীতি নমস্কারান্তে

আপনাদের

অমিয় চক্রবর্তী

১-২-৩-৪-৫ (প্রশ্নোত্তর নয়, প্রাসঙ্গিক)

অমিয় চক্রবর্তী

মানবসংসারে যে-অংশটুকু জল-হাওয়া-ভাষা-ইতিহাসের বিশেষ যোগে আমাদের একান্ত বাংলা স্বদেশ, তার সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক বিবিধ আন্দোলন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অঙ্গীভূত। চর্তুদিকের প্রাণধারায় আমরা অভিষিক্ত: অবচেতনায় যেমন বাংলার মেঘলা দিন, কচি ধানের নীল সবুজের বিস্তার তেমনি পাড়াপড়শির সুখদুঃখের রেশও বহু সঞ্চারিত। শুধু তাই নয়, পূর্ণ চেতনা দিয়ে স্পষ্ট জানি দেশের একটি মর্মরূপ।

আর্তির দিকে নিত্য নিরন্নের ভিড়, বাংলার পল্টন পুলিশ, পাণ্ডা পুরোহিতের বিক্রম— তালিকা যতই সংক্ষিপ্ত হোক তাতে যোগ করা চাই বাদামী বুরোক্রাসির ত্রাস-ব্যবসায়ীর দল। কোথায় সেই বাঙালি লেখক, চিত্রী সাঙ্গীতিক যাঁর রচনায় এই স্বদেশী সমাজ অস্তিমের মূল্যে স্বীকৃত নয়? হয়তো এই স্বীকৃতি সব সময়ে অতি প্রকট নয় কিন্তু আমাদের কারো পক্ষেই আপন সমাজকে অবজ্ঞা ক'রে শিল্পী সাহিত্যিক সাজা চলবে না।

পরিবেশের মাঙ্গলিক দিকও মানতে হয়। সেখানে খোল-করতাল বাজে, অভাব-অভিযোগের উর্ধে শুনতে পাই শঙ্খ-সানাইয়ের ধ্বনি, চিরন্তন বাংলার গৃহস্থ সংসারে দেখি প্রত্যহের কল্যাণ। এই চরম দুর্দিনেও। নতুন কালের ছেলেমেয়েদের জাগরণ সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রাগ্রসর যাত্রা। আতিশয্য পেরিয়ে প্রত্যয়ের নবীন উদ্যম।

আমার সামান্য কবিতাবলীর প্রসঙ্গ তুলেছেন। অন্য সবারই মতো বাংলা এবং ভারতীয় সম্বন্ধের আত্মিক রূপ নিশ্চয়ই আমার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও সন্দীপের দ্বীপ-সূত্রে ত্যাগী বীর লালমোহনের কাহিনী, কোথায় 'অন্ন দাও'-এর তীব্র সাক্ষ্য। জেটির কয়লা, এবং মলিন গরিত্যক্ত খালাসির ক্ষণিক উল্লাস— পাশে গড়ের মাঠ। পাগলা জগাইয়ের গান। চেতন-স্যাকরার দোকান। আরো কত কী। যেখানেই থাকি, দেশে বা পরবাসে, দূরে যাবার উপায় নেই। স্বীকার করব ক্ষোভে, ক্রোধে বেদনায় জাজ্জ্বল্যমান আমার অন্তরের বাংলাদেশ— এত ক্ষয়, ক্ষতি অত্যাচার যেন আর কোথাও দেখিনি। হয়তো এটাও প্রীতির অতিশয়োক্তি। কিন্তু দশকের পর দশক বাংলায় যা দেখলাম তার বর্ণনায় নিদারুণ রংকে বাহুল্য বলব না।

ক্ষোভে, ক্রোধে বেদনায় জাজ্জ্বল্যমান আমার অন্তরের বাংলাদেশ— এত ক্ষয়, ক্ষতি অত্যাচার যেন আর কোথাও দেখিনি। হয়তো এটাও প্রীতির অতিশয়োক্তি। কিন্তু দশকের পর দশক বাংলায় যা দেখলাম তার বর্ণনায় নিদারুণ রংকে বাহুল্য বলব না।

পূর্বেই তুলেছি পূর্ণতার কথা। যেমন করেই হোক সমগ্রের দৃষ্টি দিয়েই বাস্তবকে মানব। মনে পড়ে সেই বরিশালের স্টীমার, মেঘনার জল, অবিভক্ত বাংলার মাতৃভাষা যা কোনোদিনই বদলাবে না। শান্তিনিকেতনের আকাশ। কবিতায় শুধু দৃশ্যাবলী নয়, অন্তরের চিত্রাবলী নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছে— দুয়ের যোগে আমার কাব্যকে আপনারা বিচার করবেন। কোনো দিকেই বাদ দিতে চাইনি।

যথার্থ শিল্পী আপন রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী একটি ভার-সাম্য রক্ষা করবেন: তুমুল আন্দোলনের মধ্যেও সত্তা এবং শান্তির অধিকার হারাবেন না। প্রত্যেক আর্টিস্ট জানেন কোথায় গ্রন্থি-বাঁধা পড়ল বাংলার দুর্দশার সঙ্গে অপ্রতিহত বাংলাজীবনীর।

সম্প্রতি আমাদের সমাজচেতনা বিশ্বজুড়ে আরোই প্রবলভাবে সাহিত্যে উপস্থিত। এখানে সাহিত্যের দিক থেকে বিঘ্নও আছে কেননা আমাদের শিল্পলোক সংসারে এবং সংসারের ঈষৎ উর্ধে উভচারী। ('উর্ধ' অর্থে কোনো উন্নাসিক বা নকল আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধ।) আমার বলবার কথা এই যে যথার্থ শিল্পী আপন রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী একটি ভার-সাম্য রক্ষা করবেন: তুমুল আন্দোলনের মধ্যেও সত্তা এবং শান্তির অধিকার হারাবেন না। কোনো সাধারণ নিয়ম বা অনুজ্ঞা এখানে খাটে না,— প্রত্যেক আর্টিস্ট জানেন কোথায় গ্রন্থি-বাঁধা পড়ল বাংলার দুর্দশার সঙ্গে অপ্রতিহত বাংলাজীবনীর।

অথচ মানুষের শিল্পে যদি হঠাৎ ঝড়ের অন্ধকার নামে তাতে ভয় পাবো না। এতেও সূক্ষ্ম বোধশক্তির পরিচয়, কিন্তু আশা করি প্রলয়ের কীর্তনে সেতারের তার ছিঁড়বে না। ছিঁড়লেও আবার তার বেঁধে তুলতে হবে। আমি ভিয়েৎ-নামে গেছি এবং আজকে সাংঘাতিক দুর্বৃত্তরা যে-ভাবে কাম্বোডিয়াকে ডেমোক্রাসির নামে চূর্ণবিচূর্ণ করছে তার অনেক খবরই আমরা জানি। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে এদেশে শিল্পী, কবি, শিক্ষক, কর্মী, গৃহস্ত্রী যে-ভাবে কথায়, কাব্যে এবং পদযাত্রায় সাড়া দিয়েছেন তা আমার কাছে সাহিত্যের মূল্যেও অমূল্য। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ শিল্পকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। স্থিরবিশ্বাসে জানি যেমন এদেশে, তেমনি বিশেষ অর্থে আমার স্বদেশে, আমার বাংলায়, সাহিত্যের ধৃতিশক্তি নষ্ট হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে তরঙ্গের পারে তীরের দিকে, তরঙ্গের তলে গভীর সমুদ্রের প্রতি। সাহিত্যের অভিযানে একটি চরম লগ্ন উপস্থিত।

অমিয় চক্রবর্তী

ন্যু-গলজ, ১২ই জুন ১৯৭০

পুনশ্চ: ঠিক জবাব দেওয়া হল না কিন্তু চিঠির সূত্রে আপনাদের গভীর অনুসন্ধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। অ-চ

চিঠি/১৫

Dept of Religion
Smith College Northampton
Massachusetts, USA
১লা সেপ্টেম্বর

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার সৌজন্যপূর্ণ চিঠি পেয়েছি; পূর্বেও আপনার পাঠানো পত্রিকা সংখ্যাগুলি পড়ে সুখী হয়েছিলাম।

শুধু কাজের ভার নয়, জটিলতাও নয়— আমার সমস্ত জীবনধারা কোনো এক-বা-একাধিক মাসিক ত্রৈমাসিকে রচনা পাঠানোর পরিপন্থী। বিশেষ করে বহুবিধ পুজোর সংখ্যার তাগিদ আমার পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিকর। যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে বাংলা রচনার ক্ষেত্রে আমার পক্ষে একান্ত স্বাধীন এবং দূরবিস্তৃত অবসর চাই— সেই অবসরের জমিতে যদি কোনো ফসল হয় তাহলে তা বই আকারে কচিৎ কখনো বার করব। জানি আপনারা এ বিষয়ে আমাকে ভুল বুঝবেন না। এবং ধৈর্যরক্ষা করে মার্জনা করবেন।

যাই হোক, একবারের মতো একটা লেখা আপনাদের আগামী বিশেষ সংখ্যার জন্যে পাঠাচ্ছি। সামান্য হয়তো নতুন ভঙ্গীতে লেখা কবিতা।

আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে বারম্বার প্রুফ দেখে সম্পূর্ণ ভুল-হীন পাঠ ছাপাবেন। কবিতায় সামান্যতম ছাপার ভুল, এমন কি কমা-সেমিকোলনের, সমগ্রহ কবিতাকে ভ্রষ্ট করে দেয়। সেই ভ্রষ্টতায় আমি প্রবেশ করতে চাই না। যদিও কোথাও একটুমাত্র সন্দেহ থাকে তাহলে পাৎলা কাগজে প্রুফ ছাপিয়ে এখনই এয়ার-মেলে আমার কাছে পাঠাবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখে ফেরৎ দেবো। তা ছাড়া কবিতার দুটো off-print ছাপানো-মাত্র এয়ার-মেলে পাঠালে বিশেষ আনন্দিত হব।

অনেক রকম দাবি জানালাম। আপনারা ভুল বুঝবেন না। আপনাদের পত্রিকার কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করি। রচনা-চয়নের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হবেন জানি; দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর গদ্য বা পদ্য পত্রিকায় বোঝাই হলে সঙ্গে সঙ্গেই তার ভরা-ডুবি অনিবার্য। তাতে বাংলা সাহিত্যের প্রবাহিনী বাধা পাবে।

প্রীতি নমস্কার জানবেন—
আপনাদের অমিয় চক্রবর্তী

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি

Prasad Bhavan
68/4A, Purna Das Road Calcutta-700 029
Telephone: 46 2746
১০ জানুয়ারী, '৭৯

প্রিয়বরেষু,

আপনি সেদিন এসে ফিরে গেলেন, আমার সঙ্গে দেখা হলো না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত বোধ করছি। কিন্তু উপায় ছিল না; তখন আমার বেশ জ্বর এবং ব্রঙ্কাইটিসের হাঁপানী। যা'হোক, আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করুন।

আমি এখন সুস্থ। তবে কর্মসূত্রে ১১ থেকে ১৩ এবং ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারী আমাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হবে। এ-কটা দিন বাদ দিয়ে যে-কোনোদিন সকাল ৯।।-১০ টায় আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা হতে কিছুমাত্র বাধা নেই। তবে, আগে একটু খবর পেলে ভালো হয়। দেখা ও কথাবার্তা হলে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবো।

আশা করি, সুস্থ আছেন, স্বস্তিতে আছেন।
প্রীতিনমস্কারান্তে ইতি।।
ভবদীয়
নীহাররঞ্জন রায়

(আরও চিঠি আগামী সংখ্যায়)

বিশেষ রচনা

ছোট মানুষের শেক্সপিয়র

মিহির ভট্টাচার্য

জন্ম ১৫৬৪ সালের ২৩ এপ্রিল (সম্ভবত), অতএব এই ২০১৪ সালে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সারা বিশ্বের শিক্ষিত মানুষ যাঁকে চেনে, সব ভাষার সৃজন একত্র করলে যাঁর নাম সবার আগে জ্বলজ্বল করে, তাঁকে স্মরণ করার অফুরন্ত রকমের উপায় আছে, কারণ তাঁর রচনাপাঠ মনে করিয়ে দেয় যে এই 'চির সাথের সাথি' অনুক্ষণ সঙ্গে আছেন, তাঁকে পাওয়া কখনও ফুরোয় না, নব নব রূপে তিনি প্রাণে পৌঁছে যান। কাজেই আমাদের ক্ষুদ্র সম্পাদকীয় পরিসরে আজ আরেক রকম শেক্সপিয়রের কথা মনে করতে পারি যিনি বড় বড় ঘটনা বড় বড় মানুষের পাশাপাশি ছোট ছোট মানুষের কথা অনবরত বলে গিয়েছেন।

রাজা পঞ্চম হেনরি, King Henry V. নাটকে মাইকেল উইলিয়মস বলে একটি গৌণ চরিত্র আছে। তার ভূমিকা স্বল্পস্থায়ী; সে একজন সাধারণ প্রজা, সম্ভবত চাষার ব্যাটা, সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যতার নিয়মে রাজার হয়ে ফ্রান্সে লড়াই করতে এসেছে। যুদ্ধের আগের রাতে তরুণ রাজা হেনরি ছদ্মবেশে ঘুরতে বেরিয়েছে, তখন উইলিয়মস আর তার দুই সঙ্গীর সঙ্গে তার মোলাকাত হয়। যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও পরিণতি নিয়ে তর্ক বাধে, রাজাকে সমকক্ষ মনে করে উইলিয়মস তাকে দু'-চারটি চোখা চোখা কথা শুনিয়ে দেয়।

> রাজা যদি অন্যায় যুদ্ধ করে, তা হলে তার দায় কিন্তু বিরাট। যখন যুদ্ধে একটা কাটা পড়া এতগুলো হাত পা মুণ্ডু সব কেয়ামতের সময়ে আবার জুড়ে যাবে তখন এই আওয়াজটাই উঠবে, 'আমরা অমুক যুদ্ধে মারা গিয়েছিলাম।' কেউ তখন গাল দিচ্ছে, কেউ বদ্দির জন্য চেঁচাচ্ছে, কেউ গোঙাচ্ছে তার বউ-এর কী হবে, কেউ বাচ্চার কথা বলছে, কেউ বলছে দেনা নিয়ে মরার কথা। যারা যুদ্ধে মরে তারা তো বেঘোরেই প্রাণটা দেয়, তাই না? আর রক্তই যেখানে শেষ কথা বলে সেখানে ধরাধাম ছেড়ে ঠিকমতো চলে যাওয়াটা হবে কী করে? রাজার কথা না মানাটা প্রজার খুব অন্যায়, সেটা মানলাম, কিন্তু এই লোকগুলো যদি বেঘোরে মরে যায় তা হলে রাজার কলঙ্ক ঠেকাবে কে? (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)

রাজার সঙ্গে উইলিয়মসের আবার দেখা হয়েছিল, যুদ্ধজয়ের শেষে, কিন্তু ততক্ষণে ঘটনাপ্রবাহ জাতীয়তাবাদের অবধারিত বিজয়পর্বের দিকে ধাবমান, রাজবন্দনা দিয়ে নাট্যরঙ্গ শেষ হবে; সাধারণ একজন সেনার কূট তর্ক তৎকালীন নাটকের সমাধান বা সমাপ্তির ন্যায্য অংশ হতে পারে না, সেটা মুলতুবি হয়ে থাকে।

এই মুলতুবি হয়ে থাকা প্রশ্নগুলো শেক্সপিয়রের নাট্যরচনায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। রাজা লিয়র নিজ সন্তানের কৃতঘ্নতায় যখন বিদীর্ণহৃদয়, অন্তিম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখনই তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীর বৃহত্তর দুঃখ-কষ্টের বাস্তব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। দুরন্ত শীতের ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যাঁরা ভাঙা কুঁড়েঘরে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যেই মনুষ্যজীবনের আদিম চরম নিরাশ্রয়তার আসল ছবিটা তিনি দেখতে পান। এঁরা নাটকের কুশীলব নন, উচ্চারণের অধিকার-বর্জিত, কাহিনির প্রবর্তনায় প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু মঞ্চস্থ অভিজ্ঞতার মধ্যে এঁরা মস্ত বড় প্রশ্নচিহ্ন রেখে যান, যার কোনও সহজ উত্তর নেই, সমাপ্তিতেও যার কোনও সমাধান হয় না। গ্রিগরি কোজিন্তসেভ তাঁর ছবিতে *রাজা লীয়র*-এর মৌল নির্বেদ নিয়ে আসতে পেরেছিলেন; এডওয়ার্ড বন্ড তাঁর *বিঙ্গো* নাটকে এরকম সব প্রশ্ন নতুন করে দেখেছিলেন। শেক্সপিয়রের নাটক যে চিরন্তন, সেগুলির যে নিত্য নতুন উদ্ভাবন সম্ভব, তার একটা কারণ হল ছোট ছোট মানুষের এই অমোঘ উপস্থিতি।

রেনেসাঁস যুগের ইংরেজি নাটকে কমেডি ছাড়া অন্যত্র নিম্নবর্গ বা প্রতিবর্গ চরিত্রের

ম্যাকবেথ-এ এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তে মঞ্চে ঢুকিয়ে দিলেন এক রসুরে দারোয়ানকে, আর সে দুই সেনাপতি ম্যাকডাফ এবং লেনক্সকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে চব্বিশ লাইনের এক অনবদ্য একান্তকথনে, আর তারপর আরও চব্বিশ লাইনের সপ্রতিভ সংলাপে দুই রাজপুরুষের ওপরে টেক্কা দিয়ে, দর্শকদের মাত করে রাখল। ট্রাজেডির বাইরে অবশ্য এটা আকছার ঘটত।

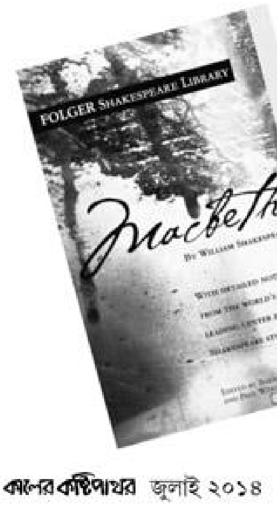

কোনও কর্তৃ-ভূমিকা ছিল না, কিন্তু সেই সময়ে শেক্সপিয়র এবং তাঁর সতীর্থরা এক রকম গুরুচণ্ডালির প্রকরণ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে মঞ্চে জায়গা করে দিচ্ছিলেন। কমেডিতে তো লন্সেলট গব্বো বা অটোলাইকাস অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু ট্রাজেডিতেও কখনও-বা মঞ্চের মধ্যে অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশ ঘটনা-প্রবাহের একটা হালকা স্বর-ভঙ্গ ঘটিয়ে দিত। শেক্সপিয়র এটা প্রায়ই করতেন। *ম্যাকবেথ*-এ এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তে মঞ্চে ঢুকিয়ে দিলেন এক রসুরে দারোয়ানকে, আর সে দুই সেনাপতি ম্যাকডাফ এবং লেনক্সকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে চব্বিশ লাইনের এক অনবদ্য একান্তকথনে, আর তারপর আরও চব্বিশ লাইনের সপ্রতিভ সংলাপে দুই রাজপুরুষের ওপরে টেক্কা দিয়ে, দর্শকদের মাত করে রাখল। ট্রাজেডির বাইরে অবশ্য এটা আকছার ঘটত। তুলনায় থাকবে যুবরাজ হেনরির সঙ্গে জাতিচ্যুত ফলস্টাফ এবং তার শাকরেদদের, বা আলভিয়ার উপগ্রহদের মধ্যে কট্টর ম্যালভোলিওর, অসমান সামাজিক মিশ্রণ।

পশ্চিমি ট্রাজেডির নির্মাণে পরিণতির চাহিদাতেই নাটকের মূল সুর নির্ধারিত হয়ে যায়, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপার নিয়ে গম্ভীর তানে রচিত হয় ঘটনার সন্নিবেশ এবং সংলাপের সংস্থান। আরিস্টটল-প্রবর্তিত নাট্যতত্ত্বে আবার ঐকিকতা বা unity-র ধারণা প্রবল-প্রতাপান্বিত; একটি পাঠ্যে একটি সুরই বাজবে, স্থান-কাল-পাত্র নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যাবে না, বাস্তবের ছড়ানো-ছিটোনো অনির্দেশ্যতার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে চৈতন্যের হিসেবি শৃঙ্খলা। কিন্তু এই গম্ভীর তান সমাজের কেবল একটি স্তরেই বাজে। ছোট মানুষের জীবনে আবার ট্রাজেডি কোথায়? কোথায়ই বা সৌন্দর্য মহত্ত্ব আধ্যাত্মিকতা শৌর্য বীর্য প্রেম? প্রাক-বুর্জোয়া যুগে সংস্কৃতির নির্মাণ যে বড় মানুষের কীর্তিগাথা হবে সেটাই স্বাভাবিক। প্রতিস্থাপনের কেন্দ্রে থাকবে রাজা বা রাজপুরুষ বা ক্ষমতাশালী অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, সেই বর্গের মেয়েরাও অনেকাংশে গৌণ হয়ে থাকবে, কেবল প্রেমের উপাখ্যানে ছাড়া। কাজেই নাটক-রচনার পুরাকালে আখ্যানের কেন্দ্রে যে সম্ভ্রান্ত বা পরাবর্গ পুরুষেরাই থাকবে সে-বিষয়ে মতৈক্য ছিল।

এই মতৈক্যের পিছনে ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুগের সামাজিক স্তরভেদ বা জাতিভেদ। শেক্সপিয়রের আমলে 'কমনার' আর 'জেন্ট্রি'-র মধ্যে তফাত ছিল একেবারে মোক্ষম এবং সাদামাটা: যারা জীবিকার জন্য পরিশ্রম করে তারা জনসাধারণ, আর যাদের শ্রম ব্যবহার করতে হয় না, সম্পত্তির উপসত্বে বিলাসী জীবনযাপন চলে, তারা হল সম্ভ্রান্ত। এরা সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু গুরুত্বে অনন্য, দেশের কৃষি-অর্থনীতির মালিকানা ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ এদের হাতে, রাজা-রানির পারিষদ-মন্ত্রী-অনুচর এদের মধ্য থেকেই আসে, সেনাদলের অধিনায়কত্ব এদের হাতেই বাঁধা। ইউরোপ জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই ছিল প্রচলিত রীতি। ইংল্যান্ডে তবু হাউস অব কমন্স শক্তিশালী থাকায় নিচুতলার ভদ্রজন আর ব্যবসায়ীরা রাজারাজড়ার ক্ষমতার ওপরে একটা আর্থিক রাশ টেনে রাখতে পারত, কিন্তু ষোড়শ শতক পর্যন্ত স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড ওয়েলস ছিল সামন্তদের খপ্পরে, যেমনটি ছিল মহাদেশীয় ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইতালির অনেক জায়গায় সদাগর আর শেঠ কিছুটা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল, কিন্তু অন্যত্র এই বর্গের ধনীরাও ছিল জনসাধারণের অংশ। আমলা উকিল ডাক্তার পণ্ডিত লেখক শিল্পী গায়ক কবি চিত্রকর নাট্যকার অভিনেতা সংগীতজ্ঞ সাংবাদিক ইত্যাদি যে পেশাদার বর্গ একটু একটু করে উঠছিল তারাও ছিল প্রতিবর্গের মধ্যে, জন্মগতভাবে সম্ভ্রান্ত না হলে আশ্রিতজনের মধ্যে পরিগণিত, আইনের চোখে কারও না কারও 'ভৃত্য'। যেমন, এলিজাবেথের আমলে ইংরেজি নাটকে যে প্রতিভার প্রবাহ বয়ে যায়, তার স্ফূর্তির জন্য দরকার ছিল এমনই একটা আইনি ধাঁচা যাতে নাটকের দলগুলি খপ্পরে না পড়ে; কারণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাটুকে লোকেরা ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করলে তাদের ধরা হত ভবঘুরে বদমাশ (sturdy rogues and vagabonds) হিসেবে। সাধারণ মানুষ কখনওই স্বতন্ত্র স্বাধীন, তৎকালীন ভাষায় masterless, থাকতে পারে না। কাজেই আইনের তাগিদে নাটকের দলগুলি কোনও সম্ভ্রান্তজনের চাকর হয়ে থাকত; কোনও দল Lord Strange's Men, কেউ Lord Admiral's Men, কেউ King's Servants, কেউ বা Queen's Servants. শেক্সপিয়রের উত্থান এবং তাদের সাংস্কৃতিক সৃজন শহুরে সমাজে গৃহীত বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু কমনারদের মধ্যে যে স্তরভাগ ছিল তাতে গরিব চাকর চাষি মজুরের জায়গা সবচেয়ে নীচে। এই স্তরে থাকলে আমাদের দেশের 'নিচু' জাতের মতো প্রজন্মের পর প্রজন্ম হীন হীন হয়েই থাকত। যাদের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল বা করে কর্মে সংগতিপন্ন হতে পেরেছিল সেই মধ্যস্তরের মানুষেরা অনেক সময় সম্ভ্রান্ত পরাবর্গের নিচু তলায় জায়গা পেত। শেক্সপিয়রের বাবা সম্পন্ন ব্যাপারী ছিলেন, কিন্তু অবস্থার ফেরে নীচে নেমে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে উইলিয়ম নাট্যচর্চার পেশ থেকে অবসর নেওয়ার পর যখন স্ট্র্যাটফোর্ডে নিজের বাড়িতে থিতু হলেন তখন তিনি গাঁটের কড়ি খরচ করে কলেজ অব হেলল্ডস থেকে সনদ আনিয়ে আইনত জেন্টলম্যান হিসেবে জাঁকিয়ে বসতে পেরেছিলেন।

কিন্তু কমেডি ছাড়া অন্য রচনায় নিজের স্তরের মানুষকে প্রধান ভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করা সেকালে অসাধ্য ছিল, কাজেই যে জগৎটা তিনি সবচেয়ে ভালো চিনতেন সেটাই ছিল কাব্যে উপেক্ষিত। অতএব রাজারাজড়ার গল্পের মধ্যেই তাঁকে নিজের বৈপ্লবিক জীবনবীক্ষা নিয়ে আসতে হয়েছিল। আধিপত্য বা hegemony ঠিক করে দিত সাংস্কৃতিক প্রতিস্থাপন (representation) কোন কোন নিয়মের অধীনে থাকবে। কাজেই কাব্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশ প্রক্ষিপ্ত না হলেও অবধারিত ছিল না। সেটা আসলে অনুপ্রবেশ। শেক্সপিয়রের পরের যুগে এই নিষেধটা খর্ব হতে শুরু করে। তখন আখ্যানের কেন্দ্র থেকে রাজারাজড়ার প্রস্থান একটা নতুন সাংস্কৃতিক যুগের সূচনা করে দিল, আর তেমনই এর পরে ইউরোপের বুর্জোয়া-কেন্দ্রিক যুগে নাটকের প্রাধান্য খর্ব করে উত্থান হল উপন্যাসের। এটা পুরনো পরিচিত গল্প, পাশ্চাত্যের বিবিধ অঞ্চলে বিভিন্ন কালানুবর্তনে এই নতুন পর্যায় শুরু হয়।

শেক্সপিয়রের আমলে বড় মাপের শিল্পকলা বড় বড় মানুষকে কেন্দ্র করে পাঠ্য-নির্মাণ করত সন্দেহ নেই। তবে দর্শক ছিল সাধারণ লোক। সেই ভিড়ের মধ্যে যাদের দেখা যেত, আর ভিড়ের বাইরেও যারা থাকত, তাদের নিজস্ব অবলোকন সবচেয়ে বড় শিল্পীরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। সমাজে যারা অপাঙ্‌ক্তেয় আর শ্রম যাদের ভাগ্যলিপি, তারাই যে সমাজের বড় অংশ, আর তাদের গল্প যে উপেক্ষিত থাকতে পারে না, সেটা কতিপয় স্রষ্টা বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁদের সেই উপলব্ধি এখনও এই প্রজন্মের পাঠক-দর্শককে অনুপ্রাণিত করে। মনে হয় আজকাল যে র‍্যাডিকল রেনেসাঁসের কথা পণ্ডিতেরা বলেন তার মুখ্য প্রবক্তাকে স্মরণ করা এই বাজারি উত্তর-আধুনিক যুগে হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সৌজন্য: আরেক রকম, ১৬-৩১ মে ২০১৪

মূল স্প্যানিশ থেকে বাংলায়

হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি

জাহাজঘাটা

অনুবাদ : তরুণ ঘটক

ধারাবাহিক উপন্যাস

পর্ব ২

গ্রীষ্মভবন-১

শোনা গিয়েছে যে দু'সপ্তাহ পরে সে চার্চে গিয়েছিল, সমবেত প্রার্থনার পর তাজা ফুলের তোড়া দেয় বেদিতে। বুকে জড়িয়ে রেখেছিল তোড়াটা। রবিবার দুপুর, দূরে একলা দাঁড়িয়েছিল। স্থাণু, নিঃসঙ্গ কালো কোটের আড়ালে চাপা ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, শান্তি; উদাসীন সে। সবার চোখে নিশ্চল মূর্তি, ঝলমলানি, নাটকীয় ভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে চলা। ওর সঙ্গে চলতে চলতে লারসেন মাথা থেকে খুলে ফেলে কালো হ্যাট, কয়েক সেকেন্ড হাতে ধরে রাখে ওটা, কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র। সে মেয়ে হাসে— জাদুকরী, নিষ্পাপ, কৃত্রিম।

পরে প্রথম যে সাক্ষাতের লারসেন অনর্থক অপমানিত হয়েছিল ও জানত না কিছু। সেটাই ওর ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার এবং সর্বনাশের প্রতীক, বিপদ সংকেত— তাকে পরিত্যাগ করার আমন্ত্রণ। সে এর যুক্তি খুঁজে পায়নি। মেয়েটির অপাঙ্গে চাওয়া, নখ কামড়াবার ছলে ছলাৎ হাসির মধ্যে লুকিয়ে ছিল যে বিধ্বংসী আগুন সেটার আঁচ পায়নি লারসেন। ধরতে পারেনি ছল। বয়সের ভার অথবা অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস বলে ভাবত অভিজ্ঞতার ফসল শেষ পর্যন্ত হবে খুবই বর্ণময়, সার্থকতায় ভরে উঠবে জীবন।

ব্যবসাটা পুনরুদ্ধার করার কাগজপত্র এবং উকিল ঠিক করার জন্য বৃদ্ধ পেত্রুস তখন বোয়েনোস আইরেসে গিয়েছিলেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে তিনি জাতির এক পুরোধা। কারণ তাঁর প্রথম ব্যবসায়িক স্বপ্ন ছিল এটা। তার সার্থক রূপায়ণের কৃতিত্ব তাঁর। মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেছেন, অপমান কম সহ্য করেননি। পরিচারিকা হোসেফিনা বলে যে দু'রাত সমানে খেটেছেন। তারপর সফলতা, প্রেম আর উদ্দীপনা এবং হতাশা শুধু যে আনহেলিকা ইনেস পেত্রুসের জন্য সহ্য করেছেন তা নয়, সব নারী, পরিচারিকা হয়েও হোসেফিনা পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাসে তাদের সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে।

একদিন বিকেল পাঁচটার সময় লারসেন হাঁটতে বেরোয়। ইউক্যালিপটাসের বড় রাস্তা। তার গতি ধীর, মর্যাদাসম্পন্ন, এক হাতে মিষ্টির প্যাকেট। শেষ বৃষ্টির জল থেকে চকচকে জুতো বাঁচিয়ে চলে। ভঙ্গিতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চিন্ত, আত্মসন্তুষ্ট।

— ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো— হোসেফিনা বলল, 'ঠোঁটের কোণে ঠাট্টার হাসি, একটু তিক্ততাও। নতুন হাউসকোট গায়ে, জামাটার গায়ে ফুল, লতাপাতার ছবি।

হ্যাটের কোণে একহাত রেখে লারসেন ওকে প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়।

— আনলাম কিছু, খুব বিনীত ক্ষমাপ্রার্থী।

সে কিন্তু প্যাকেটটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল না। লারসেনের হাতেই রইল। বইয়ের মতো ধরে রেখেছে আড়াতাড়ি। মেয়েটা আপাদমস্তক লক্ষ করছে, ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা।

— 'আমি না বললেই ভালো হত'। সে বলে, 'সে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি যা বলেছিলাম, ভুলবেন না। চা খেয়ে কেটে পড়ুন। ওকে শ্রদ্ধা করুন।'

বুঝেছি, লারসেন বলে। তার চোখ খোঁজে তাকে। মুখ কালো হয়ে যায়। তুমি যা চাও, তাই করব। যদি বলো দরজা থেকেই চলে যাচ্ছি, তুমি যা বলবে।

পরিচারিকা আবার তাকাল। কুঁতকুঁতে চোখ তবে প্রসন্ন। মুখেচোখে বিনয় ও সৌজন্য। শ্রাগ করে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়। তার নিতম্বের দিকে চেয়ে হাতে হ্যাট নিয়ে দৃঢ় পায়ে হাঁটে লারসেন। কিন্তু ঠিক জানে না ওকে ভিতরে ডাকবে কিনা।

সারা বছর গাছপালা ঝোপঝাড় ইচ্ছেমতো বেড়েছে। গাছের ডালপালা সবুজ, ভেজা ভেজা। তত উজ্জ্বল নয়। বাগানের ঠিক মাঝখানে— লারসেন নিজের ও মহিলার পায়ের শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ঝোপঝাড়ের মধ্যে গোলাকার পুকুর। এক মিটার লম্বা পাঁচিল একদিকে, শ্যাওলা ভরতি। পাঁচিলের ফাঁকফোকরে শুকনো পাতা। পুকুরের সামনে, একটু এগিয়ে গোলাকার গ্রীষ্মভবন, কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি। নেভিব্লু রং। মাঝে

> হোসেফিনার চোয়াল চেপে ধরে সে ঝুঁকে চুম্বন করতে যায়, বলে— ধন্যবাদ। তুমি বড় ভালো। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে জানি। কিন্তু সেই নারী হাত দিয়ে তার মুখ আটকে দিল।

মাঝে রংচটা। চারদিক সমানভাবে খোলা যাতে হাওয়া খেলতে পারে। গ্রীষ্মভবন থেকে দূরে সিমেন্টের পাকা বাড়ি। সাদা এবং ছাই ছাই রং। ময়লা দেওয়াল, অনেক জানলা, এলোমেলো, কোনও সৌন্দর্য নেই। নদীর পাড় থেকে নিরাপদ উচ্চতায় বাড়ির ভিত। চারপাশে গাছের আড়ালে মার্বেলের নগ্ন নারীমূর্তি। 'ধ্বংসের মুখে লারসেন ভাবে, সে আশাহত হয়।' দু'লক্ষ পেসো, আমার যে এত কমে চলে না, পিছনে কত জমি পড়ে আছে কে জানে! বাড়ি থেকে নদী পর্যন্ত ফাঁকা হোসেফিনা পুকুরের পাশে লারসেন নিরীহ চোখে ময়লা জলের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বাগানময় অগোছালো গাছগাছড়া। মাঝখানে দেবদূত। বেঁকে গিয়েছে মূর্তির সুদর্শন দেহ।

পরিচারিকা গ্রীষ্মভবনের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা অলস হাত তোলে। বঞ্চিত লারসেনের মুখে স্মিত হাসি। হ্যাট খুলে সিমেন্টের টেবিলের দিকে এগোয়। চারদিকে লোহার চেয়ার পাতা। হাতের কাজ করা কাপড় পাতা টেবিলে।

আরাম করে বসুন। এক্ষুনি সে এসে পড়বে। আজ ঠান্ডা নেই, হোসেফিনা বলল।

গ্রাসিয়াস (ধন্যবাদ), সব ঠিক আছে।

মহিলার দিকে ঝুঁকে বলে, সে গ্রীষ্মভবনের দরজা-জানলা মুছছে।

বঞ্চনার অনুভব বিশ্লেষণ করতে করতে লারসেন হাত ঝুলিয়ে রাখে একটা আংটায়। লোহার চেয়ার দেখে নিয়ে একটা রুমাল বিছিয়ে তার ওপর বসে।

শীতের সূর্যস্নাত একটা দিন ফুরিয়ে আসছে। বিকেল পাঁচটা এখন। বিশ্রি রং করা পালিশহীন কাঠের দেওয়াল ভেদ করে লারসেন তাকায় অন্য একদিকে। তার চোখে পড়ে টুকরো টুকরো ভাঙন। সময়ের ক্ষয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যের অপঘাত মৃত্যুর ছায়া, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ঘাসের জমিতে। বিনা হাওয়ায় নড়ছে গাছের পাতা। সোঁদা গন্ধ, একটু শীতল এবং গাঢ় মনে হয়। রাতের গন্ধ অথবা বন্ধ চোখের অনুভব, পুকুর থেকে উঠে আসছে সেই গন্ধটা। অন্যদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বাড়ি। মাথার ওপর ঘন অন্ধকার। চারদিকে বাড়ির মাল-মশলা স্তূপীকৃত। পাশে বসার চেয়ার। জল ঢালার ঝাঁঝরি। একটা সাইকেল। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য চোখ মেলে দেখতে লাগল লারসেন। তার মনে হয় বাড়িটা যেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আকাশের শূন্যতার বাহক। শহরের প্রবেশপথ যেখানে অবশ্যই প্রবেশ করতে পারলে সময়কে ব্যবহার করে এক সংকীর্ণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে, সেখানে দেহজ বোধ শক্তিহীন। আত্মরতি এবং অবহেলার ছবি প্রকট।

নিজের মনে একটা খিস্তি করল। এমন সময় দুই নারী এসেছে। ওদের অভ্যর্থনা করার জন্য স্মিত হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। সে নিশ্চিত যে, হালকা বিস্ময় প্রকাশই যথেষ্ট হয়েছে এবং কথার শুরুতেই এটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল, 'ভাবছিলাম আপনি কখন আসবেন, শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম। আপনি প্রায় ভুলেই গিয়েছেন আমি কোথাকার মানুষ। আপনি কেন আসবেন? তাই এলেন দেখে মনে হচ্ছে আমি যা ভাবছিলাম তা সত্যি।' নিতম্ব তোলার পর বুঝতে পারল যে, গ্রীষ্মভবনের কঠিন পরিমণ্ডলের মধ্যে সৌজন্য প্রকাশটা নিরাবেগ থাকাই শ্রেয়। ধরা পড়া জন্তুর মতো চোখ, সাবধানি কিন্তু নির্ভীক। পুরনো অভ্যাসের প্রতি বীতরাগ হয়ে এবং বিপদ নিয়ে সে একটা বাক্য শুরু করল। বাক্যটা শেষ করতেও চেয়েছিল। হাসির দুই দমকে সেটা বোঝাতে চেয়েছিল। কিছুক্ষণ তার চোখমুখ খোলা। এর কোনও অর্থ নেই। যেন কথা শুনতে চায়। ততক্ষণে ওর অট্টহাসির রেশ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। সে গম্ভীর হয়ে যায়। লারসেনের মুখে হাসির ছাপ দেখতে চেয়েছিল। সে চা পরিবেশন করবে; কিন্তু চেয়ার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

গ্রীষ্মভবনে আরবীয় যুগের ঢালের এক অংশ আছে। সেখান থেকে দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে হোসেফিনা কুকুরটার সঙ্গে খেলা করতে করতে গোলাপগুলো তারিফ করছে।

প্রসঙ্গ: জাহাজঘাটা

উরুগোয়াইয়ের এক মহান লেখক হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির জন্মসাল ১৯০৯, কিন্তু চল্লিশের দশকে সাহিত্যে এক ঝড় নিয়ে এলেন তিনি। ইউরোপ ও আমেরিকার মহান সাহিত্যকর্মের পাশে মর্যাদার আসন করে নিল লাতিন আমেরিকার সাহিত্য। ওনেত্তি সৃষ্টি করলেন আধুনিক রূপকথার এক জগৎ, এক কাল্পনিক স্থান, 'সান্তা মারিয়া', যেমন হুয়ান রুলফোর 'কোমালা' গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর 'মাকোন্দো'।

'সান্তা মারিয়া'-র পটভূমিতে রচিত হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির কাহিনিগুলির নায়ক লারসেন।

'জাহাজঘাটা' উপন্যাসে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর লারসেন ফিরে আসে। শুরু হয় নতুনভাবে বাঁচার লড়াই। কাল্পনিক জগতের আধুনিক আখ্যান এক মহাকাব্যের আদল পায়। লারসেনের নৈতিকতা, প্রেমের প্রত্যাশা, অস্তিত্বের লড়াই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব আজকের যুগেও সমান প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে।

প্রথমে যে সান্তা মারিয়াকে অভিশপ্ত শহর মনে হয়, যেখান থেকে পাঁচ বছর আগে লারসেন বিতাড়িত হয়েছিল, সেই শহরেই ফিরে আসে সে। সামাজিক ও পেশাগত অবস্থানে স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই শহর তার সমস্ত কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধিস্থল হয়ে ওঠে।

'জাহাজঘাটা' এবং 'গ্রীষ্মাবাস' যথাক্রমে দু'টি প্রহসনের কেন্দ্রবিন্দু— কর্মপ্রচেষ্টা এবং প্রেমের আশ্রয়। বিধ্বস্ত জাহাজঘাটা পুনরুদ্ধারে লারসেন সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে, সবকিছু পুনর্নির্মাণে ব্রতী হয়। এ যেন তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন।

'গ্রীষ্মাবাস' দ্বিতীয় প্রহসনের পটভূমি। নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর প্রেমিকার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের স্থান। মালিকের কন্যা আনহেলিকা ইনেসের প্রতি লারসেনের প্রেম প্রবঞ্চক। বাড়ির পরিচারিকা হোসেফিনার ইঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দেয় যে লারসেন যা ভাবছে তা অধরাই থেকে যাবে। 'জাহাজঘাটা'-র বিপরীতে 'কুটীর' যেমন প্রেমিকার জায়গায় পরিচারিকা।

'কুটীর'-এ লারসেনের আশ্রয় তার পতনের পূর্বাভাস। গালভেসের স্ত্রীর নিঃসঙ্গ সন্তান-প্রসব তার চূড়ান্ত ব্যর্থতাবোধ ত্বরান্বিত করে, সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায়। জীবনের ভয় তাকে গ্রাস করে। পলায়নি মনোভাবের শিকার লারসেন, কোনও আশা আর তার অবশিষ্ট থাকে না। সে পতনের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকে।

গ্রীষ্মভবনের সমস্যা। কেউ এটা তৈরি করেনি। সযত্নে আঁচড়ানো চুল, সাদা ও বিনয়ী গোলগাল মুখ, মোটা সাদা হাত দু'খানা দিয়ে তার কথার মধ্যে কিছু বলার চেষ্টা করে। 'স্বীকারোক্তি'-র আগেই মরে যেতে চায়। সভ্যভব্য পোশাক, কোমরের নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। জুতো পর্যন্ত লম্বা। কাঁধে ও বুকে কাজ করা। লারসেনের গোলগাল শরীর ছুঁয়েছে ওই পোশাক। শীতের সন্ধে, বাতাসে উৎকণ্ঠা, ক্লান্তি।

পুরনো বাড়িটায় বন্যার জল। সে বলে, 'মা নেই, রাত, শোবার ঘরে সবকিছু তুলছি। নিজের নিজের পছন্দের জিনিস টানছে সবাই। বিশাল অভিযান বটে। আমাদের থেকেও বেশি ভয় পেয়েছিল ঘোড়াটা, মুরগিগুলো ডুবছে। বাড়ির কাজের ছেলেরা নৌকায় আশ্রয় নিল। বাবার রাগ হয়েছে কিন্তু ভয় পায়নি। ছেলেগুলো নৌকা নিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে খাবার আনতে। আমাদের বলছে সঙ্গে যেতে। আমাদের খাবার ছিল। এখন, এই নতুন বাড়িতেও জল উঠতে পারে। ছেলেরা খুশি হয়ে দাঁড় বাইছিল। ওদের কিছু যায় আসে না। চারদিক থেকে নৌকা আসছিল আর জামা দেখিয়ে সংকেত দিচ্ছিল।'

লারসেন গ্রীষ্মভবনেই বলেছিল, 'কখন এসব ঘটেছিল আমি অনুমান করেছিলাম, হাজার বছরেও এরম ঘটেনি। আপনাদের তেমন কিছু হয়নি।'

'কী করব জানতাম না। বিশ্বাস করুন, লঞ্চে উঠে পড়লাম আর যেখানে ইচ্ছে নেমে পড়লাম। শুরু হল বৃষ্টি, আর আমি এখানে ঢুকে পড়লাম। আপনি যখন এলেন সব এইরকমই ছিল। সেই মুহূর্ত থেকে ভাবছি আপনার সঙ্গে দেখা হবে। কথা বলব। না, উদ্দেশ্যহীন কথা। আমি তো এখানকার কেউ নই। কিন্তু আপনাকে না দেখে, কথা না বলে যেতে চাইনি। এখন আমার আশা পূর্ণ হল। এখন বুকভরে শ্বাস নিতে পারছি। আপনাকে দেখছি আর যে কোনও কথা বলতে পারি। জানি না জীবন আমার জন্য কী রেখেছে। কিন্তু এই সাক্ষাৎ আমার অভাব পুষিয়ে দিয়েছে। আপনাকে দেখছি, চেয়ে আছি আপনার মুখের দিকে।'

হোসেফিনার চাপড়ে কুকুরটা ডেকে ওঠে। দু'জনে একসঙ্গে এসেছে গ্রীষ্মভবনে, হাসিমুখে মহিলা দেখছে আনহেলিকা ইনোয়াকে। লারসেনের ব্যথাতুর মুখের পাশটা দেখছে ও হাঁপাচ্ছে। সিমেন্টের টেবিলে কাপপ্লেট। সবাই ভুলে গিয়েছে এগুলোর কথা।

'না, না, কিছু চাই না আমার।' উচ্চকণ্ঠে বলে লারসেন। 'কিন্তু আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা করতে খুব ভালো লাগবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' জুতোর হিলের শব্দ করল এবং একটু ঝুঁকল। টুপিটা হাতে নিল। পেত্রুসের মেয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং হাসে। আবার নিচু হয়ে লারসেন চেয়ারে পাতা রুমালটা তুলে নিল।

দুই ভদ্রলোকের নিস্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে লারসেন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে কতটা শত্রুতা আর কতটা শ্লেষ জমা হয়ে আছে। ঘৃণার মুখোমুখি হওয়া এবং তা শোধ করার মধ্যে জীবনের স্বাদ থাকতে পারে।

হোসেফিনা ফিসফিস করে, 'রাত হয়েছে।' প্রবেশপথের কাঠে নিতম্ব, কুকুরের লাফ, ওর গায়ে একটা হাত। 'চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই', পরিচারিকার শরীরের দিকে চেয়ে। তাকে অনুসরণ করে বধির ও অন্ধ লারসেন। গাঢ় শীতের শরীরের মধ্যে মিশে যায় পায়ের পাশে জংলা ঝোপঝাড়, মনমরা আলো, দূরে কুকুরের ডাক।

চাঙ্গা হয়ে নতুন যৌবন পেল সে, প্রধান প্রবেশদ্বারে দু'টি অক্ষর J এবং P-এর নীচে হোসেফিনার চোয়াল চেপে ধরে সে ঝুঁকে চুম্বন করতে যায়, বলে— ধন্যবাদ। তুমি বড় ভালো। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে জানি। কিন্তু সেই নারী হাত দিয়ে তার মুখ আটকে দিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'শান্ত হোন।' যেন সে কথা বলল এক শান্ত ঘোড়ার সঙ্গে।

জাহাজঘাটা-২

হেরেমিয়াস পেত্রুস এবং লারসেন কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়, তা কেউ জানে না। বেলগ্রানোর কর্ণধার সম্ভবত Poetters-এর মধ্যস্থতায় বা সাহায্যে লারসেন-এর উৎসাহে এই সাক্ষাৎকারটির ব্যবস্থা হয়। সান্তা মানিয়ার কোনও মানুষের সাহায্য লারসেন চায়নি। একথা আর ধোপে টেকে না এবং মনে রাখা উচিত যে প্রায় ছ'মাস ধরে জাহাজঘাটার রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা করার জন্য কোনও জেনারেল ম্যানেজার নেই।

যাই হোক, সাক্ষাৎকারটি এক দুপুরবেলা জাহাজঘাটায় হল। তখনও কিন্তু লারসেন সিমেন্টের পিলারের ওপর স্থিত পাকা বাড়িটায় প্রবেশ করতে পারেনি। পেত্রুস ওদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে, 'গালভেস এবং খুনৎস— দুই কর্তা। একজন দেখবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর অন্যজন কোম্পানির টেকনিক্যাল দিক। খুব ভালো বোঝাপড়া দু'জনের।

হতাশ করার পক্ষে যথেষ্ট ব্যবস্থা— পরিহাসপটু, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং চক্রান্তকারী দুই ব্যক্তি। টাকওয়ালা যুবক আর কালো চুলের বৃদ্ধ উদাসীন হাত বাড়িয়ে দেয় সবার দিকে। মুহূর্তখানেক পেত্রুসের দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করে।

বৃদ্ধ খুনৎস বলে, 'সেন্যোর পেত্রুস, আগামীকাল আমরা স্টকটা দেখে নেব।'

পরিতৃপ্তির প্রশস্ত হাসি ছড়িয়ে আঙুলের ডগা টিপতে টিপতে গালভেস তার দুর্ভাবনা দূর করার জন্য বলে, 'ভালো করে দেখবেন, আজ পর্যন্ত একটা স্ক্রু-ও খোয়া যায়নি। খুন্যাস ফোড়ন কাটে— কিছু না। জলের গ্লাসও না।

কালো টুপিতে সর্বদা ঢাকা ডেস্কে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করে পেত্রুস। আধখোলা চোখ বুলিয়ে নেয় কাচহীন জানলায়, বুঝে নেয় কতটা আলো আর ঠান্ডা প্রবেশ করছে। মুখে কথাটি নেই, ঠোঁট যেন তালাবদ্ধ। নার্ভাস হয়ে সৌজন্যসুলভ মাথা নাড়ায়। প্রতিটি কথায় পূর্ণমাত্রায় সায় দেওয়ার ভঙ্গি তার এমনি। ওই দুই ভদ্রলোকের নিস্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে লারসেন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে কতটা শত্রুতা আর কতটা শ্লেষ জমা হয়ে আছে। ঘৃণার মুখোমুখি হওয়া এবং তা শোধ করার মধ্যে জীবনের স্বাদ থাকতে পারে, হতে পারে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিংবা এর মধ্যে আনন্দের খোরাকও থাকতে পারে। তবে এসব দোষ বা স্বভাবের তুলনায় অনেক খারাপ ছাদের ভাঙাচোরা টিন, ধুলোয় ভরা পায়াহীন টেবিল, দেওয়ালের গায়ে স্তূপীকৃত ফাইল আর দলিলদস্তাবেজ, জানলার লোহার গরাদের আশপাশে ধুলোর মধ্যে জংলা গাছের ঝাড়, কাজকর্মের এমন অতি-নাটকীয় বন্দোবস্ত, কোম্পানির সম্পদ বৃদ্ধির ফলে নতুন ফার্নিচার (অতিব্যবহারে ঝরঝরে, মথ ভরতি, টেবিলের কাঠ কত মজবুত) অনেক দলিলের ওপর বৃষ্টি, ঝড়, রোদ এবং পায়ের চাপ পড়ে সিমেন্টের মেঝেতে মিশে গিয়েছে। সাদা এবং নীল রঙের প্ল্যানের রোল করা কাগজ জমে পিরামিড তৈরি করেছে, কিছু ছড়িয়ে রয়েছে এবং কিছু

দেওয়ালে লেপ্টে জমাট বেঁধে গিয়েছে।

হাঁপানির টানের সঙ্গে পেক্রস-এর কথা ফুটল— ঠিক তাই, ঋণদাতারা না চাইতেই ওদের স্বার্থে, মাঝে মাঝে আমরা শোধ করে দেব। মামলামোকদ্দমা যাতে না হয় দেখতে হবে, শুধু কাজ চাই, কাজ। সার কথা বুঝেছি কর্মই জীবন। জাহাজের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ডুবে মরে। কিন্তু বন্ধুগণ, আমরা ডুবব না। আমাদের জাহাজে জল ঢুকেছে। কিন্তু একে জাহাজডুবি বলব না। শেষ বাক্যটি বলার সময় বুকের সাঁই সাঁই শব্দ শোনা গেল। চোখের মণি সরে গেল। বেশ গর্বিত সে। হলুদ দাঁত আবার দেখা গেল। টুপির পালকে হাত দিয়ে ঠিক করে নিল। সেন্যোরবৃন্দ, কালকের মধ্যে স্টক দেখা শেষ করতে হবে, করতেই হবে। সেন্যোর লারসেন...

খুব ধীরে ধীরে কিন্তু বেশ কৌতূহলী হয়ে লক্ষ করল লারসেন, জোড়ামুখের জোড়াহাসি, ওকে বিদায় জানাল ওরা। ওদের কথায় ব্যঙ্গ স্পষ্ট। কিন্তু এর উৎস কোথায়, তা তত পরিষ্কার নয়। স্বীকার করা ভালো, যদিও সে সবটা জানে না ওদের ক্লাসটার মধ্যে ষড়যন্ত্র এক অবশ্যম্ভাবী পন্থা। পেক্রসের খাড়া টলোমলো শরীরটার পিছন পিছন গেল লারসেনের নির্ভার শ্বাস। তেমন বিষণ্ণ নয়। বাতাসে জোলো গন্ধ, কাগজপত্র, শীত, পায়খানা, দূরত্ব, ধ্বংস এবং জোচ্চুরি। ও ফিরে তাকাল না। কিন্তু শুনতে পেল যে গালভেস অথবা খুনৎস উচ্চকণ্ঠে বলছে—

জাহাজঘাটার মহান বর্ষীয়ান নিজেকে নিজেই তৈরি করেছেন। গালভেস আর খুনৎস হেরিমিয়াস পেক্রসের স্বভাবজ উদাসীন কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল, 'শেয়ারহোল্ডার বন্ধুগণ, আমি স্বয়ং পুরোধা।' দুটো অফিস ওরা পার হয়ে গেল। ধুলো, বিশৃঙ্খলা, নীরবতা, টেলিফোন-সুইচের জটপাকানো তার, নানাধরনের ব্লু-প্রিন্টের কাগজের নীলে নীল, অবিশ্বাস্য ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের টুকরো-টাকরা ছড়ানো, এমন অবস্থার পর পেক্রস এক বিশাল ডিম্বাকৃতি টেবিল বসিয়েছে। দুটো টেলিফোন ছাড়া আর কিছু নেই। ক্ষয়ে যাওয়া সবুজের সঙ্গে আবর্জনার সহাবস্থান।

টুপি নামিয়ে লারসেনকে স্বাগত জানিয়ে সামনে বসার অনুরোধ করল। কয়েক মুহূর্ত যেন কী ভাবল। ভাবার সময় ওর বড় ভ্রুযুগল জুড়ে যায়। টেবিলের ওপর হাত, লারসেনের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। খুব খুশি প্রকাশ করল না। হলুদ দাঁত মেলে ধরা ছাড়া কিছুই দেখাল না। এই দাঁতগুলোর জন্য ওর বেশ গর্ব আছে। শীতলভাবে, ঘৃণা কিংবা সত্যিকারের বিস্ময় প্রকাশ না করে লারসেন সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতার সবকিছুতেই সায় দেয়। তার শোনা বক্তৃতার মধ্যে এটি সর্বোত্তম, চিরকাল মনে রাখার মতো। এর জন্য অনেক হাততালি আর ধন্যবাদ আগে পেয়েছে বক্তা। গালভেস্ খুনৎস একজন হতভাগ্য মানুষ। কত জায়গায় তারা সব ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকের খোঁজ নেই। কয়েক জন মারা গিয়েছে। সবাই এখন ভূত— ওদের জন্যই স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরগতিসম্পন্ন বাক্যের ব্যবহার। নানা চমকপ্রদ অফার। ঈশ্বরের হাত সম্পর্কে সবাই একমত। সঙ্গে সৌভাগ্য, সুবিচারের বিলম্ব ইত্যাদি। অকাট্য যুক্তি, অব্যর্থ ওষুধ। সেন্যোর, তিরিশ মিলিয়ানেরও বেশি। এই অঙ্কের মধ্যে ধরা হয়নি শেষদিকে কেনা কিছু সম্পত্তির হিসেব। আরও কিছু আছে। যেমন— লাগোয়া যে সব অংশ জমি হিসেবে রেলপথের জন্য বিক্রি করা হয়েছে। যা আছে, যা দিয়ে ব্যবসা বাড়ানো যেতে পারে, আমি কেবল সে কথাই বলছি। বাড়ি, জাহাজের লোহা, মেশিনগুলো আর কিছু ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ওই শেডটায় পড়ে আছে। আপনি যে কোনও সময় ওগুলো দেখে নিতে পারেন। মিস্টার খুনৎস এ ব্যাপারে যা করণীয় বলবেন। ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যে মহামান্য বিচারপতি দেওলিয়াপনাটার আদেশ প্রত্যাহার করে নেবেন এবং তারপর সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলে দমবন্ধ করা আমলাতন্ত্র আর ঋণদাতাদের জুন্টার কবলমুক্ত হলে আমরা কোম্পানিটাকে নবজন্ম দিতে পারব। নতুন প্রাণ পেয়ে এ তরতর করে এগিয়ে যাবে। এখন প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন পেলেই চলবে, আর ভাবনার কিছু নেই। এই জন্যই আপনার সার্ভিস আমাদের দরকার। খুব ইমপর্ট্যান্ট, বুঝলেন। আমি লোক চিনতে পারি আর আমি জানি আমাকে আপশোস করতে হবে না। আপনাকে কিন্তু যত শিগগির সম্ভব কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। হেরেমিয়াস পেক্রস পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের পদটি আপনাকে আমরা দিচ্ছি। দায়িত্বটা যেমন বড়, কাজের চাপও থাকবে বেশি। আপনার বেতন সম্পর্কে বলব যে আপনার ডেডিকেশন, বুদ্ধিমত্তা আর সততা চাই এই কাজে। তাই আপনার প্রস্তাব সুবিবেচনা পাবে।

> বৃদ্ধ মানুষটি ওই মেয়েদের ধূসর অ্যাপ্রন পরতে বাধ্য করত এবং বোধহয় ওরা বিশ্বাস করত যে ওই লোকটাই তাদের অবিবাহিতা থাকতে বাধ্য করেছিল এবং কোনও কেচ্ছা ঘটতে দিত না।

কথাগুলো বলার সময় মুখের ওপর হাত ছিল। আঙুলের ডগা দু'হাত জুড়েছিল। এবার টেবিলের ওপর হাত রেখে সেই দাঁতের পাটি দেখাল।

খুব ধীরস্থির ভাবে লারসেন উত্তর দিল, 'সেন্যোর, আপনার কথাগুলো শুনে পুরো পটভূমিটা বোঝার চেষ্টা করেছি। এসব জিনিস নিয়ে আন্দাজে কাজ করা চলবে না। যে অঙ্ক কয়েক বছর ধরে স্ফীত হয়েছে, অনেক আগে থেকেই জমে জমে এমনটা হয়েছে, আনহেলিকা ইনেস সেটা ওকে বলেছিল, ওর অবিশ্বাসী ভাবলেশহীন মুখ দেখে সে সবই তাকে জানিয়েছিল, প্রেমের সততা ছাড়াও শ্রদ্ধাবশত সে এক কথা বলেছিল, সেই প্রথম তাকে বলে যে বৃদ্ধ পেক্রস জাহাজঘাটার উচ্চপদে তাকে বহাল করবে মানে করার কথা ভাবছে। লোভনীয় বড় পদ সেনেগর লারসেনকে আটকে রাখার মতো চাকরি। এমন এক দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বোয়েনোস আইরেসে যেসব সম্ভাবনা নিয়ে লারসেন ভাবনাচিন্তা করছিল, তার চেয়ে বেশি আকর্ষক।

হেরেমিয়াস পেক্রস উঠে দাঁড়াল, টুপিটা তুলে নিল। চিন্তান্বিত, বিরক্ত মনে বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করল লারসেন। যদিও বৃদ্ধের ঝুঁকে পড়া পিঠের ওপর চেপে এমন সাহায্য নিতে মন চায়নি। সে দুটো ফাঁকা ঘরের মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়াল হাওয়া আর ঠান্ডার উন্মুক্ত জায়গায়, বড় হলঘরে।

পেক্রস বলল, 'ছেলেরা খেতে গিয়েছে, তার মুখে বাঁকা হাসি।' কিন্তু সময় আর নষ্ট করা চলবে না। আজ বিকেলে এসে জয়েন করুন। আপনি এখন জেনারেল ম্যানেজার। আজ দুপুরে আমাকে বোয়েনোস আইরেসে যেতে হবে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমি পরে সব ঠিক করে দেব।

লারসেন একা। পিছনে দুই হাত, সে ওই বিশাল ফাঁকা অফিসটায় পায়চারি করছে। মাড়িয়ে যাচ্ছে কত প্ল্যানের কাগজ, দলিল, ধুলোভরা মেঝে আর অব্যক্ত কান্নাভরা কাঠের পাটাতন। জানলাগুলোয় কাচ ছিল। ছেঁড়া তারের জোড়গুলো টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুড়ি কী তিরিশজন মানুষ, সবাই পুরুষ, ডেস্কে ডেস্কে মাথা নিচু করে থাকত। একটি মেয়ে এসে নির্ভুলভাবে স্যুইচের প্লাগ খুলে দিত (পেক্রস, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, সুপ্রভাত— বোয়েনোস দিয়াস)। অন্য মেয়েরা

শরীর দুলিয়ে চলে যেত। ফাইলবন্দি ধাতুনির্মিত র‍্যাকের কাছে এবং বৃদ্ধ মানুষটি ওই মেয়েদের ধূসর অ্যাপ্রন পরতে বাধ্য করত এবং বোধহয় ওরা বিশ্বাস করত যে ওই লোকটাই তাদের অবিবাহিতা থাকতে বাধ্য করেছিল এবং কোনও কেচ্ছা ঘটতে দিত না। কম করেও প্রতিদিন তিনশো চিঠি ছেলেরা পাঠাত। ওরা 'ডেসপ্যাচ সেকশনে কাজ করত। একটু দূরে পিছনে অদৃশ্য। মেপে বলা যায়, আজকের মতোই বৃদ্ধ, নিশ্চিত এবং ছেলেমানুষ, বৃদ্ধটি। তিরিশ মিলিয়ন। খুনৎস এবং গালভেস বেলগ্রানোর খাবার ঘরে খাচ্ছিল। মধ্যাহ্নের খিদে লারসেন যেন ভুলে যায়। যেন আজ তার প্রতীকী উপোস, একটা গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুক্ত হাওয়া এসে গায়কের দৈহিক বল আর প্রেমের আকুতি যেন তার অজান্তেই মনটা অধিকার করে— প্রেমের জোয়ার, পুনর্মিলন আর শান্তির নীড়ের প্রত্যাশা, জন্মভূমিতে ফেরার আনন্দ— সম্ভবত এই ফেরা তাকে বাঁচতে সাহায্য করবে কিংবা হারিয়ে যাবে, যদি আর ফেরা না হয়। তখন তার হারিয়ে যাওয়ার আখ্যান আর গোপন থাকবে না। লোকের মুখে মুখে ঘুরবে। উপভোগ্য গল্পকথা হয়ে যাবে।

বারবার বলার ঘটনা, সেই বিকেলে কোনও কিছু না ভেবেই সে জাহাজঘাটায় নেমেছিল, ঘুমন্ত বাচ্চা কোলে আর হাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছে এক পৃথুলা নারী। পিছনেই সে, হয়তো সেই মুহূর্তটাই এক গভীর ফাঁদে পা দেওয়ার অশনি সংকেত। এখন সে ফাঁদের মধ্যে। জানে না কী বলবে এটাকে, এখন তার মনে নেই যে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল। তার কিছু পরিকল্পনা ছিল। হাসি ছিল মুখে। চালাকি আর ধৈর্য তাকে ফেলে দিল জালের মধ্যে। অসম্ভব হতাশাজনক এক আশ্রয়ে এসে তার অস্থিরতা কমে গিয়েছে।

যদি জনহীন ওই বিশাল বাড়িটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পালাবার সিঁড়ি খুঁজত, অলৌকিকভাবে এক ধাতুনির্মিত নারী তার পায়ে পায়ে উড়ে বেড়াত। তার মুখে হাসি, পোশাক আর চুল সামুদ্রিক ঝড়ে এলোমেলো। হঠাৎ অনায়াসে চলে আসে বিশাল মাপের টর্চ। তার ভাঙা কাচ ভেদ করে অগ্নিশিখার চোখধাঁধানো আলো এসে পড়ে, এবার সে নিশ্চিত যে বেলগ্রানো হোটেলে সে খেতে এসেছে। আর তখন ঘটতে পারত— এখন, হারিয়ে যাওয়া মেনে নেওয়ার আগে— সেই ঘটনা ঘটেছিল চব্বিশ ঘণ্টা পরে। পরদিন দুপুরে, সব কিছু ভুলে সে গ্রহণ করেছে তার নির্বাচন, যা আর অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

পরদিন দুপুরে বেলগ্রানোতে ঢুকে দেখল খেতে খেতে গালভেস এবং খুনৎস তাকে দেখছে। ওরা তাকে ডেকে ওদের টেবিলে

> আপনি বলতে পারেন জিনিসগুলো পচে যাচ্ছে নদীর আর্দ্রতায়, না অক্সিজেনের জন্য। শেষে সবই পচে, সব কিছুর গায়ে পচন ধরে। ফেলে দিতে হয় কিংবা বেচে দিতে হয়।

বসতে বলল না। কিন্তু বারেবারেই ওকে দেখছে, ওদের মুখেচোখে ফাঁদ পাতার কৌশল উদ্ভাসিত। দেখে নিচ্ছে শিকারটাকে। কিছু জিজ্ঞেস করছে না। জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ওদের নেই। যেন মেঘাবৃত আকাশ দেখছে আর উদাসীনভাবে বৃষ্টি আশা করছে। লারসেন নিজেই ওদের টেবিলে গিয়ে বেশ জোরে বলল, 'আপনাদের যদি অসুবিধে না হয় বসব।'

ওদের কাছে যাওয়ার জন্য ওর মরা মেজাজটা ঝেড়ে ফেলল। ওরা খেল সুপ, রোস্ট করা মাংস, কাস্টার্ড, খেতে খেতে কথা হল, জোর আলোচনা, তাতে আন্তরিকতা নেই, কেউ কোনও পক্ষ নেয়নি। আলোচনার বিষয় হল আবহাওয়া, ফসল তোলা, রাজনীতি, রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন রাজধানীতে রাতের জীবন ইত্যাদি। কফির সঙ্গে ধূমপান করা ওদের দু'জনের মধ্যে বেশি বৃদ্ধ খুনৎস। যার চুল দেখে মনে হল কলপ করেছে ভ্রু পর্যন্ত। সে গালভেসের দিকে তাকিয়ে একটা আঙুল তুলে লারসেনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তাহলে আপনি নতুন জেনারেল ম্যানেজার? কত? তিন হাজার? মাপ করবেন ভাই, তবে গালভেস যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে আমরা সবই জানতে পারব এবং খুব তাড়াতাড়ি। হিসাবের বইয়ে তো আপনাকে লিখতে হবেই। সেন্যোর লারসেনের ওপর সব দায়িত্ব। তাই না লারসেন? দুই কি তিন কিংবা পাঁচ হাজার পেসো ওর বেতন। জুন মাসেই তার উপযুক্ত বেতন দেওয়া হবে।

লারসেন ওর দিকে তাকাল। প্রথমে একজনের দিকে, মুহূর্তখানেক পরে অন্যজনের দিকে, সময় নিল, একটা শ্লেষাত্মক বাক্য বানাল, বেশ জোরালো ওর নিচু স্বর আর ধীরগতিতে শব্দাংশ ভাগ করে বলাটা খুব মানানসই হয়েছে। কিন্তু ও ধরতে পারল না যে ওরা তাকে নিয়ে তামাশা করছে। বেশি বৃদ্ধ মানুষটি গোলগাল, ফ্যাকাসে মার্কা, মোটাসোটা কুঁজো, মাকড়সার মতো। মুখের চামড়ায় নানা সাইজের দাগ। কুনস, ওকে দেখছিল নিছক কৌতূহলবশত আর কালো চোখে শিশুসুলভ উজ্জ্বলতা। দ্বিতীয় জন গালভেস বয়ঃসন্ধিকালের দাঁত বের করে হাসল আর টাকে হাত বুলোতে লাগল।

স্রেফ মজা। আর কিছু নয়। যেন একটা গসিপ, রাতে স্ত্রীকে বলবে যে স্ত্রীরা এমন রস পায় না অথবা ওরা পায় বোধহয়। হতভাগ্য চারজন। ঝগড়া করার কোনও মতলব নেই কারও।

লারসেন বলল, 'ব্যাপারটা হল, ম্যানেজার অথবা যদি পেত্রুস আমার শর্ত মেনে নেয়, আমি হব। তাছাড়া এটা বলার মতো কিছু না। কোম্পানির আসল চেহারাটা আমাকে দেখতে হবে।'

গালভেস জিজ্ঞেস করল, 'আসল চেহারা? ঠিক আছে তাই।' খুনৎসের মুখে শ্রদ্ধার হাসি বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল। সে বলল, 'আমরা খুব অল্পদিনই আপনাকে চিনি। কিন্তু আপনাকে সত্যি কথা বলাই যায়।'

গালভেস বাধা দেয়, এক মিনিট। আপনি উচ্চ প্রযুক্তির এক বিশেষজ্ঞ। আপনি বলতে পারেন জিনিসগুলো পচে যাচ্ছে নদীর আর্দ্রতায়, না অক্সিজেনের জন্য। শেষে সবই পচে, সব কিছুর গায়ে পচন ধরে। ফেলে দিতে হয় কিংবা বেচে দিতে হয়। তাই আপনি চাকরিতে বহাল হলেন এবং ব্যবসা বাড়াবার জন্য ২০০০ পেসো। আমি কখনও ভুলি না। কোনও মাসে আমার ভুল হয় না। হেরেমিয়াস পেত্রুস লিমিটেড কোম্পানির দায়িত্ব আপনার হাতে তুলে দিতে আমার ভুল হয় না। কিন্তু এটা অন্য কথা। এটা আমার ব্যাপার। সেন্যোর লারসেন, যদি ধরে নিই যে আপনি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিতে রাজি হবেন, তাহলে কি জানতে পারি, কত বেতন চাইবেন ভাবছেন? এটা নিছকই কৌতূহল। আমার অনুরোধ যে আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন। যা আপনি বলবেন, আমি নোট করে নেব। একশো কিংবা দু'মিলিয়ন পেসো। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কথাটা বললাম।'

লারসেন একটু হাসল। হিসাবের বই রাখার ব্যাপারে কিছুটা তো বুঝি।

হাসিমুখে ওকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে খুনৎস বলল, 'আমাদের নতুন বন্ধুটিকে সব কিছু জানানো দরকার। গোপনীয়তার চুক্তি ভঙ্গ করে আগের ইতিহাস বলে ওকে সাহায্য করতে পারি।

টাকমাথা নাড়িয়ে গালভেস সম্মতি জানায়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা তো ঠিক করাই আছে। ওইজন্যই

তো ওঁকে জিজ্ঞেস করছিলাম। সেন্যোর লারসেনের মতে জাহাজঘাটার জেনারেল ম্যানেজারের বেতন কত জানতে চাইছিলাম।

আগের জেনারেল ম্যানেজাররা কত পেতেন, আপনাকে আমার বলা উচিত।

ওদেরটা জানতে আমার তেমন আগ্রহ নেই, বলল লারসেন। আমি শুধু ভাবছিলাম যে, ৫০০০ পেসোর কম হলে আমি থাকব না। মাসে ৫০০০ এবং ব্যবসায় লাভ হলে পরে কিছু কমিশন। কথা বলতে বলতে কফির কাপে এমনভাবে চুমুক দেয়, যেন চিনিটা শুষে নিচ্ছে। ভাবতে থাকে যে এই মুহূর্তে সে বেকার এবং ঠাট্টার পাত্র। কিন্তু সে নিজেকে আটকাতে পারে না। ষড়যন্ত্রের জালের বাইরে পা বাড়াতে পারছে না। বুদ্ধি খাটাতে পারার বয়স আমার হয়েছে। আমি এখন বৃদ্ধ। আমি সাজিয়েগুছিয়ে নেব, ওই অর্থ আমি অন্য জায়গায় আয় করতে পারব। কিন্তু এখানে আমার প্রধান আকর্ষণ যে এই কোম্পানিটার অচলাবস্থা কাটাতে হবে। আমি জানি, এখানে কত মিলিয়নের গুপ্তধন আছে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে খুনৎস জিজ্ঞেস করল গালভেসকে, 'কী, কী বুঝছ?'

গালভেস বলে, 'ঠিক, সব ঠিক আছে, শুনুন, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে লারসেনের দিকে তাকিয়ে হাসল, ৫০০০। অভিনন্দন আপনাকে। এটাই ম্যাক্সিমাম। আমার জেনারেল ম্যানেজাররা কেউ পেয়েছে দুই, কেউ তিন, কেউ চার এবং পাঁচ। খুব ভালো, যেমন পদ তেমন বেতন। কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে একটা কথা বলছি, শেষে যে ৫০০০ পেত, আর এক জর্মন। নাম শোয়ার্ৎস। একটা সটগান ধার করেছিল, কেন জানেন? কোম্পানির প্রথম কর্ণধার আর আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, ঠিক জানা যায়নি। তবে পিছনের দরজায় এক সপ্তাহ ও গার্ড দিত। আমার বাড়ি আর এই বিল্ডিংয়ের মাঝের দরজায় এবং শেষে ফায়ার করেছিল, যেমন চাকোতে, পুলিশ গুলি চালায় (আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে এবং বলিভিয়ার সীমান্ত অঞ্চল 'চাকো')। একবছর আগে ওর মাইনে ছিল ৫০০০। আপনার কাজে লাগবে বলে এইসব কথা বলছি। সেইদিন থেকে বেতন কমে গেল। আপনি ৬০০০-ও চাইতে পারতেন— কী বল খুনৎস?

খুনৎস বলে, 'একদম ঠিক কথা। দু'হাতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎই গম্ভীর হয়ে যায়। ওকে বড় বিষণ্ণ মনে হয়। ৬০০০ পেসো। খুব যে বেশি তা নয়। আবার খুব কমও না। কাজের সঙ্গে মানানসই বেতন।

সে বলল, 'আবার বলি ধন্যবাদ। ৫০০০ ঠিক আছে। কালই কাজ শুরু করব। আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, আপনি কাজ করলে আমি খুব খুশি হব।'

লোকে বলে যে সবাই আপনার ব্যাপারটা জানে। আপনি তো প্রায় তার জামাই। যদি সত্যি হয় তাহলে আমার অভিনন্দন জানাই। খুবই ভালো মেয়ে আর তিরিশ মিলিয়ন। অবশ্য সবটা আপনার নয়।

ওরা দু'জন মাথা নেড়ে সায় দিল। আরও কফির অর্ডার দিল। চুপচাপ ধূমপান করতে লাগল। জানলা দিয়ে দেখল ধূসর কর্দমাক্ত পথ। গালভেসের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে হাঁচি আসছে। কিন্তু না, হাঁচি এল না। বিল চেয়ে সই করে দিল। ফাঁকা রাস্তার শেষদিকে একটা জলাশয়, তাতে বাদামি রঙের অপরিচ্ছন্ন আকাশের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। লারসেনের মনে পড়ছে দুই নারীর কথা— আনহেলিকা ইনেস এবং হোসেফিনা। ওদের সঙ্গে অতীতের অনেক কিছু। এসব ভেবে যেন সান্ত্বনা পায়।

গালভেস ওর সঙ্গী খুনৎসের দিকে চেয়ে বলে, 'ঠিক আছে, ৫০০০ যদি ওর শেষ কথা হয়, তাহলে আমারও তা-ই পাওয়া উচিত। দু'জনের কাজ তো একইরকম। তবে লোকে বলে যে সবাই আপনার ব্যাপারটা জানে। আপনি তো প্রায় তার জামাই। যদি সত্যি হয় তাহলে আমার অভিনন্দন জানাই। খুবই ভালো মেয়ে আর তিরিশ মিলিয়ন। অবশ্য সবটা আপনার নয়। কিন্তু আমাকে যদি কেউ বলে এটা শেয়ার ক্যাপিটাল, তাহলে সে খুব উজ্জীবিত বোধ করবে না।

লারসেনের মাথা গুলিয়ে যায়, উৎসাহিত হয়ে আবার নুয়ে পড়ে তার মন। মুখে আটকানো সিগারেট একটু বদলাবার জন্য ঠোঁট আর জিভ নড়িয়ে নিল।

এ ব্যাপারে সব কিছু ঠিক হয়নি আর এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধীরে ধীরে বলে সে, আপনারা রাগ করবেন না। শুধু এইটুকু আপনাদের জানা দরকার যে আমিই ম্যানেজার, আর কাল সকালে কাজ শুরু করব। আজ সন্ধেয় টেলিগ্রাম পাঠানো আর বোয়েনোস আইরেসে টেলিফোনে কথা বলা সেরে ফেলতে হবে। আজ যা ইচ্ছে করুন কাল সকাল ৮টায় আমি অফিস যাব। সব কিছু নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হবে। অন্যমনস্কভাবে ওভারকোট পরতে পরতে সে উঠে দাঁড়ায়। বিষাদগ্রস্ত, অস্থির, নিজেকে উদ্দীপিত করার মতো বিদায়সম্ভাষণের শব্দ খুঁজে পায় না। শুধু ঘৃণা জমে ওঠে তার মনে। মাতলামির মধ্যে যেমন অসংলগ্ন ভাবনা আসে, তার আবেগ এমন স্তরে পৌঁছয় যে কারও বিশ্বাস হবে না।

হাসতে হাসতে গালভেস বলে, ন'টার আগে যেতে পারব না। কিন্তু আমাকে দরকার হলে কারখানার শেডের কাছে বাড়িতে ডাক পাঠাতে হবে। যে কোনও সময়, কোনও অসুবিধে নেই।

সেন্যোর লারসেন— খুনৎস নিষ্পাপ মুখে উঠে দাঁড়ায়। মুখের বলিরেখা ক্ষতের মতো দেখায়। —আপনার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে খুব ভালো লাগল। আপনি যা বললেন, তা-ই হবে, ৫০০০। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, 'কম চান, অবস্থাটা সত্যিই খুব করুণ।'

লারসেন বলল, 'আদিয়োস— বিদায়।

কিন্তু সব কিছুই ঘটেছে অনেক পরে। ২৪ ঘণ্টা পরে। মধ্যাহ্নের সেই সাক্ষাৎকার, পেত্রুসের মুখোমুখি লারসেন। ইতিপূর্বেই সে জেনারেল ম্যানেজার হয়ে গিয়েছে। যদিও তখনও তার বেতন ঠিক হয়নি। লারসেন দুপুরের এই খাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। উদ্বেগ, উত্তেজনা শেষ। সেই বিশাল হলঘর। অফিসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রয়েছে সেইখানে। সে নেমে আসছে। ধীর পদক্ষেপ কিন্তু সশব্দে লোহার সিঁড়ি সোজা গিয়ে ঠেকেছে একেবারে শেডে। ডকের সীমানায়।

শরীরটা ভারী লাগছে। কাঁপুনি বোধ হতে থাকে। যখন এসে দেখল যে, দেওয়ালগুলো নেই এবং সিঁড়ির লোহার ধাপগুলো শূন্যে পাক খাচ্ছে। তারপর হাঁটতে লাগল ভেজা বালির মধ্য দিয়ে। জুতো আর প্যান্ট জংলা ঝোপঝাড় থেকে বাঁচিয়ে। কাদায় চাকা ডুবে যাওয়া একটা ট্রাকের সামনে এল, খোলা হাঁকরা ইঞ্জিনের বাঁকা ভাঙাচোরা যন্ত্রাংশ পড়ে রয়েছে। গাড়িটার দিকে থুতু ফেলল। বাতাস যেদিকে বইছে থুতুটাও সেদিকে গেল। কী বলব। বুড়োটা এসব দেখে না। একটু গোছগাছ করে নিলে, যন্ত্রপাতিগুলো ছাদের তলায় রাখলে ৫০,০০০-এরও বেশি হত।

ধূসর আলো, ঠান্ডা আর হাওয়ার গর্জন ছাদের সিলিঙে ধাক্কা খাচ্ছে। ওর ক্ষুধার্ত শরীরের জোর নেই। খুব ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। বেশ মনোযোগী। কত কিছু মনে পড়ছে। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি বীভৎস ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় ডেস্ক, নাটবোল্ট খোলা, হাতুড়ি, লোহার হ্যান্ডেল, পেরেক, আরও নানা টুকিটাকি, নির্জনতার মধ্যেও জীবন্ত, অপ্রশস্ত জায়গায় যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্য দিয়ে রাগী বিছুটি গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

শেডের পিছনে দাঁড়াল। নৌকাডুবির সময় ব্যবহার্য লাইফবোটের দঙ্গল। এক-একটায় আটজন। দামি কাপড়, ভালো কাঠ, দামি রবার, এক হাজার পেসো অথচ আমি—।' সাদা অক্ষর, নীল প্ল্যান, যন্ত্রপাতিগুলো সব বুনো লতায় জড়িয়ে আছে, অবিচ্ছেদ্য।

তিতিবিরক্ত রুক্ষ কণ্ঠস্বর, বেশ উচ্চকণ্ঠ— অবহেলার ফুল। কাজে না লাগলে পথের ধুলো। শেডের দিকে ছুড়ে ফেলা ঠিক নয়। এসব বদলাতে হবে। যে বুড়ো এসব মেনে নেয়, সে পাগল।

ওর কথার প্রতিধ্বনি নেই। প্রতিধ্বনি চায়নি। পাক খেতে খেতে বাতাস নেমে এসে বেশ বেগে ঢুকে পড়ছে কারখানার শেডের ভিতর। গালাগালি, ভয় দেখানো কিংবা অহঙ্কারের সব কথা সে ভুলে গিয়েছে। কথারা মৃত এখন। আর কিছুই নেই। কোনওদিন কিছুই ছিল না। অনন্তকাল পর্যন্ত আর কিছুই থাকবে না। শুধু পড়ে আছে খুব উঁচু উঁচু কোণ, ছাদের কোণ, চারদিকে মরচে ধরা মলিন লোহা, টনটন শুধু লোহা আর অন্ধকার জংলা ঝোপ এগিয়ে আসছে। সব কিছু ঘিরে ফেলছে, সব কিছু ঢেকে ফেলছে। মানুষ সহনশীল, অচেনা পথচারী ওই শেডে হঠাৎ এসে তাকে সচল করত। কার্যত নপুংসক, অবাস্তব তার গতি। যেন রূপকথার কালো পোকার পা আর মাথা নড়ছে। কত উথালপাথাল হয়েছে সমুদ্রে। কত ঢেউ আর ঝড় আর কত অদৃশ্য শ্রমিকের কলতানে মুখর হত এই অর্ধমৃত জায়গাটা। ওভারকোটের পকেটে সযত্নে ঢুকিয়ে দিল প্ল্যানটা, যাতে কোনও দাগ না লাগে। মুখের একদিকে একটু হাসি। বাঁকা এবং পাকা— যেন বৃদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অবশ্য অনেক বিদ্বেষ সৃষ্টি করার পর এখন ভোঁতা। এখন ওরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। এটা যেন রোজকার অভ্যাসের মতো। নিঃসঙ্গতায়, অমন শূন্যস্থানে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ওরা বন্ধু। পিছনে দু'হাত, থুতু ফেলবে বলে ঘুরে দাঁড়াল। কোনও বিশেষ কিছুর বিরুদ্ধে নয়। এ থুতু সবার বিরুদ্ধে। সব কিছুর উদ্দেশে। দৃশ্য অদৃশ্য, যা শুধু মনে পড়ে। যার কোনও উচ্চারণ নেই, প্রতিকৃতি, ভয়, অজ্ঞতা, বেদনা, ধ্বংস এবং মৃত্যু— সব কিছুর প্রতি তার থুতু। থুতু ফেলার সময় মাথা নড়ল না। ঠোঁট আর জিভের সঠিক সহাবস্থান। থুতু ফেলে ওপরে, সামনে, লক্ষস্থির, সে যে বিশেষজ্ঞ, আত্মবিশ্বাসীর অস্ত্রচালনা, লক্ষ্য নির্ভুল। অফিস বা ডেস্কের কথা ভাবছে না। ভাবছে 'স্যুইচের কাছে আমার ঘর থাকবে, বুড়ো বড় ঘরটা আগেই দখল করে নিয়েছে। ওখানে কাচের আড়াল আছে।'

তখন বোধহয় দুটো বাজে, স্টক দেখার জন্য ফিরে এসেছে লাগভেস এবং খুনৎস, বেলগ্রানোতে আর খাবার পাওয়া যাবে না। ভাঙা ছাদের নীচে জমা হওয়া রবারের নৌকাগুলো সরাল। ওভারকোটের পকেটে হাত। নিজের দেহের মাপ সম্পর্কে সজাগ, তার কাঁধ কতটা চওড়া, তাও সে সম্যক জানে, তার জুতোর হিল কতটা দেবে যাচ্ছে চিরকালের ভেজা মাটির মধ্যে। নাছোড় জংলা গাছের ঝোপে, সে যাচ্ছে জাহাজ কারখানার শেডের দিকে। মাথায় অযত্নের টুপি, চোখ ঘুরছে এদিকওদিক। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত, চিরকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে ছুড়ে দেবে হাতের পত্রিকা। যন্ত্রাংশের শবদেহের সারির পাশ দিয়ে যাবে। ওই শবগুলোর স্তূপ ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। ওগুলোর বৃদ্ধি হয়েছে দিনের পর দিন। ধুলো জমেছে। ওরা যেন উদাসীন, নোংরা, চোখেও পড়ে না। কেননা দৃষ্টির আড়ালে পড়ে আছে, কল্পনার সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে অনেক দূরে।

ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে যায়। যেমন উপলক্ষ, তেমনি হাঁটা। তেতো মন পরাজয়ের গ্লানিতে বিপন্ন, ধাতুর টুকরোগুলো সমাধিগ্রস্ত। বড় মেশিনগুলোর বিশাল সমাধিসৌধ, জংলা গাছের উত্তুঙ্গ সৌধ, কাদা আর ছায়া, কোণে কোণে ছড়ানো নানা ধরনের জিনিস। পাঁচ-দশ বছর আগে এগুলো কাজে লাগত। ওদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে শ্রমিকের অহঙ্কার আর নির্বুদ্ধিতা। কোনও এক ওভারসিয়ারের অমার্জিত আচরণ। সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটছে অস্থিরচিত্ত অভিভাবকসুলভ স্নেহার্দ্র, তার হাঁটা রাজকীয় কিন্তু গোপন। ওপরে ওঠা আর চাকরি খোয়ানো সম্পর্কে সচেতন। তাকে ভাবতে হচ্ছে যে সব কিছু ছিল ওর নিজের এবং ভাবতে হচ্ছে যে সব কিছু তাকে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ একটা ভাবনা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও কত বছর তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে এবং এইটাই তার সারা জীবনের সারাৎসার। একটি একটি পদক্ষেপ, বড়িটার নৌশব্দ চাপ, চোখ তো স্থির হতে পারে না। ডাইনে-বাঁয়ে যথাযথ ঘুরে চলেছে। ভাঙা যন্ত্রের ওপর, ফাঁকফোকরে মাকড়সার জাল তার চোখে কিছুই আড়াল হচ্ছে না। ঠান্ডা দুর্বল হাওয়া, আর্দ্রতা মিশে যাচ্ছে কুয়াশায় একটি একটি পদক্ষেপ, হারিয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ফাঁদের মধ্যে প্রবেশ করা।

ক্রমশ

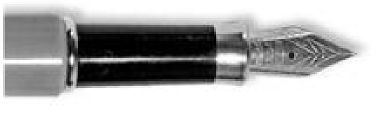

স্বর্ণাক্ষরে কাজের বই

বাংলা প্রত্যয়
প্রকরণ ও পদ্ধতি
শিশিরকুমার আচার্য

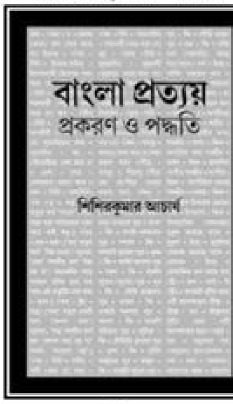

₹৯০

কোন মেশিনে কী ব্যবসা

শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane
Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-Mail: info@swarnakshar.in

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

“সেই প্রদশর্নীর সূত্র ধরে গ্রাসের মিউনিখে আসার জন্য আমার সে-বারের প্রদশর্নী অনেকটাই প্রচার পেল। গ্রাস যে আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর জন্মদিনের আমন্ত্রণ, তাতে আমার চেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়েছিল জোসেফ। জোসেফই আমায় জানাল, গ্রাস ইতালিয়ান ওয়াইন ভালোবাসেন। জোসেফের ইতালির কোনও এক ছোট দ্বীপে একটা বাড়ি আছে। ও মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই চলে যায় সেখানে। মিউনিখ থেকে ইতালির দূরত্ব খুব বেশি নয়। এরই মধ্যে একদিন চলে গেল। ফিরে এল কয়েক পেটি রেড ওয়াইনের বোতল নিয়ে। দু'দিন পরেই আমরা পাড়ি দেব সেই উত্তর জার্মানিতে। হ্যামবুর্গ থেকে লুবেক হয়ে এক অরণ্যময় গ্রামে গ্রাসের বাড়িতে। জোসেফের মতলবমতো একটা সুন্দর কাঠের বাক্সে বারোটি ওয়াইনের বোতল সাজানো হল। আর সেটির ওপরে আমার প্রদশর্নী উপলক্ষে পরদিন দৈনিক কাগজে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে গ্রাস আর আমার ছবি সংবলিত খবর আর বড় বড় হেডিং ছিল— সেগুলোকে এক এক করে গোটা বাক্সই মুড়ে দিলাম আঠা দিয়ে। এক অভিনব কোলাজ করে ইনস্টলেশন আর্ট হয়ে গেল।”

১৭

তখন জার্মানিতে আছি। মিউনিখে বন্ধুত্ব হয়েছে অনেকের সঙ্গে। প্রতি সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ থাকে কারও-না-কারও কাছে। সমস্ত স্থানীয় দৈনিকে গ্রাসকে নিয়ে আমার বড় বড় ছবি, পাতাজুড়ে লেখা। ছবিটুকু ছাড়া যা আমার কিছুই বোধগম্য ছিল না। জোসেফ আর মেলানিয়ারা সংগ্রহ করে রেখেছে সেসব পত্রপত্রিকা। প্রদশর্নী চলবে প্রায় তিন সপ্তাহ। ওখানেই বেশ কিছু স্থানীয় শিল্পীরা আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এত গ্যালারি, শিল্পীগোষ্ঠী যাঁরা নানান পরীক্ষানিরীক্ষায় সৃষ্টি কাজ করে থাকেন। এতবার জার্মানি ভ্রমণ করলেও আমার প্রচার, আমার গুরুত্ব আগে জানিনি। দু'জন খুব নামী শিল্পীর সঙ্গে পরিচয়, অভিজ্ঞতা আমাকে অভিভূত করেছিল। একজন সেই বিখ্যাত পল ক্লে'র নামের শিল্পী, একেবারে সেই এক নাম। সত্যিকার ব্যাভেরিয়ান। বিশাল ধনী। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এক উইক-এন্ডে সেখানে থাকার।

আমি যাই শুক্রবার। আর রোববারের রাতে তাঁর বাড়িতে এক বাৎসরিক ভোজ-

উৎসবের দিন। তাকে উপলক্ষ করেই আমাকে আমন্ত্রণ। পলের স্ত্রী খুব নামী পটার আর বড় পটারির মালিক। আমি থাকি সেলারের এক সুসজ্জিত কক্ষে। পলের বিশাল স্টুডিও। খুব বড় বড় মাপের ছবি। ফিগারেটিভ কাজ মূলত। একজন সফল চিত্রি সে। হাঁকডাক খুব। বাড়িতেই প্রচুর ক্রেতার সমাগম হয়। হয়তো উইক-এন্ড বলে আমার চোখে পড়ে তাই। এঁরা যতই ধনী হন না কেন, ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেন। আমি সেলারের কাচের জানলা থেকে দেখি, কাকভোর থেকেই সেই বিশাল কৃষিজমিতে স্বপুত্র পল ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও ট্র্যাক্টর চালাচ্ছে। সবটাই সিনেমার মতো। ঠিক ৮টায় ডাক পাই খাবার টেবিলে। পল, তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র। ছোট পুত্র তার বান্ধবীকে নিয়ে স্তূপিকৃত খাদ্যবস্তু মাঝখানে রেখে দেদার খেয়ে চলে। প্রায় আট-দশ রকমের জ্যাম, জেলি, ইয়োগার্ট কতরকম আকারের পাঁউরুটি, ঢালাও সসেজ, মাখন, চিজ, গরম সিদ্ধ আলু আর স্যালাড। ব্যাভেরিয়ানরা খুব চেঁচিয়ে কথা বলেন। অন্তহীন স্ফূর্তিতে যেন মত্ত তাঁরা। পৃথিবীর কোনও দুঃখ ছায়া ফেলে না। সবুজ খেত, সুখী, সুস্বাস্থ্যে ভরপুর আর এখানে মেঘ গাভির মতো চরে— আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত ঘরে আমরা স্ফূর্তিতে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় আর পৃথিবীর যাবতীয় পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাদ্যের উপভোক্তারা। মাঝে মাঝে উঁকি দেয় আমার শহরের চোঁয়া ঢেকুর। জলখাবারের পর ওঁরা যে যার কাজে চলে যান। আমি সঙ্গী হই পলের সঙ্গিনীর। পটারি স্টুডিওতে কাজে লেগে যাই। তিনি আমায় চলন্ত চাকায় কীভাবে নরম মাটির তাল থেকে একটা পাত্রের আকার নিতে হয়, আঙুলের কৌশল আর নরম মাটির সঙ্গে ধৈর্য আর মনঃসংযোগ শেখার তালিম দেন। চাকা ঘুরতে থাকে। মাটি বারবারই আমাকে অপদস্থ করে। ক্রমে কিছুটা কৌশলচর্চায় অধিকার আসে। যখন দেখি, উনি একনিমেষে সঠিক সফল হন, আর তখনই আমার জেদ চেপে যায়। কিছু-না-কিছু করে দেখাতে চাই। অন্য বুদ্ধি নিয়ে, অন্য কৌশলে সেই আঁকাবাঁকা আকার নিয়ে আমি গড়ে তুলি অন্যরকম পাত্র। তাতে কিছু কারুকাজ করি। কিছু রেখাপ্রধান ছবি করি। একটু অন্যরকম কিছু একটা হয়। তাতেই প্রশংসা পাই, বাহবা পাই। আমার নিজের খুশি হওয়ার কোনও আন্তরিক ইঙ্গিত থাকে না। কীভাবে যে সকাল-সন্ধ্যা কেটে যায়, জানি না। মানুষ এত সুখী কেন তাও বুঝি না। জীবন, যৌবন, প্রাণপ্রাচুর্য, দৌলত মনে হয় কোনও কিছুই কষ্টসাধ্য নয়। সম্মান, প্রশংসা, সবই জোটে। কিন্তু আমি পুলকিত হই না। রোববারের রাতে অন্তত একশো লোকের সমাগম হল পলের বাড়িতে। বেশিরভাগ শিল্পী। তবে কেউ অভিনয় করে, কেউ গান গায়, কেউ মূর্তি গড়ে, কেউ ছবি আঁকে— এদের কাছের বন্ধু-প্রিয়জনদের নিয়ে এই বাৎসরিক পার্টি। সিঁড়ি, রান্নাঘরের এমনকী বাথরুমের পাশাপাশি জায়গাগুলোও ভরে যায়, কোথাও ফাঁক নেই। কে গৃহকর্তা, কে অতিথি বোঝা যায় না। আলাপিত কলতানে ভরে যায় গোটা বাড়ি। যৌবনের উচ্ছ্বাস, প্রকৃতির দেওয়া প্রস্ফুটিত শরীর, ফেনায়িত সুরার মতো। আমি দেখেই মাতাল হয়ে পড়েছি। গভীর রাত পর্যন্ত চলে সেই পার্টি। বাগানের একদিকে আচ্ছাদিত টেরাসে চারজন তাগড়াই যুবকবন্ধু, একটি বিশাল ঝলসানো ভেড়া লোহার ঘূর্ণায়মান শলাকায় এফোঁড়-ওফোঁড় করে বড় বড় ছুরি শান দিতে দিতে কেটে চলেছে টুকরো টুকরো অংশ। তাতে যুক্ত হচ্ছে অলিভ তেল, গোলমরিচ আর প্রয়োজনমতো নুন। ওই যুবকবন্ধুরা এই কাজে দক্ষ। বন্ধুরা সবাই সবাইকে চেনে। একদিকে সুস্বাদু রুটি, রেড ওয়াইন, অফুরন্ত পানীয়, মাংস, আর ফল, আর ঢালাও চকোলেট, কেক। যে যার মতো লুটেপুটে খাচ্ছে। জাতপাত, এঁটোকাঁটা, ছোটবড় বলে কেউ নেই। সাম্যের স্ফূর্তিতে মশগুল সব।

দেওয়াল জুড়ে পলের নানা সময়ের বড় বড় ছবি। পাশাপাশি বন্ধু চিত্রীদেরও। আমার সঙ্গে নেওয়া ছোট মাপের কিছু ছবিও স্থান পেয়েছে তার দেওয়ালে।

বন্ধু-ক্রেতারা কিনে নিয়েছে তা। আমার সেটা কেন্দ্র-চিন্তা। ভোররাতে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে শুরু করল। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি। ফাঁকা, নিষ্কলুষ অরণ্য চারদিকে। এক অজানা, অনভিজ্ঞ, স্বপ্নিল রোমাঞ্চ অন্য পৃথিবীর। ক্লে সস্ত্রীক আমাকে পৌঁছে দিতে গাড়ি স্টার্ট দিল— গন্তব্য জোসেফের বাড়ি। আমি বিস্ময়াবিষ্ট। জোসেফের বাড়ি ৬০ কিলোমিটার, ২০ মিনিটে অতিক্রম করলাম ভোররাতের সেই নিশ্চুপ স্বপ্নিল পথ ধরে। বিদায়চুম্বন জানিয়ে তারা চলে গেল আবার ২০ মিনিটের পথে, শহরতলির মায়াপুরীতে।

আর-এক শিল্পী হেলমি প্রেছতার। সে ছিল ওই দিনের অনুষ্ঠানে। মিউনিখে মেলানিয়ার ইডিএম গ্যালারিতে তার একাধিক প্রদর্শনী হয়েছে, আর সে মেলানির খুব ভালো বন্ধু। এসব কিছুই জানতাম না। জোসেফের কাছে

জার্মানির সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের অংশ

ব্যাভেরিয়ানরা খুব চেঁচিয়ে কথা বলেন। অন্তহীন স্ফূর্তিতে যেন মত্ত তাঁরা। পৃথিবীর কোনও দুঃখ ছায়া ফেলে না। সবুজ খেত, সুখী, সুস্বাস্থ্যে ভরপুর আর এখানে মেঘ গাভির মতো চরে...

ফোন আসে অনুরোধ জানিয়ে আমি যাতে ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। সেইমতো একদিন সকালে একটি বিশাল গাড়ি করে নিজেই আসে আমাকে নিয়ে যেতে। প্রাণোচ্ছল সুন্দরী যুবতী— চোখে সানগ্লাস পরে, পাশে অপেক্ষাকৃত তরুণ অত্যন্ত মৃদুভাষী এক যুবক। তাকে পিছনের সিটে বসতে বলে আমাকে ডানপাশে বসতে দেয়। ওসব রাস্তায় সবাই বাঁহাতি চালক। বাঁহাতি যান নিয়ে চলি অউগসবুর্গে। মিউনিখ থেকে দূরত্ব একশো কিলোমিটারের মতো। সুন্দর ঐতিহাসিক শহর। রাস্তায় পড়ে বিশাল ম্যানরোল্যান্ড কোম্পানির সুদৃশ্য কেন্দ্র অফিস/কারখানা। হেলমির বাড়ি মূল রাস্তার ওপর, চারতলা। আমাকে এনে ওর উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। একে

ধু-ধু মাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার শেষে পৌঁছই বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গাছগাছালিতে ভরপুর একটি বড় ফটকের সামনে। বেল দিই। গ্রাস নিজেই বেরিয়ে আসেন। দরজা খুলে দেন। আলিঙ্গন করেন। আর শিশুর মতো বাড়ির চৌহদ্দির কথা বলে যান।

একে বাড়িঘর দেখাতে থাকে। নিয়ে যায় তিনতলায় ওর স্টুডিও আর বসবাসের জায়গায়। আমাকে দেখিয়ে দেয় আমার থাকার ঘর। তিন দিন থাকব এখানে। স্থানীয় শিল্পীদের ডেকে ওর স্টুডিওতে চলবে আমাদের ছবি আঁকার কর্মশালা। তার ফাঁকে আমাকে শহরে নিয়ে যাবে। স্থানীয় গ্যালারি মালিকদের সঙ্গে পরিচয় করাবে। একদিন যাব পিয়ানো কনসার্টে। আর-একদিন মুখোমুখি হব বিখ্যাত শহরবাসী বিদ্বজ্জন আর শিল্পী, সমালোচক, সাংবাদিক ঠাসা অনুষ্ঠানে।

হেলমি খুব জনপ্রিয় এ শহরে। ওর কোনও দ্বিধা বা আপন-পর বোধ নেই। সকলের সঙ্গেই যেন বহু যুগের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক। জন ওর একসময়ের ছাত্র। বয়স সাকুল্যে ২৬ কী ২৭। হেলমির কাছে গাঁটছড়া বেঁধেছে। জনের মা এই পেশা পছন্দ করে না। জনের বিষয়সম্পত্তি আছে। ও সব ছেড়েছুড়ে হেলমির কাছে চলে এসেছে। ছবি আঁকবে, মূর্তি গড়বে বলে। একতলায় এক বিরাট জায়গা নিয়ে হেলমি রেখেছে তাকে, জন স্বাস্থ্যবান। ওর উপস্থিতিতে কোনও শব্দ হয় না। খুব সংবেদনশীল, বিনয়ী, অসম্ভব মার্জিত। হেলমির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু ছাত্র-শিক্ষকের নয়— একটু বেশি। জন নিয়মিত না হলেও হেলমির শয্যাসঙ্গী। দিনের ব্যবহারে তা প্রকাশ পেত না। আমি তার অতিথি। শহরে যেন কোনও রাষ্ট্রদূত এসেছেন। এরকমই ব্যস্ততা, হইচই, হাঁকডাক আর মানুষজনের উপস্থিতি আমাকে ঘিরে। হেলমি পরিশ্রমী, অতি দ্রুত ছবি আঁকায় পারদর্শিনী। বিশাল বিশাল তার ক্যানভাস। আমেরিকার বিভিন্ন গ্যালারিতে তার প্রদর্শনী হয়ে থাকে, আর ইউরোপের বেশ কিছু গ্যালারিতে তো বটেই। বাণিজ্যিক সফলতাও তার ছিল। এছাড়া হেলমি পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর খাদ্য-পানীয় আর মুক্তচিন্তার বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। আমার পরিচয় চিত্রকরের পাশাপাশি আমি গুন্টার গ্রাসের বন্ধু। আয়োজনমতো আমরা একসঙ্গে ছবি আঁকি। ন'জন শিল্পী জড়ো হয়েছেন। বিশাল তাঁদের চেহারা। হেলমি ছাড়া আর-একজন নারী। আমরা যে যার ছবি আঁকতে শুরু করি। আলাপচারিতা চলে। অঢেল খাদ্য-পানীয়। রং-ক্যানভাসে আনন্দ-উচ্ছ্বাস জমে যায়। একদিন হেলমির সঙ্গে বিশাল কাপড়ে একধরনের তরল রঙে কাজ করি যৌথ ভাবে। অনেক রকমের রঙের ব্যবহার শিখি। অউগসবুর্গের সে-বাড়ি আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়।

পরদিন আলাপ হয় হেলমির মা গার্তির সঙ্গে। সত্তর পেরিয়েছেন। নিখুঁত সাজে সজ্জিত। মাথায় বাহারি টুপি। আঙুলে এক বিশাল হিরের দ্যুতি। প্রথম দেখাতেই আমাকে তাঁর ভালো লেগে যায়। আমার হাত ধরে বলেন, তাঁর স্বামী খুবই নামী শিল্পী ছিলেন। তাঁর দক্ষতা ছিল জলরঙে। উনি আমাকে নিয়ে যান চারতলার একটি কোণের ঘরে। সুসজ্জিত সেই কামরা সংলগ্ন বারান্দা, সেখান থেকে শহরের পিছন দেখা যায়। ইন্ডিগো রঙের নরম পাহাড় ঘেরা। বিদেশি দৃশ্যপট। কিছু জিনিস, কিছু দৃশ্য, কিছু আবহাওয়া মানুষকে স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। সেই বারান্দায় সেই স্বপ্নের ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর এই শিল্পীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। বড় ভালোবাসার সম্পর্ক। তিনি নতুন জীবন পেয়েছিলেন। থাকতেন গার্তির বাড়িতেই। গত বছরেই মারা গিয়েছেন তিনি। এই তাঁর ঘর, এখন ফাঁকা—। উনি আমাকে বললেন, এই ঘরে আমি আর কাউকে থাকতে দিই না। তুমি যতবার আসবে, যত দিন খুশি থাকবে এই ঘরে। মনে হলে ছবি আঁকবে। এ বাড়ির আসল মালকিন তিনি। স্বামী ছিলেন সফল ডাক্তার। কিন্তু মিলিটারি মেজাজের। তাঁর রক্ষণশীল স্বভাব কখনওই তাঁদের দাম্পত্যজীবনে সুখী হতে দেয়নি। মায়ের কিছুটা ইহুদি সম্পর্ক ছিল। তাই সন্ত্রস্ত থাকতে হত সেই যুদ্ধকালে। তাঁদের পরিবারও শিল্পী-পরিবার। বিখ্যাত ভাস্কর আর্নস্ট বালার্ক ছিলেন তাঁদের পরিবারের। তাঁর সেই ডাক্তার-স্বামীর সম্পত্তি আর বাপেরবাড়ির সম্পত্তি মিলেমিশে তাঁরা এই বিশাল বাড়ি আর বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারিণী। লক্ষ করেছিলাম, তাঁর একটা নিজস্ব শৌখিন শিল্পীমন আছে, আর তাঁর কন্যা হেলমি সার্থক ভাবে তাঁর মনের আত্মজা হয়ে উঠেছে। মা একলাই অবসর জীবনযাপন করেন। ইউরোপের মানুষেরা স্বাবলম্বী, স্বাধীন, স্বনির্ভর থাকাকে সংস্কৃতি করে নিয়েছে। তাই এই বাড়িতেও তিনি যেন একক সত্তার মানুষ। হেলমি মা-র সঙ্গে দেখা করে আগাম বার্তা দিয়ে, তিনিও। কর্পূরের মতো উবে যায় অউগসবুর্গের দিনগুলি। ৮নং রোজনস ট্রাসে যেন আমার এক স্বপ্নের ঠিকানা হয়ে যায়। এরপরেও বেশ কয়েকবার গিয়েছি। হেলমি প্রচুর চিঠি পাঠায়, ছবি পাঠায়, ওয়ার্কশপে করা কাজগুলো সুন্দর করে প্যাক করে জোসেফের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। তখনও আমি অভাবী। খুব টেনেটুনে জীবনযাপন করি। হয়তো কিছু স্বাভাবিক মিতব্যয়িতা আমাকে সাহায্য করেছে ঠিকঠাক জীবনযাপনে। বিদেশি টাকাও কখনও বিলাসে ব্যয় করিনি। হিসাব করে খরচ করেছি। বেশিরভাগই আমার ব্যয়ভার বহন করেছেন, আতিথ্য দিয়েছেন কিছু না কিছু বন্ধু, গুণগ্রাহী আর তজ্জনিত সুযোগ।

হেলমি অউগসবুর্গের কিছু বিখ্যাত গ্যালারি-মালিকদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে তাঁদেরকে অনুরোধ করে যেন তাঁরা আমার ছবি কেনাবেচার দায়িত্ব নেন। একটি গ্যালারি অগ্রিম কিছু ছবি কিনে নেয়। আর দু'টি রেখে দেয় ভবিষ্যতে প্রদর্শনী করার কথা বলে। হেলমির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও অক্ষুণ্ণ।

এভাবে সেই প্রদর্শনীর সূত্র ধরে গ্রাসের মিউনিখে আসার জন্য আমার সে-বারের প্রদর্শনী অনেকটাই প্রচার পেল। গ্রাস যে আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর জন্মদিনের আমন্ত্রণ, তাতে আমার চেয়ে বেশি উৎসাহিত হয়েছিল জোসেফ। জোসেফই আমায় জানাল, গ্রাস ইতালিয়ান ওয়াইন ভালোবাসেন। জোসেফের ইতালির কোনও এক ছোট দ্বীপে একটা বাড়ি আছে। ও মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই চলে যায় সেখানে। মিউনিখ থেকে ইতালির দূরত্ব খুব বেশি নয়। এরই মধ্যে একদিন চলে গেল। ফিরে এল কয়েক পেটি রেড ওয়াইনের বোতল নিয়ে। দু'দিন পরেই আমরা পাড়ি দেব সেই উত্তর জার্মানিতে। হ্যামবুর্গ থেকে লুবেক হয়ে এক

অরণ্যময় গ্রামে গ্রাসের বাড়িতে। জোসেফের মতলবমতো একটা সুন্দর কাঠের বাক্সে বারোটি ওয়াইনের বোতল সাজানো হল। আর সেটির ওপরে আমার প্রদর্শনী উপলক্ষে পরদিন দৈনিক কাগজে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে গ্রাস আর আমার ছবি সংবলিত খবর আর বড় বড় হেডিং ছিল— সেগুলোকে এক এক করে গোটা বাক্সই মুড়ে দিলাম আঠা দিয়ে। এক অভিনব কোলাজ করে ইনস্টলেশন আর্ট হয়ে গেল। ঠিক হল, এই বাক্সটাই ওঁর জন্মদিনে আমাদের উপহার হবে। খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম মিউনিখ থেকে হ্যামবুর্গের উদ্দেশে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে সোজা যাব। দূরত্ব কম নয়। কিন্তু সড়কপথ এত সুন্দর! প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পরিকাঠামো সমস্ত অগম্যকে কী সহজগম্য করে তোলে! আমরা কখনও কখনও ত্রিস্তর দিয়ে চলেছি অটোবাস ধরে। পথের মাঝে মাঝে বিশাল লিপিবদ্ধ পথনির্দেশের ঘোষণা, যে-কোনও বিদেশির কাছেই পথ ভুল হওয়ার নয়। সমস্ত পথই একমুখী। চালক জোসেফ। আমি বসি তার পাশে ডানদিকে। এটি একটি ভোকস ওয়াগন ভ্যান। ছোট ওমনি বাসের মতো। পিছনে বিশ্রামের জায়গা আর আছে জলাধার। মাঝে মাঝে পথ চিরে পেরিয়ে যায় স্থানীয় জনপদ। আমরা এগিয়ে চলি। জোসেফ সতর্ক থাকে, যে-পথের গতি যেরকম সেই নিশানা মেনে এগিয়ে যায়। আমরা এগিয়ে চলি একটা রাজ্য থেকে আর-একটা রাজ্যে।

দুপুরের কাছাকাছি একটা মোটেলে গাড়ি থামানো হয়। সেখানে একটু আহারাদি সেরে আবার বেরিয়ে পড়ি। এমনি করে সন্ধে হয়ে আসে। প্রায় তেরো ঘণ্টা কেটে যায়। আমরা লুবেকে ঢুকে পড়ি। ছোট্ট সুন্দর শহর। চারদিকে সমস্ত বাড়িতে সুন্দর কাঠের কারুকাজ। লুবেক সম্পর্কে আগে শুনেছি। গ্রাসের বাড়ি এখান থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে। জোসেফ মাঝে মাঝে পথযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে। সেভাবেই এগোতে থাকি আমরা। ধু-ধু মাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার শেষে পৌঁছই বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা গাছগাছালিতে ভরপুর একটি বড় ফটকের সামনে। বেল দিই। গ্রাস নিজেই বেরিয়ে আসেন। দরজা খুলে দেন। আলিঙ্গন করেন। আর শিশুর মতো বাড়ির চৌহদ্দির কথা বলে যান। পাশে একটি আলাদা বাড়ি— যেটা তাঁর স্টুডিও। একতলায় মূর্তি গড়েন আর দোতলায় ড্রয়িং ছবি ইত্যাদি। কথা হয়, আমরা একদিন একসঙ্গে ছবি আঁকব। জোসেফ, আমি গ্রাসকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়ি এক প্রাচীন ক্যাসেলের অন্দরে। একতলাতে ছোট একটি বৈঠকখানা। সেখানে দু'জোড়া বয়স্ক দম্পতি। ফায়ার প্লেসের ধারে আমরা বসে পড়ি। গ্রাস চলে যান ভাঁড়ারে। উটে-সহ ফিরে আসেন রান্না করা ছোটখাটো খাবার আর পানীয় নিয়ে। সব বন্ধুদের কাছে ঘোষণা করেন, শুভাকে নিয়ে খুব অসুবিধে— ও না পান করে ওয়াইন, না পান করে চা। ওকে যে কী করে আপ্যায়ন করি! নিঃশব্দে উঠে ভিতরে চলে যান, আবার নিয়ে আসেন এক গ্লাস ফলের রস।

আলাপচারিতায় গনগনে আঁচের তাপে উত্তর জার্মানির এই শীতল বনরাজি ঘেরা ক্যাসেলের একটি কক্ষে আমরা উষ্ণ হই। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীর বাড়িতে মিলিত হই আড়ম্বরহীন অথচ একান্ত আন্তরিক সাহচর্যে। ফাঁকে ফাঁকে নানান আলাপচারিতায় চলি-ফিরি বিশ্বের নানান আঙিনায় অতীত থেকে বর্তমান সময়ে। ওঁরা নিজেরাই রান্না করে নৈশাহারের ব্যবস্থা করেন। রাত গভীর হলে গ্রাস-দম্পতির ব্যবস্থামতো অতিথিদের নির্দিষ্ট ঘরগুলিতে যে যার ঢুকে পড়ি। গ্রাস তদারকি করেন। জোসেফের পাশের ঘরেই আমার ঘর। উনি বলেন, কাল খুব ভোরে আমায় পোল্যান্ডে যেতে হবে। একদল চলচ্চিত্রকার নিতে আসবেন। ওঁরা আমার ওপর ছবি তুলতে চায়। আমি কথা দিয়েছি যাব। তোমরা বিশ্রাম করে কালকের দিন নিজেরা নিজেদের মতো থেকো। পরশু ফিরে এসে দেখা হবে। একথা জানিয়ে শুভরাত্রি বলে চলে যান।

ভোররাতে দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে উঠে পড়ি। তখনও আকাশ পরিষ্কার নয়। বাতি জ্বলছে। দরজা খুলে দেখি গ্রাস দাঁড়িয়ে। উনি খুব ত্রস্ত-দুঃখিত ভাবে আমাকে জানালেন, 'শুভা কিছু মনে কোরো না তোমাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য। আমি এখুনি বেরিয়ে যাব। রাতে তোমাদের উপহারের বাক্স ভালো করে চেয়ে দেখি। মিউনিখের কাগজগুলো আমায় ভীষণ গালি দিয়েছে। এ এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতা। ওরা সকলেই সরকারের তাঁবেদার। আমি সারা জীবন গালাগালি শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমার দুঃখ হল, তোমার ওই সুন্দর প্রদর্শনীর কথা চেপে দিয়ে আমার কথাই বেশি লিখেছে। আজগুবি, অসত্য খবরে ভরে দিয়েছে। তোমার জন্য আমার খুব মনে কষ্ট হয়েছে। আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি! এতে তুমি কিছু মনে কোরো না।'

মিউনিখের কাগজগুলো আমায় ভীষণ গালি দিয়েছে। এ এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতা। ওরা সকলেই সরকারের তাঁবেদার। আমি সারা জীবন গালাগালি শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমার দুঃখ হল, তোমার ওই সুন্দর প্রদর্শনীর কথা চেপে দিয়ে আমার কথাই বেশি লিখেছে।

আমি তো স্তম্ভিত। ওনার উপস্থিতির জন্যই আমার প্রদর্শনী প্রচারিত হয়েছে। আমি কোন এক দূরের কলকাতা শহরের অজানা, অচেনা চিত্রী। হয়তো কোনও সংবাদমাধ্যমই কোনও খবরই করত না আমার প্রদর্শনীর। সুতরাং এখানে আমার কী মনে করার আছে? উপরন্তু গ্রাস আমার ছবি নিয়ে কথা বলেছেন। সেটা উল্লেখিত হয়েছে, স্থান পেয়েছি আমি মিউনিখের সংবাদমাধ্যমে। এ তো সবই তাঁরই জন্য। আমি নির্বাক— উনি ইশারায় বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলেন। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, বেশ কয়েকটা গাড়ি, লোকজন। অল্প সময়ের মধ্যে সেই শান্ত জনমানবহীন গ্রাম্যপথ ধরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সব গাড়িগুলি পোল্যান্ডের উদ্দেশে। এরপরেও বেশ কয়েকবার তাঁর বাড়ি গিয়েছি, আমন্ত্রণে। প্রথমদিকে তখনও দুই জার্মানি এক হয়নি। যুক্ত হওয়ার পরেও গিয়েছি। সে-কথায় পরে আসব। ছবি নিয়ে বিদেশ পাড়ির নানা ঘটনা, নানা কাহিনি এখনও বিস্ময়াবিষ্ট করে।

বিদেশে ছবি-জীবনের সূত্র ধরে আর-একটি সফল প্রদর্শনীর কথা এ প্রসঙ্গে বলে ফেলি, সেটা আরও বেশ কিছু বছর আগের। ১৯৭৮, আমি একবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম সরাসরি জার্মানির এক গ্যালারির মালিকের কাছ থেকে। বহু আগে তাঁরা দূতাবাসের দায়িত্বে বোম্বাই থাকতেন। ভদ্রলোক শিল্প-ইতিহাসের গবেষকও। স্ত্রী অত্যন্ত শিল্পরসিক। সেই সুবাদেই কূটনৈতিক কাজের ফাঁকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। দেশে ফিরে গিয়ে সাজিয়ে-

VHS - eine „Frei - Zeit" - Alternative. Auch für Sie!

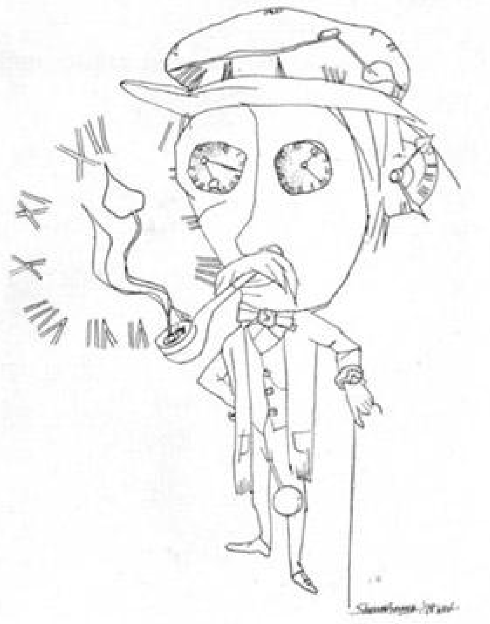

Nehmen Sie sich doch mal etwas „Frei-Zeit"!

Kursbeginn:	ab 15. 1. 1979
Anmeldungen	ab 6. 1. 1979 in Werl
und zusätzlich	ab 8. 1. 1979 in Wickede und Ense

PROGRAMMZEITUNG für das 1. Semester 1979
Volkshochschule Werl - Wickede (Ruhr) - Ense

শিল্পীর চোখে জার্মান নাগরিক। পুরসভা-প্রকাশিত বুলেটিনের প্রচ্ছদে

গুছিয়ে একটি গ্যালারি করেন। এই ডেডেকে দম্পতির ড্যুসেলডর্ফের কাছে একটি আধা শহরে সেই গ্যালারি আর তাঁর বাড়ি। তিনি ভারতবর্ষের খুব প্রতিষ্ঠিত নামজাদা শিল্পীদের প্রদর্শনী ইতিমধ্যে করেছেন। সেভাবেই হয়তো কোনও কারও পরিচয় থেকে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে এক আমন্ত্রণপত্র লেখেন। তখনও চিঠির আদান-প্রদান বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, আর আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। যাই হোক, আমি যেহেতু বিদেশে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তাই কী ছবি সঙ্গে নেব, কীভাবে নেব এসবই ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে আমি পাড়ি দিই জার্মানিতে। ওঁরা আপ্যায়নের সমস্ত ব্যবস্থা, অগ্রিম সমস্ত চিন্তাভাবনা করে আমার প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন। ড্যুসেলডর্ফ বিমানবন্দর থেকে চলে যাই এক ঘণ্টার পথ ওয়ার্লে। পরদিন ওঁরা ঠিক করেন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্য এই শহরের মেয়রকে অনুরোধ জানাবেন। সেইমতো আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁরা যান মেয়রের কাছে। মেয়রকে তাঁদের উদ্দেশ্য, আমার আগমন এসবই বিস্তারিত ভাবে জানালে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে পরামর্শ দেন যে, এ শহরে যেহেতু এক পরিচিত ভারতীয় শিল্পীর ছবির প্রদর্শনী মনস্থ হয়েছে, তাতে পুরসভাও যদি যোগ দেয়, তাহলে এই প্রদর্শনীর প্রচার ও প্রসার আরও বাড়বে। ওঁর এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা অনুরোধ যুক্ত হয় যে, যদি এই প্রদর্শনী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরিবর্তে জানুয়ারির ৬-৭ তারিখ নাগাদ হয়, তাহলে তাঁর আগামী বাজেটের অঙ্কে অন্তর্ভুক্ত করতে কোনও অসুবিধা হবে না। কারণ, এ বছরের অঙ্কে ভাঁড়ার শূন্য। তাঁর এই প্রস্তাবে ডেডেকে আমায় রাজি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমার তো অরাজির কোনও ফাঁক ছিল না। রাজি হয়ে যাই কিন্তু এতটা দিন কীভাবে তাঁদের আতিথ্যে কাটাই! বিশেষত, খ্রিস্টমাসের দিনগুলো ওঁরা অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওঁরা চান না একান্তে আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের বাইরে অন্য কোনও কাজের বোঝা যুক্ত করেন। এমনিতেই জার্মানিরা ভীষণ সময়সচেতন। কোনও কিছুই এদিক-ওদিক হওয়ার সুযোগ নেই। ঘড়ি তাঁদের জীবনসঙ্গীও। এ প্রসঙ্গে জানাই, মেয়র আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, পুরসভা থেকে প্রকাশিত বুলেটিনের প্রচ্ছদ এঁকে দিতে এবং তার বিষয়ভাবনা ঠিক হয়েছিল এক ভারতীয় শিল্পীর চোখে জার্মান নাগরিক। এছাড়াও শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে যে খ্রিস্টমাসের কার্ড মেয়রের তরফ থেকে দেওয়া হয়, সেটিতে আমার একটি ছবি ছাপার অনুমতি নিয়েছিলেন। সেই বুলেটিনের প্রচ্ছদে আমি একটি ব্যঙ্গচিত্রধর্মী ছবি এঁকে দিয়েছিলাম। একটি পাইপমুখে টুপি পরা জার্মান পুরুষ, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নানা প্রকারের নানা আকারের ঘড়ি। তার অণ্ডকোষটি একটি পেন্ডুলাম-সদৃশ।

ডেডেকে তার স্থানীয় বহু বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রায় প্রতি সন্ধেবেলা আমাকে নিয়ে যায়। সেখানে আমি সেই পরিবারের কিংবা বন্ধুবান্ধবের ছবি আঁকি। পরস্পর পরস্পরকে খ্রিস্টমাসের উপহার দেয় আমার আঁকা মুখাকৃতি। অভ্যস্ত হাতে আমি পরের পর এঁকে চলি ৫০ ডয়েস মার্কের বিনিময়ে ৫-৬ মিনিটের চটজলদি মুখাকৃতি। দেদার পয়সা রোজগার হয় আমার। এক-এক দিনে ৬-৭টি করে ৭-৮টি দিন, প্রতি সন্ধ্যায় আমার রোজগার চলে। ডেডেকে-কে প্রস্তাব দিই, কিছুদিনের জন্য আমি প্যারিসে যেতে চাই। প্যারিস থেকে ফিরে আসব ঠিক ১ তারিখে। নতুন বছরে। ওরাও এরকমই একটা ভাবনা পোষণ করছিল। ওরাও হয়তো ১ সপ্তাহ কোথাও বেড়াতে যাবেন। আমার তখন অঢেল পয়সা। এক ডয়েস মার্ক তখন ভারতীয় টাকায় সাড়ে চার টাকার কিছু বেশি। সেসময় ওই টাকা আমার কাছে অনেক। আমি বেরিয়ে পড়ি। জামাকাপড়ের প্যাঁটরা নিয়ে ড্যুসেলডর্ফ থেকে উঠে পড়ি বনের উদ্দেশে। ড্যুসেলডর্ফ থেকে বন খুব বেশি দূরে নয়। বন তখন জার্মানির রাজধানী। এ

অঞ্চল ধনীদের জায়গা। একটি কমলালেবু রঙের ছোট রেলের মতো ট্রাম যায়। সামান্যই ভাড়া। বনে পৌঁছে যাই দুপুরে। সোজা চলে যাই ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসিতে, ভিসা নেওয়ার জন্য। কিন্তু ভিসা মেলে না। কঠিন যুক্তিতে কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকটি জানিয়ে দেন, আপনি ভারতীয় নাগরিক। কলকাতা শহর থেকে এসেছেন। সেখানে আমাদের ভিসা অফিস থাকা সত্ত্বেও আপনি এদেশ থেকে ভিসা চাইছেন কেন? এটা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। কাজে কাজেই আমরা অপারগ। যদি ইন্ডিয়ান এম্ব্যাসি আপনাকে বিশেষ অনুমতি দেয়, তাহলে আপনাকে আমরা ছাড়পত্র দেব।

আমার বেলুন চুপসে গেল। এ পৃথিবীতে এখন আমি কোথায় থাকব। ডেডেকে দম্পতিকে আমি বিদায় জানিয়ে এসেছি। তারা সেইমতো সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমি তো ফিরে যেতে পারি না। চলে গেলাম ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসিতে। বিশাল বাড়ি। তুলনায় মুহ্যমান নেতিবাচক কিছু মানুষেরা বসে আছেন অর্ধ-ঘুমন্ত শরীরী ভাষায়। রাষ্ট্রপতির বাঁকা ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। ঝুল তৈরি করেছে কণ্ঠমালা। একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, পাশের জন মারাঠি। নানা আকুতি সত্ত্বেও তাঁরা আমায় যে কোনও সাহায্য করতে পারবেন না, আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আমি হতোদ্যম, হতাশ হয়ে পড়ি। এম্ব্যাসি থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে একটি বেঞ্চে আশ্রয় নিই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বন্ধুর দেওয়া বিদেশ-বিভুঁইয়ে কিছু ঠিকানা খুঁজতে থাকি ডায়েরি থেকে। ইউরেকার মতো শব্দ বেরিয়ে এল— একটি টেলিফোন নম্বর আর একজন মহিলার নাম খুঁজে পেয়ে। তিনি বনে সুপ্রতিষ্ঠিত। শান্তিনিকেতনের অতি খ্যাতিমান একদা ছাত্রী। আমি বুথে গিয়ে ফোন করি। তৃণাদির কণ্ঠ ভেসে ওঠে। তিনি যে আমাকে চেনেন, আমার পরিচয় জানেন, একথা জানান। কিন্তু তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তাঁর অতিথি হওয়ার যে উপায় হবে না, তা জানতে পারি। কিন্তু উনি পরামর্শ দেন একদিন অন্তত ইয়ুথ হস্টেলে কাটালে উনি অন্য এক বাঙালি বন্ধুকে বলবেন আমাকে আতিথ্য দিতে। সেইমতো আমি সে-রাত কাটাই বন-এ ইয়ুথ হস্টেলে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যাই হোক, খুব সকালে টেলিফোন পাই এক বাঙালি অধ্যাপকের। তিনি আমাকে ইয়ুথ হস্টেল থেকে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। খুব সফল ওই অধ্যাপকের অতি সাজানো-গোছানো বাড়ি, বাগিচা। অত্যন্ত সুশ্রী তাঁর জার্মান স্ত্রী আর ফুটফুটে কন্যা। তাঁদের আপ্যায়নে সহৃদতায় আমি আপ্লুত হই। কিন্তু মনে মনে সংকোচ অনুভব করি। রাত কাটিয়ে সকালের প্রাতরাশ সেরে কী মনে হয়, পরদিন সকালে সেই ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসিতে ঢুকে পড়ি। কাউন্টারে তখন সেই পুরুষের বদলে ফুটফুটে এক ফরাসিনী। আমি তাঁকে জানাই, আমি ভিসাপ্রার্থী। আমি একজন পেইন্টার। উনি তখন সহাস্যে আমার মুখ আর-একবার দেখেন। আমাকে একটি ফর্ম এগিয়ে দেন। আমি তা ভরাট করি। উনি আমার দিকে হেসে বলেন, লা পেনতুর...। উনি উঠে যান আমার পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে। দু'-তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে আসেন। আমার ছাড়পত্র হয়ে যায়। আমি বিস্ময়ে বেবাক। সে নারীকে আমি কীইবা দিতে পারি? চোখমুখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরে যাই গতদিনের ঠিকানায়। সেই অধ্যাপক তখন কলেজে। তাঁর স্ত্রীও কাজে

শিল্পীর আঁকা ছবি দিয়ে পোস্টার

ক্রমশ রাত গভীর হয়। সুরা আর মায়ায় আচ্ছন্ন। উষ্ণতার তুরীয় মার্গে কেউ কেউ ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। কেউ কেউ বিভিন্ন ধাপে শরীর এলিয়ে দিতে শুরু করেছে। আমিও একটি কোনায় বসার জায়গা বেছে নিয়েছি। শক্তিদা আচ্ছন্ন হয়েও তাঁর অতিথিকে আগলে রেখেছেন।

> ফ্রান্সের সীমারেখা পেরিয়ে বেলজিয়ামের পথ ধরে ট্রেন এগিয়ে চলে। মায়াবী আলোয় ঢেকে আছে পৃথিবী। চাঁদ দেখা দেয়। বরফ ঠিকরে পড়ে। মনে হয়, এ পৃথিবী চাঁদভাঙা বরফে ঢাকা। কী ভুবনভোলানো রহস্যময়।

কোথাও বেরিয়ে গিয়েছেন। আমি সবিস্তারে আমার ঘটনা বলি টেলিফোনে। ওঁদের বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি প্যারিসের উদ্দেশে, ট্রেনে চেপে। আমি বিস্তারিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যাব না। বরাবরই আমার বিদেশে ট্রেনে ভ্রমণ তুলনাহীন মনে হয়। প্রকৃতিকে এইভাবে দেখার সুযোগ আর কিছুতেই যেন হয় না। প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়েছি প্যারিসে। ৩১-এর সন্ধ্যায় শক্তিদা (শক্তি বর্মণ) আমন্ত্রণ করেন, কথা হয়— আমরা যাব ইঙ্গ-ফরাসি-সন্ধ্যা কাটাতে ৩১ ডিসেম্বরের ইভের আনন্দযজ্ঞে। সেইমতো পঁম্পেদু সেন্টারে রঁদেভু ঠিক হয় শক্তিদার সঙ্গে আমার সন্ধে সাতটায়।

আমি পৌঁছে যাই ঠিকঠাক, মেট্রো ধরে। তখন ঝিরঝিরে বরফ পড়ছে। এই বরফ পড়া ঠান্ডা একটা অদ্ভুত শিহরন জাগায়। পঁম্পেদু সেন্টারের সামনের বিশাল অঙ্গনে আলো-আঁধারির ধূসরতায় এক উচ্ছল শীতশিহরন। অসংখ্য আনন্দমুখর নরনারী সবাই যেন স্ফূর্তির কলরবে মত্ত। আমি আগেই পৌঁছেছি। একটু পরে লম্বা-মোটা শীতের পোশাক আর টুপি মাথায় শক্তিদার গলা, 'শুভ... শুভ...।' উঠে পড়ি তাঁর গাড়িতে। উনি নিয়ে যান সেই বন্ধুর বাড়ি। আটটার আগেই পৌঁছে যাই। অনুষ্ঠানের ঘরটি সেলারে, আন্ডারগ্রাউন্ডে। বেশ বড়। অসংখ্য ভারতীয় নরনারী। বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি। কেউ ড. পাইন, কেউ মুখার্জি, কেউ রায়। বেশিরভাগেরই অর্ধাঙ্গিনীরা ফরাসিনী। আমি চট করে বুঝতে পারি না। কে ফরাসি, কে ইংলিশ বা ডাচ। অনেক পরে কিছুটা ধরতে পারি। প্রচুর পানীয়, খাদ্য, তারই সঙ্গে নাচ। সে নাচের সঙ্গে কোনও জাত নেই। সবাই যেন জীবনের অতীতকে ঝরা পাতার মতো ফেলে দিয়েছে। প্রকৃতিকে হার মানিয়ে উষ্ণতায় অবগাহন করা এই আর কী। মানবজাতির সব ইন্দ্রিয়ই তাড়িত করে। এখানে ঈর্ষা আছে, লালসা আছে, কামনা আছে। সবকিছুই নানা স্বাদের খাদ্যের মতো পরিবেশিত হচ্ছে। 'ককটেল' শব্দটা বেশ মনঃপূত শব্দ। অসংখ্য সাদা পায়রার মধ্যে একটা গোলা পায়রা ঢুকে পড়লে যেমন বিসদৃশ লাগে, নিজেকে আমার তাই মনে হল। যদিও আমি প্রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যদিও অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়— আমি বিশেষ একজন, যার হাতে সুরাপাত্র নেই। ক্রমশ রাত গভীর হয়। সুরা আর মায়ায় আচ্ছন্ন। উষ্ণতার তুরীয় মার্গে কেউ কেউ ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। কেউ কেউ বিভিন্ন ধাপে শরীর এলিয়ে দিতে শুরু করেছে। আমিও একটি কোনায় বসার জায়গা বেছে নিয়েছি। শক্তিদা আচ্ছন্ন হয়েও তাঁর অতিথিকে আগলে রেখেছেন। সেদিন কোনও এক বন্ধুর কৌমার্য ঘোচাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভবত, ব্যাচেলর ড. পাইনের। কোনও এক ফরাসিনীর সঙ্গে গাঁট-বাঁধা ঘোষিত হলে সবাই উল্লসিত হলেন। ইতিমধ্যে নতুন বছর ঘোষিত হল। গির্জার গম্ভীর ঘণ্টায়, বরফ-ঝরা রাতে, অন্য সভ্যতায়। ভোর দুটো কী আড়াইটে, আধঘুম চোখে আমি দেখি, যুদ্ধশেষে যেমন শ্মশানের শান্তি নেমে আসে, তেমনি স্ফূর্তির ক্লান্তিতে শায়িত মানব-মানবীরা। অ-স্বাভাবিক ছন্দে শরীর লুটিয়ে আছে ভূমিতে কিংবা কোনও আসনে। শূন্য বোতল ততোধিক নিশ্চল, শান্ত। লুটোপুটি খাচ্ছে মজাদার রাজমুকুট কৃত্রিম টুপির আকারে। সোনালি-রুপালি জরিতে মোড়া। নতুন বছর সূচিত হল সেখানে সে-বার। ১৯৭৮ সাল। ভোর হয়ে এল। ক্রমশ সাদা আলো দেখা দিল। আমি ফিরে যাব জার্মানিতে। টিকিট কাটা। শক্তিদার বাড়িতে প্যাঁটরা। সকাল দশটায় ট্রেন ছাড়বে গারে দ্যু নর্দ থেকে। মোটামুটি সাতটা-সাড়ে সাতটা হতে অনেকেই একে একে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন। গত রাতের হিল্লোল-সুখের আঘাত কাটিয়ে উঠছেন ক্রমশ। শক্তিদাকে নিয়ে বাইরে আসি। এ এক অভিনব সকালের ছবি। গোটা পৃথিবী যেন অতি পুরু বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সে-বরফ তখন পাথরের মতো। সমস্ত পথ, বাড়িঘর, গাছপালা শুধু সাদা আর সাদা। বরফে ঢাকা গাড়িগুলির কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকা ঢুকে গিয়েছে বরফে। ফরাসি বেতারে ঘোষিত হচ্ছে, যে যার গাড়ি ছেড়ে মেট্রো ব্যবহার করতে। গাড়ির দরজা খোলার চাবি কাজ করছে না। যে-কোনও জলই বরফ-পাথর হয়ে গিয়েছে। এক অভাবনীয় দৃশ্য। অন্তত প্যারিনগরী বহুকাল এ ঠান্ডা দেখেনি। আমি কী করি? আমায় পৌঁছতে হবে জার্মানি। অগত্যা শক্তিদা ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা যে যার মেট্রোর দিকে রওনা হচ্ছে। শক্তিদাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যাই রুদ্যা সিমোয়। এ-এক ভয়ংকর পরিস্থিতি। আমি আমার ব্যাগভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে আবার মেট্রোয় চলে যাই শক্তিদাকে বিদায় জানিয়ে। স্টেশনে পৌঁছে সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী ঢিপির মতো জড়ো হয়ে আছে। কোলাহলে কোনও ঘোষণাই শোনা যাচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মে পরপর আটকে আছে বাতিল হওয়া ট্রেনযাত্রীরা। কিন্তু কারও কোনও দুঃখ নেই। খ্রিস্টমাসের ছুটিতে হাজার হাজার জার্মান ছেলেমেয়েরা মিলিত হতে এসেছে ফরাসি বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে। তারাই স্টেশনজুড়ে আজ। প্রকৃতি তাদের আরও উষ্ণতার সুযোগ দিয়েছে। আমি ওই ভিড়ের মাঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে হ্যামে যাওয়ার ট্রেনটি ছাড়বে কখন ঘুরেফিরে খোঁজ নিই ভিড়ে ঠাসা কাউন্টারে। নিশ্চিন্তে, নির্দ্বিধায়, স্বাভাবিক প্রকৃতির মতো তরুণ-তরুণীরা শরীর আর ওষ্ঠে জড়িয়ে থাকে পরস্পর-পরস্পরকে। বহুস্তরে আচ্ছাদিত শীতের পোশাক আর অসংখ্য ব্যাগ-বাগালিতে উপচে পড়েছে বিশাল স্টেশনকক্ষ। নির্জীব সরীসৃপের মতো সাদা বরফে ঢাকা ট্রেনগুলি দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে। স্টেশনের ভিতরে অসংখ্য কাকলির কোলাহল। আমাদের মফস্সলে সন্ধ্যায় কোনও বটগাছের তলায় যেমন। আমিই মনে হয় একমাত্র যাত্রী যে আতঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত। আর সকলেই যেন উপভোগ করছে এই পরিস্থিতি। আমার কাছে কোনও যোগাযোগ করার পথ নেই। ওদিকে ডেডেকে দম্পতি আমার অপেক্ষায় থাকবেন। স্টেশনে আসবেন আমায় নিতে। পৌঁছনোর কথা বিকেল চারটে তিরিশে। এ ভূখণ্ডে এলে সময় চলে ঠিক সময়েরই মতো। আজ এক বিরল ব্যতিক্রম তার।

শেষ পর্যন্ত ট্রেন ছাড়ে চারটের পর। গাদাগাদি করে উঠে পড়ি। প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি বলে কিছু নেই। কামরার ভিতরে, বাইরের প্যাসেজে সবাই বসে পড়েছে। অনেকে তাদের ঘাড়ের ওপর দিয়েই যাচ্ছে। কারও কিছুতে কোনও রাগ নেই, অভিযোগ নেই। সবাই লুটোপুটি খাচ্ছে খুশিতে। কিছু কিছু চোখে বিয়োগব্যথার

অশ্রুবিন্দু। কিন্তু সে তো আমার ধারণায়। ওদের ভালোবাসা চড়ুইপাখির মতো। সবসময় কিচিরমিচির। ভালোবাসলেও ভালো, না বাসলেও। এ-জীবন, এ-সময়, এ-ভূগোলে এই। ট্রেন চলে। যত দূর দেখতে পাই পৃথিবীটা নীলাভ সাদায় মোড়া। কোনও রং নেই তার। ফ্রান্সের সীমারেখা পেরিয়ে বেলজিয়ামের পথ ধরে ট্রেন এগিয়ে চলে। মায়াবী আলোয় ঢেকে আছে পৃথিবী। চাঁদ দেখা দেয়। বরফ ঠিকরে পড়ে। মনে হয়, এ পৃথিবী চাঁদভাঙা বরফে ঢাকা। কী ভুবনভোলানো রহস্যময়। আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু নড়াচড়ার কোনও উপায় নেই। এই প্রাণের উষ্ণতায় আর ট্রেনের নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আমি ঠিকই থাকি। শুধু না জানি ভাষা, না করি পান। চেটেপুটে খাই অন্যের মৌস্বাদের নির্যাসটুকু।

ট্রেন থামে হ্যাম-এ। তখন রাত পেরিয়ে একটা বেজে গিয়েছে। আমি ছাড়া বোধহয় একজন কী দু'জন যাত্রী নেমেছে। বরফে ঢাকা প্ল্যাটফর্ম থেকে স্টেশনের সামনাসামনি চলে আসি। প্রায় জনমানবশূন্য। এক মাতাল মহিলা আপন মনে বকে যাচ্ছে আর সিগারেটে ফুঁ দিয়ে চলেছে। আমার গা ছমছম করতে থাকে আর কোথায় যাই, কার কাছে যাই?

হ্যাম শহরটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এক বিখ্যাত কলারসিক, ধনী আর সফল আইনজীবী সুসিংসের সঙ্গে। তিনি প্রতি বছর ক্রিসমাসের আগে কোনও এক উইক-এন্ডে বাড়িতে আয়োজন করেন ইউরোপের তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনী। বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘর, বাথরুমের ধার পর্যন্ত ছবিতে ভরিয়ে দেন। কমপক্ষে দুশো-আড়াইশো মাঝারি ও ছোট মাপের ছবিতে ভরে যায় তাঁর প্রাসাদ। সুসিংজের স্ত্রী উরসুলা কবি আর অত্যন্ত স্নেহশীলা মহিলা। সে পরিবারটি শুধু সচ্ছলই নয়, প্রাণবন্ত, আমুদে এক তুলনাহীন পরিবার। উইক-এন্ডের প্রদর্শনীতে ডেডেকে-র মাধ্যমে আমি হ্যাম-এর এই পরিবারের সঙ্গে আলাপিত হই। আমার ছবিও প্রদর্শিত হয় ওখানে। প্রথম দিন প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান। শ্যাম্পেন, বিয়ার, ওয়াইন অসংখ্য চিজ আর ভূরি ভূরি টুকটাক খাদ্যে খুশি মানুষেরা ভিড় করেন। ছবি বাছাবাছি চলে। ফিসফাস কথা হয়। পছন্দের নির্বাচনের পর্ব চলে গোপনে। গভীর রাতে খুশির হাট যখন ভেঙে যায়, তখন পরদিনের হিসাবনিকাশ শুরু করে নির্দিষ্ট হয়, কে কোন ছবির দাবিদার। তার

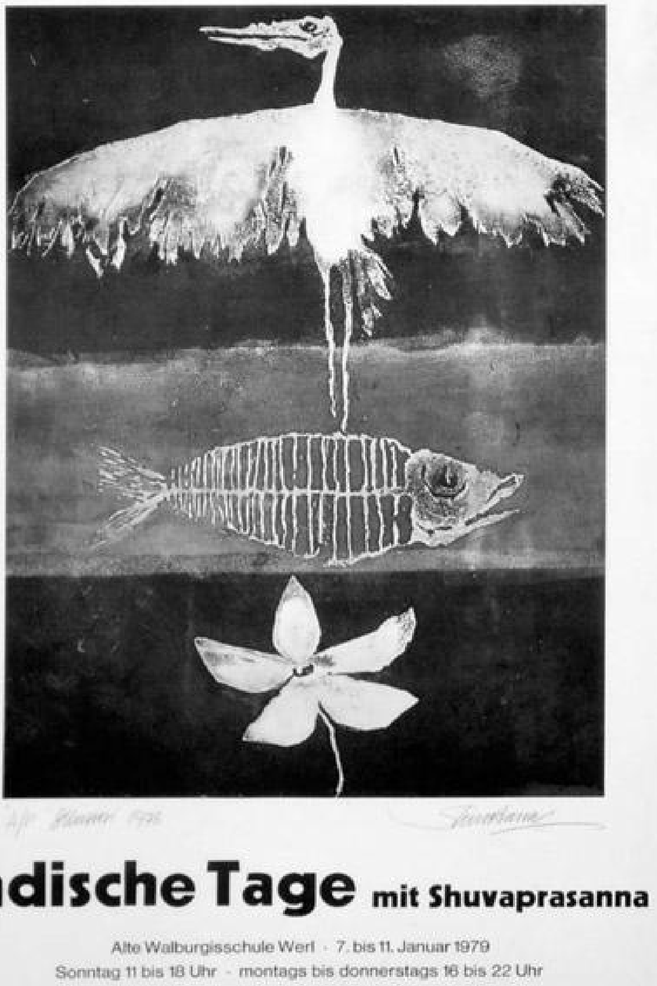

জার্মানি, ১৯৭৯। শিল্পীর প্রদর্শনী সংক্রান্ত পোস্টার

পর দিন, রবিবার, যে যার এসে নিয়ে যায় তার পছন্দের নির্দিষ্ট ছবি। এভাবেই সুসিংজের বাড়িতে ছবি উৎসব হয় প্রতি বছর এই সফল দম্পতির সৌধে। আমি খুঁজে পাই ডায়েরিতে টোকা হ্যামের সেই কৃতী মানুষের ঠিকানা, ফোন নম্বর। ফোনের বুথ থেকে পয়সা ফেলে সুসিংজকে ফোন করি, ওই রাতে। তিনিই ফোন ধরেন। আমি কিছু কথা বলতেই উনি পুরো অবস্থা বুঝে যান। আমাকে নির্দিষ্ট একটি গেটের কাছে কাচের দরজার ভিতরে অপেক্ষা করতে বলেন। দরজার তলা ঢেকে আছে বরফে। খোলাও প্রায় কঠিন। গোটা রাস্তা পুরো বরফে ঢাকা। কিছু মানুষের আনাগোনায় হয়তো কোনওক্রমে দরজাটা ফাঁকা করা যেতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ির আলো দেখা যায়। একটি বিশাল সিতরঁ গাড়ি এগিয়ে

এমনই সময় হঠাৎ চোখে পড়ে একটি কিয়স্ক। ল্যাম্পপোস্টে আটকানো। সেখানে সাঁটা রয়েছে আমার আঁকা একটি ছবি। ভ্রান্তি মনে হয়। কিন্তু দূরে দেখি, আরও একটি। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। ভালো করে দেখি, ছবির তলায় স্পষ্ট লেখা আমার নাম, আর প্রদর্শনীর ঘোষণা।

আসে। এই বিশাল গাড়িটির বৈশিষ্ট্য হল, প্রয়োজনমতো গাড়িটি সমতল থেকে উঁচু হয়ে যায়। বরফপথে সেরকম একটু উঁচু হয়ে গেল। উনি গাড়ি চালু রেখে এগিয়ে এলেন। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া। আপাদমস্তক পোশাকে ঢাকা। আমার বাক্স তুলে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করতে বললেন। আমি চটপট উঠে পড়লাম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেই বিলাসবহুল গাড়িতে। ওঁর বাড়ি স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়। কিন্তু জমির ফটক থেকে মূল বাড়ি পৌঁছতে যেন বেশি সময় নিল।

সুসিংজের স্ত্রী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়ে ওঁরা আপ্যায়ন করলেন। আহারের ব্যবস্থা ঠিকঠাক ছিল। জানালেন, ডেডেকে দম্পতি রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে হয়তো শুয়ে পড়েছেন। উনি বললেন, তুমি ক্লান্ত, শুয়ে পড়ো। সকাল আটটায় তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে তারপরে অফিস চলে যাব। আমি ওঁদের সাজানো সজ্জায় আমার ক্লান্ত শরীর রেখে দিই। সকালে জলখাবার চলে আসে। কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ওঁরা কর্মসংস্কৃতিকে শিথিল হতে দেন না। ঠিক সময়ে আমাকে বাসগুমটিতে পৌঁছে দেন সুসিংজ। কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পাই না। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাসে উঠে পড়ি। দু'-একটি স্টপেজের পরেই আমার নির্দিষ্ট ঠিকানা। নেমে পড়ি। কিন্তু সেখান থেকেও ডেডেকে-র বাড়ি হাঁটাপথে বেশ খানিকটা। বরফ ঢাকা পিচ্ছল পথ। প্রায় জনমানবহীন। আমার যথেষ্ট পোশাক ও তারুণ্যের উষ্ণতাকে হারিয়ে দিচ্ছে সে শৈত্য।

তিন-তিনটি ব্যাগ নিয়ে আমি এগোতে থাকি। মন খারাপ লাগে। ভাবি, এ পরবাস থেকে ফিরে চলে যাই। এই শীতল দেশে আমার উষ্ণতার কেউ নেই! আমি তো অনেক টাকা ইতিমধ্যে রোজগার করে ফেলেছি। প্রদর্শনী না হলেও-বা, কী যায় আসে? তখন আমার কাছে অদূর গন্তব্যও মনে হয় এক অসীম দূরত্ব। এ কোথায় আমি রঙিন স্বপ্ন দেখছি? সব উচ্চাশা যেন হারিয়ে গিয়েছে। আমি এগোতে থাকি। ভারী ব্যাগগুলো আমায় ব্যথা দেয়। মাঝে মাঝেই সেগুলোকে বরফঢাকা রাস্তায় রেখে বিশ্রাম নিই। নাক-মুখ-চোখ দিয়ে আপনি আপনি বেরিয়ে যায় নিরাশার ধোঁয়া। আবার এগোতে থাকি। এমনই সময় হঠাৎ চোখে পড়ে একটি কিয়স্ক। ল্যাম্পপোস্টে আটকানো। সেখানে সাঁটা রয়েছে আমার আঁকা একটি ছবি। ভ্রান্তি মনে হয়। কিন্তু দূরে দেখি, আরও একটি। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। ভালো করে দেখি, ছবির তলায় স্পষ্ট লেখা আমার নাম, আর প্রদর্শনীর ঘোষণা। আমার ভিতরে যেন এক নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। হঠাৎ যেন নতুন জোয়ার চলে আসে। এ হিল্লোল তারুণ্যের নয়, যৌবনের নয়, জীবনস্বপ্নের দে দোল দোল। আমি তো হেরে যাইনি। দেহে-মনে এক অকল্পনীয় শক্তি আসে। অতি দ্রুত পৌঁছে যাই ডেডেকে-র আবাসে। আমার নির্দিষ্ট ঠিকানায়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আমার আর কোনও দুঃখ নেই। ডেডেকে জড়িয়ে ধরেন। গতকালের, গতদিনের শীতল বর্ণনা আমি রঙিন করে বলি সস্ত্রীক ডেডেকে-কে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। ইতিমধ্যে সমস্ত শহরবাসীর কাছে মেয়রের পাঠানো আমার আঁকা ছবির শুভেচ্ছাপত্র পৌঁছে গিয়েছে। চারদিক পোস্টারে ঢেকে গিয়েছে। ছবি সাজানো হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল বিকেলে ভার্নিসাজ। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আসছেন বন থেকে শহরের মেয়রের সঙ্গে আমার প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। ডেডেকে দম্পতির মুখে সাফল্যের হাসি। ইতিমধ্যে আমার সব ব্যথা জুড়িয়ে গিয়েছে, কিছু স্থানীয় সংবাদপত্রে বেরিয়েছে প্রদর্শনীর ইতিবৃত্ত। ওঁরা আমায় বিশ্রাম নিতে বলে সেদিন বিকেলের কর্মসূচি জানিয়ে দেন। আমি চলে যাই আমার ঘরে বিশ্রামের অছিলায়— একান্ত উচ্ছ্বাসের ভাগীদার হতে গোপনে, একান্তে, নিজের মধ্যে আগামীকালের স্বপ্নে। গতকালের প্রতীক্ষায়।

আমাদের জীবনে খুশি, আহ্লাদ, উল্লাস, হিল্লোল এসবই কোনও-না-কোনও ঘটনায় আসে। আকাঙ্ক্ষাপূরণের দিকে কিংবা বাড়িয়ে তোলার দিকে যা জীবনের সেই মার্গে পৌঁছনোর পথে বাধাস্বরূপ। কিন্তু কী-ই বা করতে পারি। আমি তো আকাঙ্ক্ষাহীন হতে পারিনি! মানুষী প্রেরণা, মানুষী প্রেম, পার্থিব চাওয়া-পাওয়া তো আমায় ঘিরে আছে। আমার যাচিত জীবন তো পার্থিব উদ্দেশ্য ঘিরে। তাই এই বিদেশবিভূঁইয়ে সেই ইচ্ছাপূরণের ইঙ্গিতে আমার শরীরে প্রাণের হিল্লোল তুলেছিল। যদিও আমার উচ্ছ্বাসের ভাগীদার হওয়ার কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। প্রদর্শনী খুব সফল হয়েছিল। অনেক নতুন শিল্পীবন্ধু গুণগ্রাহী জুটেছিল। বেশ কিছুদিন ওদের আতিথ্যে, সাহচর্যে আর অনেক অনেক আমন্ত্রণ পেয়ে কত সন্ধ্যা কেটেছে, তা এখন সুখস্মৃতি মাত্র।

ক্রমশ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০
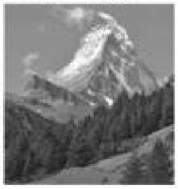

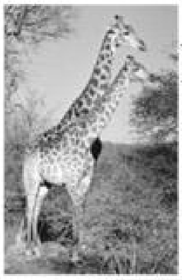
আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড।
ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন।
ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া।
ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া।
মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া।
চেক রিপাবলিক। নেপাল।
নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়।
হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া।
অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ।
কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

আলিপুর মহকুমার এস ডি ও বিমল। আসন্ন বিধানসভা ভোটের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে সে যাদবপুর কেন্দ্রে সুষ্ঠু নির্বাচন করানোর জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু ইতিমধ্যেই নানা আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যায় সে জেরবার। যেমন, একদিন দুপুরে জেলাশাসকের জরুরি তলব পেয়ে দুপুরের বিশ্রাম মুলতুবি রেখে তাকে ছুটতে হল বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে। সেখানে একটি পুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে জড়ো হয়েছে একাধিক ব্যক্তিগত সমস্যাও। সময়াভাবে আয়কর রিটার্ন জমা না দেওয়ায় তার নামে ভিজিল্যান্স দপ্তরের চিঠি এসেছে। যদিও স্ত্রী সীমার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে সামান্যই টাকা পড়ে আছে তার। এর মধ্যে বিমলের কাছে এক মহিলা অভিযোগ করেন, তারই মহকুমার এক যুবক পুলিশ অফিসার তাকে বিরক্ত করছে। অন্যদিকে, যাদবপুর কেন্দ্রে বিরোধী দলের প্রার্থী প্রাক্তন আই এ এস চন্দন সেন ডি এম-এর কাছে অভিযোগ করেছেন, বিমল নাকি তাঁর কেন্দ্রের অনেক জেনুইন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। থেকে থেকেই ফোন করে বিমলের মনের ওপর চাপ ফেলার খেলা শুরু করে দিয়েছেন বিরোধী দলের প্রার্থী। একদিন সন্ধ্যায় ফোনেই একচোট উঁচু গলায় তর্ক হয়ে গেল তার সঙ্গে বিমলের। বিমলের বৃদ্ধা মা ছেলের মানসিক পরিস্থিতি দেখে শুধু বিলাপ করেন, কেন যে মিছিমিছি স্কুলের চাকরিটা ছাড়ল বিমল!

৭

বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গেল আজ সকালে। নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছেন ভোট নির্ঘণ্ট। কমিশনের সঙ্গে এই 'নির্ঘণ্ট' কথাটি যেন বেমানান। বাংলা সংবাদপত্র এটি ব্যবহার করেছে, কিন্তু কেউ মুখে এই কথাটা বলে না।

বিমল মনে মনে একটা তারিখ আন্দাজ করেছিল। সেটা বাস্তবে না মিললেও কাছাকাছি আছে। নমিনেশন দেওয়া-নেওয়া আরম্ভ হবে ৭ মে থেকে। তারপর নিয়মমাফিক উইথড্রয়াল, ফাইনাল পাবলিকেশন ইত্যাদি আছে। বিমল জানে আলিপুর সদর ইলেকশনের কর্মীদের বেছে বেছে বিভিন্ন দপ্তর থেকে তুলে আনা। এক-একজন অফিসার— হরেক সার্ভিসের। তাছাড়া আছেন এস ডি ও-র সেকেন্ড অফিসার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো অফিসারটিকে কালেক্টরেটের ভিন্ন এক দপ্তরে বদলি করার অর্ডার এসে গেল। এমনকী নতুন মেয়ে বি সি এস অফিসারটি দুপুরেই জয়েন করে গেল। নাম মল্লিকা সরকার। সবে বি ডি ও থেকে উঠে ডেপুটি হিসেবে জয়েন করল। মেয়েটি যে নির্বাচনের কাজ ভালো জানে, একথা বিমল শুনেছে। ফলে ভালো একজন অফিসার পাওয়া গেল— এটা ভরসার কথা।

সকাল সকাল ডি এম দামিনী সেন মিটিং ডেকেছিলেন। টানা তিন ঘণ্টার মিটিং। মিটিংয়ে আসন্ন জরুরি কাজকর্ম নিয়ে তালিকা ধরে ধরে আলোচনা হয়েছে। সঙ্গে প্যাকেট লাঞ্চও ছিল— বিরিয়ানি, দই সমেত। এই খাওয়ার বহর দেখে বোঝা গেল, নির্বাচন এল বলে।

সেকেন্ড হাফে ঘরে এসে মনে হল ব্যাগে আছে সীমার দেওয়া রুটি, বেগুনভাজা, শসা। আর আধখানা রুটিতে মোড়া একটি গুড়ের বাতাসা। ওটা তো বাড়িতে ফেরত যাবে।

এরই মধ্যে ফোন এল হাইকোর্টের এক মহামান্য বিচারপতির কাছ থেকে। গম্ভীর স্বরে তিনি তাঁর ছেলের সচিত্র পরিচয়পত্র তুলিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

দামড়া এবং বিশাল আকৃতির জজপুত্র খানিক পরেই এসে উপস্থিত। সঙ্গে সাদা পোশাকের সিকিউরিটি। বয়সের প্রমাণপত্রে লেখা আছে— বাইশ। কিন্তু দেখে মনে হয় তিরিশ পার। মস্ত ভুঁড়ি। তার সঙ্গে মানানসই জাঁদরেল গোঁফ। হাতে নিজস্ব ফাইল। বিমল জজ পুত্রের রক্ষীকে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলে তাকে বসতে বলে।

ছেলে বসেই প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

চড়াং করে মাথায় রক্ত উঠে যায় বিমলের। সে ফাইল থেকে চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'কী প্রয়োজন?'

— না, মানে, বাবা আপনার নামটা জেনে নিতে বলেছেন।

বিমল গম্ভীর মুখে বলে, 'যাওয়ার সময় নেমপ্লেটে দেখে নেবেন।'

বড়বাবু এসে দাঁড়ান। বিমল বসতে বলে। তারপর বলে, 'বড়বাবু, ছবি তোলার ঘর থেকে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন। এঁর একটা ছবি হবে।'

বড়বাবু বলেন, 'স্যার, কম্পিউটার ঘরের কিছু বিল ছিল। আর ওই ক্যাজুয়াল স্টাফদেরও—'

বিমল তাকায় বড়বাবুর দিকে, 'আচ্ছা, আপনারা সবাই টিফিন-প্যাকেট ঠিকমতো পান তো?'

— হ্যাঁ, স্যার। তবে আমি তো খাই না। তাই ওটা আপনার যে সিকিউরিটি থাকে, তাকে দিয়ে দিই।

— সে কী! সারাদিন না খেয়ে কাজ করেন!

— স্যার, বাড়ি থেকে চিঁড়া নিয়ে আসি তো।

বিমল অবাক হয়ে তাঁকে দেখে। তিনি হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন। এই হাসির মধ্যে অদ্ভুত নিরাসক্তি আর নির্বিকার ভাব। এমন মানুষ একালে দেখা যায় না। বোধ হয় এটাই শেষ জেনারেশন চলছে।

ফাইলটা নিয়ে বিমল অতি দ্রুত সই করতে থাকে। বড়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। 'স্যার, দেখে নিচ্ছেন না যে, ভুলও তো হতে পারে।'

বিমল হাসে, 'আমি দেখে নিয়েছি। আপনার সই আছে তো।'

জজসাহেবের ছেলেকে ছবি তোলার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যায় সেই ঘরে ডিউটিরত পিয়ন। যাওয়ার আগে সে কেমন যেন বোকামি-মিশ্রিত কতক উদ্ধত হাসি হাসে এবং বলে, 'ছবিটা এখন পাবো তো'?

বিমল বলে, 'পাবেন, তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।'

অর্ডারলি এসে স্লিপ দেয়। নাম লেখা চন্দন সেন। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধী দলের প্রার্থী। অর্থাৎ সেই রিটায়ার্ড আই এ এস অফিসার। অর্ডারলি জানায়, সঙ্গে লোকজন আছে।

বিমল বুঝতে পারে, ভদ্রলোক সেজেগুজেই এসেছেন। সে বলে, 'বসতে বলুন, আমি ডেকে নেব।'

দরজার পাশ দিয়ে যাদবপুর কেন্দ্রের অফিসার পার্থবাবুর মুখ। বিমল মাথা নেড়ে

ডাকে। পার্থবাবু বলেন, 'স্যার, চন্দন সেন এলে আমি কি এ ঘরে থাকব?'

বিমল হাসে, 'কেন, আমাকে লড়াইয়ে সাহায্য করবেন বুঝি?'

পার্থ হাসেন, 'লোকটি সুবিধার নয় স্যার।'

— বেশ তো, উনি ঢুকলে একটু পরে আপনি একটা ফাইল নিয়ে চলে আসবেন।

বিমল ফাইল সারার ফাঁকে সেলফোন বাজে। ওপারে চন্দন সেন, 'আপনার লোক আমায় বসতে বলল। তা কতক্ষণ বসতে হবে, জানতে পারি কি?'

বিমল শান্ত গলায় বলে, 'আপনাকে আমি যথাসময়ে ডেকে নেব।'

বিমল লাইন কেটে দেয়।

এবার ফোন করেন এ ডি এম প্রবীর সেন।

— কী খবর এস ডি ও সাহেব?

— ভালো স্যার। কাজ চলছে পুরোদমে।

— হুঁ, কাজ তো চলছে ভালোই। কিন্তু কাজে বাগড়া দেওয়ার লোক আপনার কাছে এসে গিয়েছে তো?

— দেখা যাক স্যার।

— আচ্ছা! আপনি তো চ্যালেঞ্জ করছেন মশাই! পুরনো আমলা কিন্তু।

— ওঁর বায়োডাটা আমার মুখস্থ স্যার। আমিও তো একটা ছোটখাটো আমলা স্যার।

— রাইট-রাইট এস ডি ও সাহেব।

ফোন রেখে দেন সেনসাহেব।

বিমল হাতের কাছে রাখা ফাইলগুলো সারে। এগুলো পরেও করা যেত। কিন্তু বিমল ইচ্ছে করেই সময় নেয়। দেরি করে।

বেশ খানিক পরে বিমল বেল দেয়। অর্ডারলিকে বলে, 'ওঁদের আসতে বলুন।'

আমার চোখের সামনে যথারীতি ফাইল মেলে রাখা। অর্ডারলি দরজা খুলে মেলে ধরেছে। তার ফাঁক দিয়ে পরপর মানুষ সেঁধোচ্ছে— কমপক্ষে জনা পনেরো। সব শেষে যিনি আসেন, তিনি পাজামা ও খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা। কামানো মুখ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কলপ করা চুল কপালের ওপর ফেলে রাখা। এই চেহারায় আগে দু'খণ্ড গোঁফ ছিল।

চন্দন সেন কোনওমতে আধখানা হাত জোড় করেন। বিমল সামনে হাত বাড়িয়ে বলে, 'বসুন, বসুন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ', বলে তিনি বসেন, বেশ এলিয়ে, পায়ের ওপর পা দিয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁকে ঘিরে বসে— সামনে-পিছনে। চন্দন সেন বলেন, 'আপনাকে যেন মনে হচ্ছে আমি আগে কোথাও দেখেছি।'

বিমল সামান্য হাসে, 'হতে পারে।'

— হতে পারে নয়। আমার মেমরি খুব ভালো।

— আচ্ছা।

— আচ্ছা, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন না? ওতে মনে হয় ইলেকশনের কোড অব কনডাক্টে বাধে না।

বিমল বলে, 'অবশ্যই।'

সে বেল টিপে সকলকে চা দিতে বলে।

চন্দনবাবু হঠাৎ বিমলের পিছনে দেওয়ালে টাঙানো বঙ্কিমচন্দ্রর ছবির দিকে আঙুল তুলে বলেন, 'ওঁর ছবি এখানে কেন?'

বিমল মনে মনে অবাক হয়— একজন প্রাক্তন পদস্থ আমলার এ ধরনের প্রশ্নে। সে শুধু বলে, 'ওর সঙ্গে এই সাব-ডিভিশনের গভীর সম্পর্ক ছিল, তাই।'

সেন ভ্রু তুলে বলেন, 'কী রকম?'

— উনি এখানে মোট তিন দফায় ডেপুটি হিসেবে কাজ করেছেন।

— বটে!

— হ্যাঁ। আর এখান থেকেই এস ডি ও হয়ে রিটায়ার করেন ১৮৯১ সালে। তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

— এটা তো নতুন বাড়ি। তা উনি বসবেন কোথায়?

— এখন যেখানে জি পি-র অফিস, তারপর মহকুমা আদালত, ওখানেই এস ডি ও-র অফিস-চেম্বার ছিল।

— ইন্টারেস্টিং! এখনকার সরকারের মন্ত্রী-সান্ত্রিরা এসব খবর রাখে না। অত সময় কোথায়?

বিমল মনে মনে বলে, 'আপনি রাখেন তো!'

চা এসে পড়ে, এনামেলের থালায় মাটির খুরি সাজিয়ে। বিমলের চা শুধু তার জন্য তুলে রাখা গ্লাসে দেয় চা-দোকানি ছেলেটি।

বিমল সকলের উদ্দেশে বলে, 'নিন, চা নিন।'

চা খাওয়া ফুরোয়। এবার চন্দনবাবুর এক চেলা তাঁর হাতে একখানা লম্বা ফর্দ আর কিছু কাগজ ধরিয়ে দেয়। তিনি এবার স্বরূপে আসেন। তাঁর মুখের জটিল ভাব এবার সত্যিই কুটিল হয়ে যায়। তিনি কাগজগুলো সামনে তুলে ধরে বলে ওঠেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন, এত কাগজ তৈরি করতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। তা কিন্তু নয়। যেহেতু এলাকাটা আমরা হাতের তালুর মতো চিনি, তাই মাত্র আধঘন্টায় এসব তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

বিমল কোনও কথা না বলে সামনে চেয়ে থাকে।

সেন বলে যান, 'এখানে লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া বুথগুলো হল বিপজ্জনক। এখানে সব ক্রিমিনালরা বুথ দখল করে থাকে। এবারেও হবে। এইসব জায়গায় সি আর পি এফ দিতে হবে।'

— কতগুলো বুথ?

— ধরে নিন নাইনটি পার্সেন্ট।

— হুঁ।

— তাছাড়া আছে লোকাল ক্রিমিন্যালস-দের লিস্ট। এরা ভোটের আগে থেকে বিভিন্ন হোটেলে এসে থাকে, সরকারি প্রোটেকশনে। এদের অ্যারেস্ট করার ব্যবস্থা করতে হবে।

— হুঁ।

— আর আছে কতগুলো বুথ বদলাতে হবে। ওইসব জায়গায় ভোট করা সম্ভব নয়। মানে, ল অ্যান্ড অর্ডার পয়েন্ট থেকে।

বিমল চুপ করে শোনে সেনসাহেবের কথা। তাঁর দলবলও পাশ থেকে মন্তব্য ছুড়ে দিতে থাকে। বিমলের পিছনে দেওয়ালে অবস্থিত বঙ্কিমচন্দ্র বলে যান, 'তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন,—

বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্

শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না— সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে, —জিজ্ঞাসা করিল, মাতা কে?

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন,—

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,

ফুল্লকুসুমিত— দ্রুমদলশোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বলিল, এ ত দেশ, এ ত মা নয়—

ভবানন্দ বলিলেন, আমরা অন্য মা মানি না— জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

আজ ফিরতে প্রায় রাত দশটা বেজে যায়। যাওয়ার আগে এ ডি এম সেনসাহেবের সঙ্গে দেখা করে চন্দন সেন থেকে ধরে বঙ্কিমচন্দ্র সবই। প্রবীর সেন কৌতূহলী এবং বুদ্ধিমান যুবক। তিনি বেশ মজা করে শোনেন এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য জুড়ে দেন। তাঁর গাড়িতেই ফেরে বিমল। ওপরে ওঠবার আগে বলেন, 'আসুন না। দুটো পেগ হয়ে যাক।'

বিমল হেসে বলে, 'আজ রাত হয়ে গিয়েছে স্যার, আর-একদিন হবে।'

সেনসাহেব লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠে যান।

বিমল কলিং বেল টিপে শুনতে পায়, ভিতরের ঘরে মেয়ে মুনি গান গাইছে। সে গাইছে মল্লার ঘেঁষা কোনও একটি রাগ। বোঝা যাচ্ছে, গুরুর কাছে সবে রাগটা পেয়েছে। রেওয়াজ করছে সদ্য-শেখা স্বরে। কিন্তু যেহেতু ওর কণ্ঠস্বরটি ভারি সুরেলা, তাই শুনতে বেশ লাগছে।

ক্রমশ

সমীর স্মরণে

অতীন্দ্রিয় পাঠক ও কালীকৃষ্ণ গুহ সম্পাদিত ও মায়া সেনগুপ্ত প্রকাশিত সমীর সেনগুপ্তর উদ্দেশে নিবেদিত স্মরণলেখ সংকলন 'সমীর' থেকে কয়েকটি মাত্র লেখা 'কালের কষ্টিপাথর'-এ পুনর্মুদ্রিত হল। এই পুনর্মুদ্রণে সানন্দ সম্মতি জানিয়ে প্রকাশক আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। এই সুযোগে লেখকদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সমীর সেনগুপ্তর রেখাচিত্রটির জন্য শিল্পী হিরণ মিত্রর কাছে আমরা ঋণী।
সব ক'টি লেখাতেই মূলের বানান অপরিবর্তিত।

বন্ধু, রহো রহো সাথে

সুধীর চক্রবর্তী

সমীর সেনগুপ্ত নামে কোনও ব্যক্তিকে আমি বছর কয়েক আগে চিনতাম না, নাম শুনেছি, চোখে দেখিনি। 'না দেখাই ছিল যে ভালো'। কারণ আলাপ পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, তার থেকে নানারকম কাজের ভাবনা আর পরিকল্পনা যখন সবে দানা বেঁধেছে তখন আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ কানে এল।

মানুষটি ছিলেন স্বচ্ছ চিন্তার মানবতাবাদী, তাই নির্দেশ ছিল তাঁর প্রয়াণ ঘটলে কোনও মরণোত্তর শাস্ত্রীয় কর্তব্য যেন না করা হয়। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীরা (তাঁদের সংখ্যা যে এত জানতাম না) তাঁরই বাসস্থান সংলগ্ন একটু অঙ্গন বেছে নিয়ে এক স্মৃতিসভার আয়োজন করেছিলেন। আমি সেখানে প্রাণের টানে হাজির হয়ে দেখি অনাড়ম্বর ভাবে একটা ঘেরা জায়গায় ছোট মঞ্চে রয়েছে তাঁর লেখা বইগুলি, আর রয়েছে তাঁর এক সহাস্য স্বভাবসংগত আলোকচিত্র। সে স্মরণানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান হল, সময়োচিত ভাষণ হল, অনেকে বললেন তাঁদের স্মৃতিকথা। কেবল মনে হতে লাগল এমন করেই এত অনায়াসে একজন মেধাবী কর্মতৎপর সারস্বত ব্যক্তিত্বের করুণ অন্তর্ধান ঘটে যেতে পারে? তাঁর প্রয়াণের কোনও প্রাক্‌প্রস্তুতি ছিল না। কদিন আগেই সমীর তাঁর দূরভাষ যন্ত্রে সোল্লাসে জানিয়ে ছিলেন ঢাকায় যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ভাষণ দিতে। বাংলাদেশের বরিশাল তাঁর জন্মভূমি, তাই সেইখানে যাবার একটা আততি আর স্বপ্ন তাঁর সর্বদাই থাকত মনে মনে। সে আকাঙ্ক্ষা মিটল না! পাশপোর্ট ভিসার অকারণ জটিলতায় জেরবার হয়ে আগের কদিন ছোটাছুটি আর উদ্বেগে কেটেছে। শ্বাসযন্ত্রের একটা স্থায়ী সমস্যা বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে কাবু করে রেখেছিল। সদা সতর্ক থাকতেন, তবু কোন্ রন্ধ্র দিয়ে মৃত্যুদেবতা তাঁকে টেনে নিলেন চিরসুপ্তির অনন্ত শমশান্তিলোকে? পার্থিব কাজে সঙ্গসান্নিধ্যের উষ্ণতায় তাঁকে আর ধরা ছোঁয়া যাবে না।

বয়সের হিসাবে সমীর আমার অনুজ ছিলেন বলেই তাঁর বিয়োগব্যথা বেশি করে শোচনীয় লেগেছে আমার। বিশেষ করে একটা শূন্যতাবোধ জাগল তাঁর স্বপ্নিত অথচ অনারব্ধ নানা পরিকল্পনা প্রার্থিত সফলতার মুখ দেখবে না ভেবে। আশ্চর্য এই কর্মিষ্ঠ গবেষক ও সাহিত্যপ্রেমীর সঙ্গে যখনই দেখা হত, তখন কথা হত সেই মুহূর্তে কোন্ সারস্বত কর্মে তিনি ব্যাপৃত। তাঁর নিজস্ব কম্পিউটারে অনবদ্য নৈপুণ্যে গড়ে তুলছেন কোন্ বইয়ের সুচারু ও নির্ভুল পাণ্ডুলিপি— সন্ধান পাচ্ছেন আরও কি নতুন সংবাদের উৎস। এখন আর এসব আলাপচারি হতে পারবে না। জানতে পারবে না যে কাজটি করছিলেন তার পিঠোপিঠি কোন কাজটি আসন্ন সংকল্পে রূপমন্ত হবে। তাই তাঁর স্মরণসভায় যে কথাগুলি অপ্রগল্‌ভভাবে নিবেদন করেছিলাম, এখন এই স্মরণলেখতে, সেই কথাই আরেকবার বলি, যে, সমীরের মৃত্যু ঠিক শারীরিক মৃত্যু নয়, এ হল এক উজ্জীবন্ত মেধার মৃত্যু। তাঁর দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা শৃঙ্খলায় যা ভেবেছেন, যে সব সিদ্ধান্ত ও নির্ণয়ে পৌঁছেছেন, সেই পরিণত ভাবনার দায় আমরা নিতে পারব না, কারণ আমরা তো প্রস্তুত নই, সে কাজের যোগ্যও নই। কাজেই অসম্পূর্ণ ভাবনার ছিন্নসূত্রের অসেতুসম্ভব শূন্যতায় আমাদের জীবন কাটবে। এমন তো কোনোদিন ভাবিনি।

সামাজিক জীবনযাপনে সদ্যলব্ধ শোক আর তাৎক্ষণিক শূন্যতাবোধ আমাদের অনেকটাই বিমূঢ় করে দেয়, তারপরে ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবোধ আসে, ঘিরে ধরে নানা কাজের দায়ভার, পরিপার্শ্ব টানে নানা বস্তুবিষয়ের দিকে— মৃত্যুর পরাক্রান্ত শক্তিকে আমরা ভুলতে থাকি। তারপরে একটার পর আর একটা দিনের আস্তরণ ঢেকে দেয় মৃত্যুতীরের পথে অনন্ত যাত্রী আমাদেরই নিতান্ত আপন আত্মজনদের। মনের মধ্যে তৈরি থাকা সুপরিসর স্মৃতিলোকে চলে যান সদ্যমৃতরা। আমরা শুধু চোখে দেখি এক বাঁধানো ফটো— তার অন্তরালবর্তী মনের হদিশ আর পাই না। সমীর সেনগুপ্ত-র স্মৃতি বাসরে আলেখ্য-র নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজানো ছিল তাঁর লেখা বইগুলি। সেটাই তাঁর বেঁচে থাকার সত্য অভিজ্ঞান, আর যে-সব বই প্রেসে আছে অপ্রকাশিত, যে-পাণ্ডুলিপিগুলি রয়ে গেছে প্রস্তূয়মান স্তরে, সে সব হয়তো সাবয়ব হয়ে উঠবে ক্রমে ক্রমে সজ্জন বন্ধুদের প্রয়াসে। কিন্তু আমরা যাঁরা কয়েকজন একটু আধটু জানতাম তাঁর নব পরিকল্পিত রচনা বিষয়ে, সেগুলি আর সৃষ্টির আলোপথ দেখবে না। যোগ্যজনের আকস্মিক

মৃত্যু সব স্বপ্নকে গ্রাস করে নেয়। জানি যে কত নিপুণতায়, ধৈর্যে ও পরিশ্রমে তিনি তাঁর প্রিয় কম্পিউটার যন্ত্রে নিজস্ব ছাঁদে ও শিল্পিতায় আপন মনে একাগ্র হয়ে বসে এক একটা বিচিত্র স্বাদের রচনা লিখে ফেলতেন এবং হয়তো তিনি আমাদের সময়ের এক বিরল সারস্বত কর্মী যিনি নির্ভুলভাবে ও নান্দনিক রুচিতে তৈরি করে নিতেন সুমুদ্রিত একটা আস্ত বই, যা প্রকাশকদের নিশ্চিন্ত করত। তাঁর দিনযাপনের একটা প্রধান অংশ কেটে যেত মুদ্রণ কাজে। এতটা, যে আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা তাঁকে যারা আর দেখতে পাব না, সঙ্গ সান্নিধ্য ও সতর্ক বাচনের উষ্ণতাবঞ্চিত থাকব, সেই সঙ্গে তার মুদ্রণ যন্ত্রটি প্রতিক্ষণ আতভিরা হৃদয়ে অপেক্ষাতুর থাকবে এক তৎপর অঙ্গুলিস্পর্শের জন্য।

মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত হল আকস্মিক অতর্কিত দুর্দৈবকে মেনে নেওয়া। তবু সমীর সেনগুপ্তকে হারানোর চেয়ে অনেক শোচনীয় অন্তর্ঘাত মনে হচ্ছে তাঁর স্মরণলেখ রচনা। আমি তো তাঁর মতো যন্ত্রনিপুণ নই তাই এ লেখা স্বহস্তে রচনা করতে গিয়ে লেখনী কম্পিত হচ্ছে আর কলমের পেছনে যে সংবেদী মন তা বিহত বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু কেন? তার একটা বড়ো কারণ হল সমীরের সঙ্গে আমার অনেক বেশি সংযোগ ছিল দূর আলাপনীতে। মাঝে মাঝেই ভেসে আসত আমার মফস্সলি ভোরে তাঁর কণ্ঠ : 'আমি সমীর সেনগুপ্ত বলছি।' তার পরেই হয়তো জানাতেন কোনও নতুন তথ্যপ্রাপ্তির সংবাদ বা আমার কোনও সদ্য লেখা পড়ে ফেলার আনন্দ। তার পিঠোপিঠি জানাতেন নবভাবিত বিষয়ে বই লেখার পরিকল্পনা এবং প্রশ্ন : 'কেমন হবে বলুন তো ব্যাপারটা?' এই প্রশ্ন বা গুণগ্রাহিতা যেমন আর কোনদিন পাব না, তেমনই ফোন করলে ও প্রান্ত থেকে মন্দ্র কণ্ঠে শোনা যাবে না, 'হ্যাঁ বলুন।'

আমি কোনোভাবেই এ-লেখায় সমীরের লেখার বৈশিষ্ট্য বা গুণপনা বিষয়ে কিছু লেখার কথা ভাবছি না। তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে নানা বই সম্পর্কে আমার মত বা মন্তব্য করেছি, তিনি তা ব্যগ্র হয়ে শুনতেন, প্রশ্নও করতেন। তাঁর বই সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় রিভিউ-আর্টিক্‌লও লিখেছি, যা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়া বা আহ্লাদ জানাতেন। তাঁর লেখা বই বেশ কটি স্বহস্তে সই করে আমাকে উপহারও তো দিয়ে গেছেন। তাতে বুঝেছিলাম তাঁর আগ্রহ ছিল যে বইয়ের পাঠক হিসাবে আমি তাঁকে নতুন ভাবনা কিছু উজিয়ে দিতে পারি কিনা। তবে আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল তাঁর অকপট বন্ধুপ্রীতি, যা আমাদের আরেক বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে বরাবর নানা অত্যাশ্চর্য ও নিখুঁৎ গবেষণাজাত একাধিক বইতে ধরা আছে। গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত শক্তি-র সব রচনা, এমনকি

সমীর সেনগুপ্তকে হারানোর চেয়ে অনেক শোচনীয় অন্তর্ঘাত মনে হচ্ছে তাঁর স্মরণলেখ রচনা। আমি তো তাঁর মতো যন্ত্রনিপুণ নই তাই এ লেখা স্বহস্তে রচনা করতে গিয়ে লেখনী কম্পিত হচ্ছে আর কলমের পেছনে যে সংবেদী মন তা বিহত বেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তার ফেলে দেওয়া কাগজ থেকে রত্নোদ্ধার, তার জীবনী রচনা, সব তাতেই কী চমৎকার এক বন্ধুতার মরমি আস্বাদন জড়িয়ে থাকল এমনকি শক্তি নিজেও তা জেনে যায় নি।

সমীর সেনগুপ্ত-র সব বইতে লেখক পরিচিতিতে লেখা আছে যে, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সেই সগর্ব ঘোষণা থেকে বোঝা যায় তাঁর গুণগ্রাহিতার উচ্চ রুচি গঠন আর ঘরানার দীপ্তি। বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে সমীর শিষ্যঋণ মিটিয়েছেন তাঁর এক অসামান্য জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নে। এই প্রসঙ্গে মনে হল সাহিত্যের মহৎ চর্চিত বিদ্যাসত্রে যাঁর দীক্ষা ঘটেছিল তাঁকে জীবিকাজীবনে সম্পূর্ণ অন্য এক চাতুর্যপূর্ণ বিপণন কাজের হৃদয়হীন পরিবেশে কাটাতে হয়েছে কেতা কানুন মেনে। তারপর যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখন সঙ্কল্প করে দুটি জিনিস চিরতরে ত্যাগ করতে কোনও দ্বিধা হয়নি। এক, শার্ট ট্রাউজার পরা। দুই, খবরের কাগজ পড়া। চমকপ্রদ যুগল সিদ্ধান্ত এবং যা থেকে তাঁর আত্মস্থতার ব্রতে একটা নতুন ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছে। খবরের কাগজের প্রাত্যহিক তুচ্ছতা পরিবেশন আর ভাবনা ঘুলিয়ে দেবার যে দৈনন্দিন তা যে তাঁর ধ্যানের একনিষ্ঠ ব্রতের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তা বুঝে এমন অভিনব সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। এ কথা জেনে তাঁর চারিত্রশক্তি সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাবোধ জেগেছিল তা আজও অটুট। পাশাপাশি, মনে পড়ে, তাঁকে দেখেছি, অন্তত শেষ এক দশক, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা পোশাকে, বাহুল্যহীন এবং তৃপ্ত। সেই পোশাকেও তেমন অর্থ বিত্তের বা কুলীন জানানদারি ছিল না। এ সবই আসলে তাঁর অন্তর্জীবনে মগ্ন থাকার এক পূর্বপ্রস্তুতি। তিনি হতে চেয়েছিলেন সর্বক্ষণের ও সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে একজন নিবেদিত সারস্বত কর্মী। জানতেন যে, ব্যাধি তাঁকে গ্রাস করেছে, কাজের প্রহর বয়ে যাচ্ছে, শরীরগত সামর্থ্য চোখ রাঙাচ্ছে, পুরোনো খাদ্যাভ্যাস আর ঘনঘন ধূমপানের আমূল পরিবর্তন চাই। সচেতনভাবে সবকিছুই সতর্কতার সঙ্গে পালন করছিলেন কিন্তু এক মুহূর্তেও বুঝতে পারেননি যে, জীবনের সংকল্প আর সিদ্ধির মধ্যে একটা দীর্ঘ ছায়াসম্পাত ঘটে যায়, কত কিছু থেকে যায় অনারব্ধ। বরাদ্দ হয় শুধু সন্তাপ ও শোচনা। সেটা অবশ্য এখন রয়ে গেল শুধু আমাদের তরফে।

সমীর সেনগুপ্তের সঙ্গে যে কবার দেখা হয়েছে, মনে পড়ছে, তার মধ্যে একবারই তিনি আমার কৃষ্ণনগরের বাড়িতে এসেছিলেন আর আমি বারদুয়েক গেছি তাঁর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে। অথচ এর বাইরে বেশ কবার তাঁতে আমাতে দেখা হয়েছে বা তিনি এসেছেন আমার কাছে বিশেষ আহ্বানে। সব আগমনের বা সম্মিলনের লক্ষ্য ছিল কোনও কিছু লেখার পরিকল্পনা বা গ্রন্থরচনায় পূর্ণতা সাধনের অভিপ্রায়। তাঁর অতিপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য উৎসাহদাতা শঙ্খ ঘোষের ফ্ল্যাটে একবার আমার গান শোনানোর উপলক্ষে সমীরকে ডেকেছিলেন। তিনি বেশ মন দিয়ে আমার গান শুনলেন এবং ফেরার পথে অনেকক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে গান বিষয়ে যেসব কথা বললেন তাতে বুঝলাম গান বিদ্যাটি তাঁর মর্মগত। খানিক পরে সলজ্জে জানালেন বাংলা গান নিয়ে তিনি একটি এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বই তৈরি করে ফেলেছেন। অচিরে সেটি আমায় দেখতে দিলেন এবং আমার পরামর্শমত তার নানা প্রসঙ্গে নতুন তথ্য বা বিশেষজ্ঞের মন্তব্যের জন্য সংগীততাত্ত্বিক ও গায়ক দিনেন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে দেখিয়ে নিলেন। পরে যখনই তাঁর নতুন কোনও বইয়ের মুদ্রণ সংক্রান্ত খবর দিতেন আমি জানতে চাইতাম সেই প্রস্তূয়মান গান বিষয়ক কোষগ্রন্থটির কতদূর কাজ এগোলো। উনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতেন, 'না না, সে কাজের অনেক দেরি। অনেক খুঁটিনাটি ঝাড়াই বাঝাই করতে হবে। সময় লাগবে।' হায়, সে সময় আর পেলেন কই?

শঙ্খদা খুব যত্ন করে আগ্রহ ভরে সমীরের পাণ্ডুলিপি দেখে দিতেন তার গ্রন্থরূপ প্রাপ্তির আগে। তাঁর প্রতি সমীরের অবিচল আস্থা ও কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল এবং সময় সুযোগ পেলে শঙ্খদার রবিবারের আড্ডায় গিয়ে বসতেন, তাঁর সেই প্রত্যাশায় সকৌতুক মুখখানা যেন এখনও চোখে ভাসে। আমি দূরে থাকি বলে শঙ্খদার কাছে ইচ্ছে হলেও যেতে পারি না। এ দুঃখ যাবার নয় কিন্তু যাঁরা যেতে পারেন সেই সব ভাগ্যবানদের কাছ থেকে আড্ডার সংবাদ-কণিকা সংগ্রহ করা আমার স্বভাব। মাস পাঁচেক আগে কি তারও

ক'মাস আগে, এখন মনে পড়ে না, তাঁকে জিগ্যেস করলাম, 'সমীরবাবু, শঙ্খদার বাড়িতে যাচ্ছেন তো?'

ম্লান মুখে অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, 'না। আর যেতে পারি না। তিন তলায় উঠতে হাঁফ লাগে বড্ড। জানেন তো, আমার ফুসফুসে কষ্ট।'

সে কষ্ট একটা প্রাণঘাতী আকার নেবে বুঝতে পারিনি। তবে সেদিন তাঁর খেদোক্তি থেকে যে বেদনাতুর আর্তি বেজে উঠেছিল তা এখনও কানে বাজে। তাঁর স্মরণসভায় খানিকটা পেছনের চেয়ারে শঙ্খদাকে দেখে মনে হল উনি কী ভাবছেন? জীবিকা জীবনের পাংশু প্রহার পেরিয়ে সমীর কত উজ্জীবিত প্রেরণায় খুঁজে ফিরতেন নতুন নতুন তথ্যের উৎস। শঙ্খদা তাঁর উৎসাহ দেখে নির্দেশ দিতেন আরও জটিল কিছু তথ্যের সংকেত। সমীরের মৃত্যুতে এই সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। নতুন প্রজন্মের মধ্যে আর কার মধ্যে তিনি পাবেন এমন উদ্‌গ্রীব সত্যসন্ধানী? এত পরিশ্রমী কর্মী?

তাঁর নানা বিষয়ে সন্ধিৎসা আর তথ্য সন্ধানের শ্রমী আয়োজন কতটা বিস্তৃত ছিল তা তো সকলেই জানেন। *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন* বইটি যখন তৈরি করছেন তখন চলে এলেন আমাদের বাড়ি কৃষ্ণনগরে। রবীন্দ্রনাথের বড়দির বিয়ে হয়েছিল আমাদের বাস্তগ্রাম দিগনগরের গাঙ্গুলি পরিবারের সারদাপ্রসাদের সঙ্গে। তাঁর সম্পর্কে আমার জানা সব লিখিত তথ্য তাঁকে দিতে খুব বেশি হলেন। এর প্রতিদান মিলল ২০১০ সালে যখন তিনি *রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশিরা* বইটি লিখছেন। তাঁর কাছে চাইলাম আর্নল্ড বাকে সম্পর্কে তাঁর সংগৃহীত সব তথ্য। সানন্দে ও খুব দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সঞ্চয় থেকে যাবতীয় খবর। এ থেকে সবাই বুঝবেন 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া'র রবীন্দ্রতত্ত্ব তাঁর কাছে কতটা সজীব ছিল।

এ বারে তাঁর গুণগ্রাহী স্বভাবের কিছু অভিজ্ঞতা যা আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয় তার কথা বলব। ১৯৯৬ সাল থেকে আমি বার করছিলাম *ধ্রুবপদ* নামের এক বার্ষিক সংকলন। একেক বছর একেক বিষয়ে তৈরি হয়ে বেরত সুমুদ্রিত সেই গ্রন্থ। যাতে বারো বছর ধরে প্রচুর নতুন গদ্যলেখকদের খুঁজে পেতে লেখাতাম। ২০০৭ সালে 'ধ্রুবপদ'-র একাদশ সংকলনের বিষয় ছিল 'অন্য রকম বাঙালি'। ২০০৬ সালে সেবার কদিন ছিলাম গোলপার্কের রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটের অতিথি নিবাসে। একদিন সমীরবাবুকে বললাম ফোনে, 'একবার আসতে পারবেন? একটা কঠিন লেখার দায়িত্ব দেব।' নির্দিষ্ট সময়েই এলেন। বললেন, 'কঠিন কাজটা কী জাতীয়?' আমি বললাম, 'এই মুহূর্তে আমাদের চারপাশে যে কজন অন্যরকম বাঙালি আছেন তাঁদের নিয়ে একটা সংখ্যা করতে চাই। নিশ্চয়ই মানবেন যে, শঙ্খ ঘোষ তেমনই এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। এও জানেন যে তাঁর বিষয়ে

কোনও সাহিত্য পুরস্কারে তো তাঁকে কেউ সম্মনিত করিনি আমরা। শঙ্খ ঘোষের মূল্য নির্ধারণ করে লিখেছিলেন : 'গর্ব কত দূর দন্তহীন হতে পারে' তার পাঠ নিয়েছিলেন তাঁর কাছে। একথা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি। একজীবনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত গুরুত্বপূর্ণ আর সংরক্ষণযোগ্য কাজ তাঁর মতো কজন করতে পেরেছেন?

তাঁর জীবন সম্পর্কে খবর পাওয়া, অন্তত তাঁর কাছ থেকে, কতটা কঠিন। আপনাকে সে কাজ করতে হবে এই জন্যে যে শঙ্খদাকে অনেকটা কাছ থেকে অনেকদিন থেকে দেখছেন, জানেনও অনেক খবর। তাঁর পরিবারের সবাইকে জানেন। তা ছাড়া শঙ্খদা আপনাকে স্নেহ করেন। দেখে দেন সব লেখা, অনুমোদন করেন ভবিষ্যতের পরিকল্পনার স্বপ্ন। দরকারে বানিয়ে দেন কাজের ছক। আপনি ছাড়া এ কাজ আর কে করবে?'

আমার বেশ মনে আছে সেই অপরূপ রৌদ্রমাখা শীতের মায়াময় দুপুরে পথে দাঁড়িয়ে সমীর বললেন, 'বিষয় যখন শঙ্খদা আর অনুরোধ করছেন আপনি— এর তো কোনও অন্যথা হতেই পারে না। কিন্তু আপনি কি অন্য আরেকজন বাঙালির কথা ভাববেন? কথা দিচ্ছি তাঁকে নিয়েও আমি লেখার দায়িত্ব নেব। বলুন, রাজি হবেন?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই রাজি হব, আপনি যখন বলছেন। কে তিনি?'

—ভূমেন্দ্র গুহ। যেমন বড় মাপের সহৃদয় সফল ডাক্তার তেমনই বড় মাপের জীবনানন্দ গবেষক, জানেন তো? তাঁর কথা আমাদের জানা উচিত, জানানো উচিত।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, রাজি হয়ে ভাবলাম যেন এক দেবদূত দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। কিংবা মনে হল যেন সমীর সেনগুপ্ত এক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি, তাঁর কাজ যে কোনও প্রতিভাবান মানুষের সামূহিক জীবনপরিচয় উদ্‌ঘাটন করা। শুধু কি মানুষ? নিজেই লিখেছেন : 'আমাদের চারপাশে যেসব কুকুর বেড়াল পায়রা টুনটুনি গিরগিটিরা বাস করে, যেসব কেঁচো আরশোলা গুবরে পোকারা টুকটুক করে ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা লিখতে ইচ্ছে করে— ছোটো ছোটো ভালোবাসার গল্প সেসব।'

তাঁর এ ইচ্ছাপূরণ হয়নি। হলে একটা অনবদ্য কাজ পেতাম। কিন্তু যা পেয়েছি তারই বা সমঝদার কজন? কোনও সাহিত্য পুরস্কারে তো তাঁকে কেউ সম্মনিত করিনি আমরা। শঙ্খ ঘোষের মূল্য নির্ধারণ করে লিখেছিলেন : 'গর্ব কত দূর দন্তহীন হতে পারে' তার পাঠ নিয়েছিলেন তাঁর কাছে। একথা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি। একজীবনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত গুরুত্বপূর্ণ আর সংরক্ষণযোগ্য কাজ তাঁর মতো কজন করতে পেরেছেন?

আজ এই মরণসাগর পারের অমর মানুষটার বিজীগিষা বা জানবার ইচ্ছা এবং জিজীবিষা বা বাঁচার মতো বাঁচার ইচ্ছাকে কুর্নিশ করে ভাবি, মানুষের সবচেয়ে বেদনা হল অচরিতার্থতা। কত কি করেছেন, কত কিই করছিলেন, আরও কত করবেন ভাবছিলেন এমন সময়ে গোপনে এসে গেল মৃত্যুরথ। *ধ্রুবপদ* ২০০৮ সালে তার দ্বাদশ ও অন্তিম সংকলনে *গবেষণার অন্তরমহল* শিরোনামে প্রকাশ করেছিল এখনকার বারো জন সক্রিয় বাঙালি গবেষকের আত্মকথন। তার মধ্যে আমি সমীরকে বলেছিলাম তাঁর গবেষণাগত আত্মপরিচয়টুকু লিখে দিতে। সানন্দে লিখে দিলেন। তার শেষ অনুচ্ছেদ এইরকম :

> দুরূহের প্রতি আকর্ষণও চলে যায়নি, বরং বেড়েছে। মনের মধ্যে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা ফাঁদি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যে পাখিকে ধরবার চেষ্টা আরম্ভ করা উচিত ছিল তার ডবল বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে তার জন্যে যত্ন করে জাল বিছাই। পাওয়া নাই বা গেল চাহিতে দোষ কী? আর কিছু না হোক, নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচা তো যাবে? বার্টান্ড রাসেল নাকি ছিয়াশি বছর বয়সে চীনে ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বইপত্র সংগ্রহ করি, নোট নিই, কাজও আরম্ভ করে দিই, শেষে কী হবে, করে উঠতে পারব কিনা, আমার আয়ুতে ক্ষমতায় বিদ্যের কুলোবে কিনা এসব না ভেবেই রাত জাগতে আরম্ভ করে দিই। মনে মনে জপ করি সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই।

এই হল তাঁর মনের নির্যাস। একজন সৎ মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বরলিপি। কিন্তু জীবন বড়ো প্রতারক। সোনার হরিণের মতো সে নিজের সত্য মুখ কাউকে কাউকে দেখিয়ে, চকিত ত্বরিত আলোকে, তাকে আহ্বান করে নিয়ে যায়, অপ্রত্যাবর্তনীয় অজানা মায়ালোকে। 'যারে যায় না পাওয়া তারই হাওয়া' সমীর সেনগুপ্তকে একটা স্বপ্নিত কাজের বৃত্তে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যু বড়ো পরাক্রান্ত প্রবঞ্চক।

সমীর, স্বজনেষু

দময়ন্তী বসু সিং

১৯৫৬। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তখন সদ্যোজাত। খাস কলকাতা শহরের বুকে প্রায় নিঃশব্দে অকস্মাৎ একটি এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সবচেয়ে মর্মাহত ভারতবর্ষের শিক্ষা জগতের প্রাচীনতম মহীরূহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়াই যে এ রকম একটি নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় এই শহরে জন্ম নিতে পারে এই দুঃসাহস বাংলার শিক্ষা জগতের হোমড়াচোমড়ার দল সহজে মেনে নিতে পারেননি। কোনও মন্ত্রী এসে প্রস্তর স্থাপন করলেন না, কোনও কাগজে কোনও চর্চা হলো না, একটি ভবন পর্যন্ত তৈরি হলো না— ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল।

কোনও এক গ্রীষ্মের সকালে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম হলো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়! প্রবর্তিত হলো তিন বছরের অনার্স কোর্স কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে। তখনো যেহেতু এগারো ক্লাসের হায়ার সেকন্ডারি শুরু হয়নি, প্রথমেই চালু হলো এক বছরের ব্রীজ কোর্স, প্রেপারিটারি আর্টস এবং সায়েন্স, মাত্রই গুটিকয় স্কুল ফাইনাল পাশ করে আসা ছাত্রছাত্রী নিয়ে। আমি সেই গুটিকয়ের একজন, যাদবপুর 'বিশ্ববিদ্যালয়'-এর প্রথম ছাত্র, রোল নম্বর ওয়ান!

চোখের সামনে দেখলাম কলেজের বাড়ি উঠতে। এম.এ. ক্লাস শুরু হতেই সেই বাড়ি কলরবে ভরে যেতে, আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নতুন এক ক্যাম্পাস- বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান। সেই সঙ্গে নতুন বিভাগ তুলনামূলক সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হতেও সময় লাগেনি। আমি সেই বিভাগে পড়ি, এম.এ. ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে প্রথম থেকেই সহপাঠী-সুলভ বন্ধুতা। সিনিয়র-জুনিয়র ব্যাপারটা এই বিভাগে একেবারে ছিল না, যেমন ছিল না মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে ছাত্রদের কোনও দূরত্ব। এক পরিবারের মতো গোষ্ঠীবদ্ধ ছিলাম আমরা সকলে।

ততদিনে কলেজে আমার দু'বছর কেটে গেছে, বি.এ. ক্লাসের দ্বিতীয় বর্ষ, সন ১৯৫৮-র এম.এ. ক্লাসে যারা এলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সমীর সেনগুপ্ত—যার কমনীয় চেহারা, মধুর হাসি, ভারি কাচের চশমার মধ্যে ঝকঝকে উজ্জ্বল দৃষ্টি লক্ষ না করে উপায় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেকেরই সখ্য অন্তরঙ্গ ছিল, তার কারণ এরা বাবার কাছে কবিতাভবনে আসতেন। তারপর তো পরিবারের অংশ হতে কারোরই বেশি সময় লাগেনি। মা সকলের মাসিমা, বাবা বু.ব., আর কবিতাভবনের আড্ডার আকর্ষণে সে বাড়িতে জমাটি হতে সকলেই উৎসুক। সমীরদের ব্যাচের নায়িকা ছিল ঝর্না বসু, সে হয়ে গেল নবনীতার বিকল্প (নবনীতা তখন আমেরিকায়), আমাদের বাড়ির মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে সমীরের আসা-যাওয়া ছিল সবচেয়ে বেশি। আমি জানতাম না, পরে সমীরের কাছে গল্প শুনেছি, তার বাড়ি থেকে কলেজের মাইনে দেবার জন্যে যে টাকা আসত সব সে অন্যত্র খরচ করে ফেলায় এম.এ. পরীক্ষায় বসা আটকে গিয়েছিল। বাবার কাছে খবর এল আপিশ থেকে, বাবা বাড়িতে ডেকে পাঠালেন ছাত্রকে। ঘটনা শুনে হালকা বকুনি নিশ্চয় দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রধান চিন্তা হল, তিনি কোত্থেকে টাকাটা জোগাড় করবেন এখন! বললেন, মুশকিলে ফেললে, এতগুলো টাকা এখন পাই কোথায়? আচ্ছা, কাল এসো, দেখছি কী করা যায়। তারপর কোথাও কোনও লেখা বাবদ প্রাপ্য টাকা জোগাড় করে এনে পর দিন সমীরকে দিয়ে নাকি বলেছিলেন, তোমার কপালে পাওয়া গেল টাকাটা, এক্ষুণি জমা দিয়ে এসো, নয়তো আবার খরচ করে ফেলবে। আমরা, তাঁর ছেলেমেয়েরা, এমন কাজ করলে বাবার উষ্মা কোথায় পৌঁছত জানি না, কিন্তু ছাত্রদের জন্যে প্রাণপাত করতেন তিনি, তাদের জন্য ঢালাও আহ্লাদ বরাদ্দ।

কলেজ জীবন শেষ হবার পর সমীর ঢুকে পড়ল চাকরিতে, আমি তার দু'বছর বাদে কলেজ শেষ করে চলে গেলাম আমেরিকায়। আমাদের সমান্তরাল জীবনে আবার আগের বন্ধুতায় ফেরার প্রশ্নই উঠত না যদি না নেহাৎ ভাগ্যচক্রে আবার কলকাতায় ফিরে আসতাম আমি ১৯৯৬ সালে। ইতিমধ্যে ৩৫ বছর কেটে গেছে, আমাদের সম্পর্কের সেতু বুদ্ধদেব বসু প্রয়াত, অকালমৃত্যু হয়েছে আমার ভাই পাপ্পার, আমার দিদি মিমি ও তার স্বামী জ্যোতি অপ্রত্যাশিতভাবে চলে গেছে আমেরিকায়; মা আছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ তাঁর জীবনীশক্তির জোরে, শরীর বিকল ১৯৭২ থেকেই। মনে আছে, সমীরকে দেখেছিলাম আমাদের শোকের শরিক হতে, কথা হয়তো হয়েছিল, হয়তো হয়নি— এখন আর মনে নেই।

বাবা যতদিন ছিলেন, সমীর সংযোগে ছিল জানি, মা'র করানো নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে চন্দ্রকেতুর পার্ট করেছিল, পাপ্পার সঙ্গে বন্ধুতা ছিল— আমি বিক্ষিপ্তভাবে কলকাতায় আসা-যাওয়া করি, কারো সঙ্গেই পুরনো সম্পর্ক পুনর্জীবিত করার সময়-সুযোগ হয় না। তবে জানতাম গান, নাটক, আবৃত্তি, লেখা— এ সব বিষয়ে সমীরের আগ্রহ ও পারঙ্গমতার কথা। কিন্তু সত্যি যে সমীরের গুণের পরিধি কতটা সেটা জেনেছিলাম শুধুমাত্র কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে। সত্যি বলতে সমীরের সঙ্গে আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত বন্ধুতার সূত্রপাত সেই সময় থেকেই, যদিও এই নতুন সম্পর্কের হেতুও বাবাই।

কলকাতায় ফিরে অবধি লক্ষ করেছিলাম বাজারে কোথাও বুদ্ধদেব বসুর বই পাওয়া যায় না। আমাকে পেয়ে বহু ব্যক্তি এ বিষয়ে অভিযোগও করছিলেন। তখন সবে কলকাতা এসে সল্টলেকে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে আছি, এক ভদ্রলোক কীভাবে আমার ঠিকানা জোগাড় করে বাড়িতে এলেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে। —ওঁর বিরুদ্ধে কি কোনও চক্রান্ত চলছে? কোথাও বুদ্ধদেব বসুর বই কিনতে পাই না। দোকানে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বই চাইলে বলে, ভুল করছেন বুদ্ধদেব গুহ! —হাতে ধরা বইমেলা সংখ্যা 'দেশ' দেখিয়ে বললেন— বইমেলা সংখ্যার বিজ্ঞাপন তন্নতন্ন করে খুঁজে ওঁর একটি বইয়েরও নাম দেখলাম না। অথচ আমি যে তিনটি মাত্র বই সঙ্গে নিয়ে বহু বছর আগে বিলেতে চলে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে দুটিই ছিল ওঁর বই— বুদ্ধদেব বসুর *আধুনিক বাংলা কবিতা* আর *মহাভারতের কথা*। এবার এসে মনে হচ্ছে কেউ যেন সচেতন পরিকল্পনায় সাধারণ পাঠকের গোচরের বাইরে সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে, সকলের মন থেকে মুছে দেবার চেষ্টা এটা। আপনি কিছু করুন।

২

সেই 'কিছু করা'র প্রয়াস থেকেই সমীরের সঙ্গে পুনর্সংযোগ। কলকাতায় আমার তখন 'নবাগত' অবস্থান, হাতে গোনা কয়েকটি মানুষকে চিনি, আমাকে চেনেন তার চেয়েও কমসংখ্যক মানুষ। কিন্তু সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের আবেগ এবং বেদনা আমাকে সাহস জুগিয়েছিল। সেই ঘটনার ছ'মাসের মধ্যেই নিজের প্রকাশনা 'বিকল্প' শুরু করতে। প্রথম বই প্রতিভা বসুর *মহাভারতের মহারণ্যে*র সাফল্য এক ধাক্কায় আমার প্রকাশনাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূল কথা, নিজের একটা জায়গা তৈরি হলো। পায়ের তলায় এক টুকরো নিজস্ব জমি চাই 'কিছু' করতে হলে।

স্থির করলাম ১৯৯৮-এ বাবার ৯০ বছরের জন্মদিনে করবো খুব বড় করে, বেশ কয়েকদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান করা হবে, বাবার নাটক হবে, তাঁর জীবন ও সাধিত কর্মের ওপরে প্রদর্শনী হবে, এবং সেই উপলক্ষে বুদ্ধদেব বসুর একটা জীবনী প্রকাশ করবো। 'বিকল্প' থেকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সন্দেহ নেই। ভাবলাম কেনই বা পারবো না? এখানে বু.ব.র ভক্ত, শিষ্য, ছাত্রের সংখ্যাও তো কম নেই, তারা আমার সঙ্গে থাকলে নিশ্চয় সুচারুভাবেই সব করা যাবে।

প্রথমেই স্থির করলাম বাবারই কোনও সুযোগ্য ছাত্রকে দিয়ে তাঁর জীবনী লেখাবো। আনন্দবাজার পত্রিকার আপিশে গেলাম দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করতে। সে-ও বাবার ছাত্র, এবং লেখক হিসেবে ততদিনে প্রতিষ্ঠিত। আমার পরিকল্পনা শুনে সে-ই বলেছিল সমীর এই কাজের জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। এই সাধু পরামর্শ দেবার জন্যে দিব্যেন্দুর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সত্যিই, সমীর ছাড়া বুদ্ধদেব বসুর *জীবন*-এর মতো এমন একটি সুখপাঠ্য ব্যতিক্রমী জীবনী অন্য কেউ লিখতে পারতেন না। লেখার কথা ছিল একটি ক্ষুদ্র বই, বু.ব.র প্রতি তার গভীর ভালোবাসায় সেটি পরিণত হল একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থে, ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্যে যা অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে, বাংলা আকাডেমি বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সমীরের এই বই-এর অনেক পরে।

সেই আমার প্রথম সমীরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা, প্রধান সহযোগী-সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে পাওয়া।

বাবার ৯০ বছরের জন্মদিন আশাতীতভাবে সফল হয়েছিল, সবচেয়ে আকর্ষক ছিল প্রদর্শনীটি। সেখানে প্রতিটি ছবির নিচে সমীর নিজের সুচারু হস্তাক্ষরে লিখেছিল বু.ব.র রচনা থেকে অসাধারণ সব উদ্ধৃতি। যে কাজই সে করতো, তাতেই থাকতো যত্ন আর নৈপুণ্যের ছাপ। দীর্ঘ পনেরো দিনের উদ্‌যাপনের প্রতি কাজে সমীরকে পাশে পেয়েছি। যখন সে *বুদ্ধদেব বসুর জীবন* লিখেছিল মাত্র চার মাসে, আমার মনে হয়েছিল তার 'মাস্টারমশাই' কোনও মন্ত্রবলে যেন সমীরকে তাঁর নিজের শ্রম করার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।

তারপর থেকে আমার সব কাজেই সমীর থেকেছে। প্রকাশনায় তার উৎসাহ আমার চেয়ে কম ছিল না। কখনও প্রচ্ছদ ডিজাইন করে দিয়ে, কখনও নামাঙ্কনের দায়িত্ব নিয়ে, অথবা প্রুফ দেখে— আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে সে। তাছাড়া সমীর সল্টলেকে থাকায় সব চেয়ে বেশি মনের কথার বিনিময় তার সঙ্গেই হতো। এমন নয় যে সমীরের সঙ্গে আমার তর্ক বা মতবিরোধ হয়নি কখনও, কিন্তু সে কেমন বন্ধুতা যার মধ্যে তর্কের, মতবিরোধের অবকাশ নেই? সমীরের সঙ্গে আমার বন্ধুতায় আত্মীয়তার আস্বাদ লেগেছিল। তবে তার জন্যে একটি মায়াবী মেয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো জরুরি। মায়া। সমীরের নির্বন্ধ।

ক্রমে ক্রমে সে তো আরও কত শ্রমসাধ্য কাজই করে উঠল। একের পর এক বই বেরলো তার, লক্ষ লক্ষ শব্দ, হাজার হাজার পাতা, গভীর গবেষণা, অজস্র নাম, উদ্ধৃতি— সব সে নীরবে ঘরে বসে নিজের কম্প্যুটারে লিখত। বিশ্বাস করা যায় না জীবনের শেষ পর্বে এসে এত অজস্র কাজ সে কখন করে উঠল? এমন নিরলস গবেষক সে কখন হয়ে উঠল? কোন প্রেরণায় সে অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছিল? তাহলে কি তার মাস্টারমশাই-এর মতোই অকস্মাৎ লিখতে লিখতেই চলে যেতে চেয়েছিল সে?

আমি সচেতন, সমীরের বিষয়ে লিখতে গিয়ে বারবার তার প্রিয় 'মাস্টারমশাই'-এর প্রসঙ্গ এসেছে। কিছু করার নেই। অলক্ষ্যে থেকে তিনিই যে আমাদের জুড়ে রেখেছেন। বুদ্ধদেব বসু— বাংলা সাহিত্যের প্রতি ধারায় যাঁর নিজস্ব অবদান বিশাল, রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের যিনি প্রধান সংগঠক-প্রচারক, বিশ্বসাহিত্যের প্রবক্তা, এই দেশে তুলনামূলক সাহিত্যের ধারণার প্রবর্তক— এই বাঙালি সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদের কাছে আমরা ছাত্ররা যে কী পেয়েছিলাম তা শুধু আমরাই জানি। পশ্চিমবাংলা যে পরিকল্পিতভাবে তাঁর প্রাপ্য দেয়নি এ বেদনা, সঞ্চিত অভিমান, আমার সঙ্গে অনেকেই ভাগ করে নিয়েছেন, আমার তাঁর জন্যে 'কিছু করা'র চেষ্টায় অনেককেই সঙ্গে পেয়েছি, কিন্তু বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সমীর যেন আমার হৃদয় ছুঁয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু যেমন আমার কাছে ছিলেন পিতার চেয়ে বেশি কিছু, আমার শিক্ষক, তেমনি সমীরের কাছে বু.ব. ছিলেন শিক্ষকের চেয়ে বেশি কিছু, তার পিতৃতুল্য দীক্ষাগুরু।

হয়তো তাই তার হাজার পাতার অতি মূল্যবান শেষ বইটি সে তার মাস্টারমশাইকেই নিবেদন করে গেল।

শক্তি ও মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমীর ও মায়া সেনগুপ্ত। ১৯৬৮ সালে হেসাডি বাংলোয়।

সমীর সেনগুপ্তর জীবননামা

অনিল আচার্য

সমীর সেনগুপ্ত বিগত শতকের ত্রিশের দশকে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই ত্রিশের দশক স্বাধীনতা থেকে এবং ঔপনিবেশিক বাংলায় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১.৭ ফার্লং দূরে মায় বার্মা পর্যন্ত ভৌগোলিক ক্ষেত্রে সমীর সেনগুপ্ত বিরাজমান। সমীর সেনগুপ্ত একজন আপাতনিরীহ মাপাহাসি চাপাকান্না বিশিষ্ট ভদ্রলোক, যাঁকে দেখলে বোঝা যাবে না তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্কেরে প্রথম দিকের ছাত্র এবং বুদ্ধদেব বসুর সৌজন্যে পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত।

এমত ভদ্রলোক শ্রী সমীর সেনগুপ্ত মহাশয় খ্যাতিমান কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একান্ত আপন বন্ধু অথচ প্রাবন্ধিক, সুরাসক্ত অথচ নির্বিকার এবং নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে বেশ পণ্ডিত-ই বলা যায়। এহেন ব্যক্তি বেলুড়ের বিদ্যামন্দিরের ছাত্র এবং বলা বাহুল্য, স্বীয় গ্রন্থে স্বীকৃত যে বেশ ভালোভাবেই তাঁর বেলুড় বিদ্যামন্দিরপ্রাপ্ত ধর্মশিক্ষা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছিল, কেননা তিনি বারংবার বারদুয়ারি গমন করেছিলেন এবং নানাপ্রকার 'অসাধু' সঙ্গের অভিজ্ঞতার বর্ণনা তাঁর আত্মজীবনীমূলক একটিমাত্র রচনায় পাওয়া যেতে পারে।

শ্রী সমীর সেনগুপ্ত মহাশয় নিয়মিত কবিসঙ্গ করলেও, নিজে কতটা কবি ছিলেন, বা কবিতা আদৌ লিখেছেন কিনা জানা যায় না। তবে কবিদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং কৃত্তিবাসী কবিরূপ 'কুসঙ্গে' তাঁর আসক্তি প্রায় সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথ মদ্যপান করতেন, এবং চান্স পেলে যে ভালোই মদ্যপান করতেন, একথা তিনি উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করেই ছেড়েছেন। শ্রী সমীর সেনগুপ্ত তাঁর *অমল, আমার সময়?* শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনায় শিয়ালদ' সাউথ স্টেশনের শেষ ক্যানিং লোকালে কৃত্তিবাসের কবিদের সঙ্গে অবিরত মদ্যপানযোগে নৈশভ্রমণের যে কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা একবার উল্লেখ করা যাক :

> সন্ধেবেলা কফিহাউসে ঢুকেই একটা অন্যরকম কিছু অনুভব করলাম। চাপা একটা ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া যেন। কৃত্তিবাসের টেবিলে গিয়ে বসে দেখি সবাই যেন একটু অতিরিক্ত গম্ভীর, চুপচাপ। একটু পরে টাইপরা শরৎ মুখ নামিয়ে নিচুগলায় প্রশ্ন করে, 'আজ একটু ক্যানিঙের দিকে যাবার মতলব— আছেন নাকি?'
>
> —খরচা কেমন?
>
> —দশটাকা করে ধরা হয়েছে।
>
> —আমার কাছে গুটিকয়েক আছে।
>
> —ওতেই হয়ে যাবে। দিয়ে দিন।
>
> সবাই জানত, বাকিটা বড়ো চাকুরে শরৎ পুরিয়ে দেবে। সেই ফাঁক দিয়ে অবাঞ্ছিত লোক জুটে না পড়ে, তাই ফিশফিশে কাজ সারতে হয়।
>
> কফিহাউস বন্ধ হবার পর বেরোনো গেল। দশবারোজন যুবক, তার মধ্যে শক্তি আর বেলাল। সুনীল বোধহয় তখন বিদেশে। সম্পাদক শরৎই দলনেতা, সে ততক্ষণে টাইটা খুলে পকেটে রেখেছে, তা ছাড়া ওর প্যান্টের ক্রিজ ও জুতোর পালিশ অনিন্দ্য।
>
> প্রথমেই বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে মাটির কলসি কেনা হল একটা। সেটার অর্ধেকমতো দিশি মদ দিয়ে ভর্তি করা হল, বাকিটা জল। মাটির ভাঁড় নিয়ে নেয়া হল এক ঠোঙা। তখনো পলিথিন আসেনি।
>
> শেষ ক্যানিং লোকাল শেয়ালদা সাউথ থেকে ছাড়ত রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। তখনও কয়লায় চলা ট্রেন। ছোটো একটা কামরা দেখে সবাই মিলে উঠে পড়ে ভেতর থেকে দরজা লক করে দেয়া হল। কলিসটা বেলালের কাছে— বেলালই বারটেন্ডার। ট্রেনের মেঝেয় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে, কোলের কাছে কলসিটা নিয়ে সবাইকে পরিবেশন করতে আরম্ভ করল শেয়ালদা ছাড়ার পর থেকে। একটু পরেই শক্তি সমস্ত কাপড়জামা খুলে ফেলল। সম্পূর্ণ নাঙ্গা হয়ে বজ্রাসনে বসে অসম্ভব সুরেলা উদাত্ত ভারি গলায় গান ধরল— 'নাথ হে, প্রেমপথে, সব বাধা ভাঙিয়া দাও...' কালো কুচকুচে চাপদাড়ি'তে মুখের নিচের দিকটা ঢাকা, চোখে চশমা, তা ছাড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ, একের পর এক ভারি ভারি ব্রহ্মসংগীত গেয়ে চলল শক্তি। 'কার মিলন চাও বিরহী'...
>
> বৈঠকখানা বাজারে কলসি ভরবার সময়ই সবাই বেশ খানিকটা করে চড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর ট্রেনে ওঠবার পর থেকে দরাজভাবে চলছে বেলালের পরিবেশনায়। ঘণ্টা দেড়েক পর থেকে এক এক করে শুয়ে পড়তে লাগল অনেকে। রাত দেড়টা নাগাদ ট্রেন যখন ক্যানিং গিয়ে পৌঁছল, জনা পাঁচ-ছয়ের বেশি ট্রেন থেকে নামতেই পারল না। আমরা যারা তখনও সক্ষম ছিলাম নেমে পড়লাম। ওদের জন্যে চিন্তা নেই— ভোরবেলায় এই ট্রেনখানাই কলকাতায় ফিরে যাবে...
>
> রাত দুটোর সময় আমরা গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন দুপুরবেলাকার ডালহৌসিপাড়ার মতো গমগম করছে ক্যানিং বাজার। নেমে, প্রথম কাজই হল মদ জোগাড় করা— কলসিটা ট্রেনেই ফুরিয়ে গেছে, সেটা নিয়ে আর ভার বাড়ানো হয়নি। কোথায় কী পাওয়া যায়, কয়েকবার গিয়ে গিয়ে সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছিল। ওখানে আর দিশি নয়, চুল্লু। দিশি আর চুল্লুর তফাত সকলেই জানেন আশা করি। দিশি যত খারাপই হোক লাইসেন্স প্রাপ্ত, আর চুল্লু হল লুকিয়েচুরিয়ে চোলাই করা। শস্তায় বানানো এবং তাড়াতাড়িতে সারবার জন্য নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ তাতে মেশানো হয়, নিশাদল ইত্যাদি তার কোনও কোনোটা বেশ বিষাক্ত দ্রব্য, বেশি পরিমাণে পেটে গেলে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়, অন্ধটন্ধ তো অনেকেই হয়ে যায়। স্বাদের কোনও প্রশ্নই নেই, কত দ্রুত এবং কত শস্তায় কী পরিমাণ নেশা হতে পারে তাই একমাত্র বিবেচ্য,

জ্বলতে জ্বলতে গলা দিয়ে নামে। এসব জায়গায় নির্ভর করতে হয় প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার গুডউইলের ওপর। ক্যানিঙের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঠেকটি খুঁজে বের করেছিল সম্ভবত বেলাল, এসব কাজে ওর একটা অস্বাভাবিক কুশলতা ছিল, প্রায় অলৌকিক। ঠিক ক্যানিং থানার সামনে, রাস্তার উলটো দিকে। বাইরে একটি সাইকেল সারানোর দোকান, ভেতরে ঝাঁপ ফেলে মাদুরে শুয়ে থাকেন নধরকান্তি একটা প্রৌঢ়া মহিলা, শাড়ির ভেতর দিয়ে তাঁর সারা অঙ্গে সাইকেলের টিউব জড়ানো, টিউবের ভিতরে তীব্র ধান্যেশ্বরী। টিউবের মুখটি তাঁর বিশাল বক্ষোদেশের ঠিক মাঝখানে। ঝাঁপের বাইরে একটি তেরো চোদ্দ বছরের ছেলে ঘুমোয়, খদ্দের এসে তাকেই ডেকে তোলে। খদ্দেরের প্রয়োজন জেনে নিয়ে সে চটের পর্দা তুলে ঘুমজড়ানো গলায় ডাকে, 'মাসি, ও মাসি—তিন গেলাশ—'

মাসিও ঘুমচোখেই একটু কাত হয়ে, বাঁ হাতে গেলাশটি বুকের কাছে নিয়ে, ডান হাতে টিউবের মুখটি ধরে একটু টিপ দেন—চ্ছিররররর শব্দ করে গেলাশ ভরে ওঠে। দৃশ্যটি দেখলে স্তন্যদায়িনী মাতৃমূর্তি মনে না এসে পারে না। মাল ও দামের আদানপ্রদান হয় বালকটির হাত দিয়ে। ফুটপাতের চায়ের দোকানের গেলাশ যেমন হয় সেই সাইজের গেলাশ—এক গেলাশের দাম চার আনা। ক্যানিঙেই অন্য সর্বত্র চোদ্দ পয়সা গেলাশ, কিন্তু মাসির দোকানের মালের খুব নাম, তাছাড়া 'পুলুশের হাংনামা মোটে লেইকো'— তাই দামটা সামান্য একটু বেশি।

(ক্রোড়পত্র : ২ অমল, আমার সময়? ব্যক্তিগত : পাঁচের দশক অনুষ্টুপ, শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৫)

তারপর সমীর সেনগুপ্তের দারোগার রোল আর চোরের বাড়িতে বিশ্রামের কাহিনিটি যাকে বলে হিলারিয়াস। প্রথমে দীপক মজুমদার ও পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অসাধারণ ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হবার অন্যতম কারণ বলে আমার যা মনে হয় সেটা হল সমীর সেনগুপ্তের মধ্যের ওয়ার্কম্যানশিপ। দীপক ও শক্তি শিল্পী বলেই তাঁদের প্রতি এই সাহিত্যের শ্রমিকের এত তীব্র আকর্ষণ। শক্তি, বুদ্ধদেবসহ অন্যান্যরা তাঁদের মহতী সৃষ্টির জন্য সমীর সেনগুপ্তের আগ্রহের বিষয়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য হয়তো। তাঁর লেখা সম্পাদনায় বা তাঁদের বিষয়ে লেখা প্রবন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা কোথাও কোথাও থাকতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ শিল্পে সমীর সেনগুপ্ত কেমন

প্রবন্ধ শিল্পে সমীর সেনগুপ্ত কেমন যেন অবলীলাক্রমে বাবুই পাখির মতো বাসা বানাতে পারেন, তাঁদের কবিতার অরণ্য থেকে সবুজ হলুদ পাতা চিরে চিরে। সে বিষয়ে কোনও ক্লান্তি নেই। প্রবল অনুভবঋদ্ধ এবং অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রচনা কারও কারও পছন্দ নাও হতে পারে।

যেন অবলীলাক্রমে বাবুই পাখির মতো বাসা বানাতে পারেন, তাঁদের কবিতার অরণ্য থেকে সবুজ হলুদ পাতা চিরে চিরে। সে বিষয়ে কোনও ক্লান্তি নেই। প্রবল অনুভবঋদ্ধ এবং অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রচনা কারো কারো পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু শক্তির সমগ্র কবিতা ও বুদ্ধদেবের সংগ্রহ নিয়ে তাঁর সে থ্যাংকলেস কাজ, তার কোনও তুলনা নেই। শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক তাঁর সমস্ত গবেষণার কথা ভাবলে বন্ধু হিসেবে গর্ব হয় বৈ কি!

কৃত্তিবাসী মানসিকতা তেমন করে কোনোদিন বোধহয় পেয়ে বসেনি সমীর সেনগুপ্তকে। কারণ সেই অবলোকনপ্রিয়তা। তিনি দেখতে ভালোবাসতেন, নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসতেন। এ-যেন এক বাবুই গাছে গাছে ঘুরছে দেখছে কোনও পাতা বা কোনও জোনাকি দিয়ে বাসা বানানো যায়। কৃত্তিবাসের কবিদের নিয়ে অনেক গল্প, অনেক রোম্যান্টিকতা। অ্যালেন গিনস্‌বার্গ, এল্ এস্ ডি, ধেনো, চুল্লু এবং বারদুয়ারির সঙ্গে কমল কুমার আর ডি. কে সব মিলেমিশে এক অদ্ভুত ককটেল। তাকে ডিফাইন করা কি সহজ?

তবু সমীর সেনগুপ্ত প্রয়াস করেননি তা নয়। একটু তাঁর কথাতেই দেখে দিই না!

> গীন্সবার্গ কলকাতায় আসে ১৯৬১ সালের শেষ দিকে, কলকাতা ছেড়ে চলে যায় ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে। তার সঙ্গে আসে তার 'স্ত্রী' পিটার অর্লভস্কি, এবং তখনকার দিনের কুখ্যাত রাসায়নিক মাদক এল-এস-ডি (লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাই-ইথালামাইড)
>
> এরা আসবার আগে পর্যন্ত *কৃত্তিবাস*-এর দলটা ছিল, যাকে বলা যায় শৌখিন বখাটে। একটু আধটু দিশি মদ খাওয়া, একটু আধটু এদিক ওদিক যাওয়া এই আর কী— কলকাতা শহরের পত্তনকাল থেকে বাবুদের ছেলেরা যৌবনে পৌঁছে যেসব মিহি বদমায়েশি করে আসছে তার সঙ্গে তার চরিত্রের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। কিন্তু সত্যিকারের নিচুতলায় পৌঁছতে হবে, 'ডিক্লাসড্' হতে হবে, হতে হবে 'মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়', যদি সত্যি সত্যি কবিতা লিখতে হয়— একমাত্র তাহলেই পাওয়া যাবে নীরক্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ গীন্সবার্গই প্রথম সঞ্চার করে *কৃত্তিবাস*-এর কবিদের মধ্যে, তাদের মাথার মধ্যে ভরে দেয় উন্মার্গগামিতার দর্শনতত্ত্ব।
>
> *(ক্রোড়পত্র : ২ অমল, আমার সময়? ব্যক্তিগত : পাঁচের দশক অনুষ্টুপ, শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৫)*

এত সব ভাবতে জাতীয় গ্রন্থাগারে হঠাৎ পেয়ে গেলাম *কবিতা সাপ্তাহিকী*-র প্রথম বই ২য় সংকলন, প্রকাশকাল ১৯৬৬ সাল। মনে পড়ে গেল তখনও ভালো করে শ্মশ্রুগুম্ফ অনুত্থিত কিশোররা তখন 'অনুষ্টুপ' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করার পথে। সমীর সেনগুপ্ত সেখানেও লিখছেন অন্তত চল্লিশ বছর পরে। সে যাই হোক, কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা তিনি *কবিতা সাপ্তাহিকী* লিখেছিলেন। *কবিতা সাপ্তাহিকী*র বৃত্তান্ত আমি একদিন আড্ডায় ইন্দ্রদা (ইন্দ্রনাথ মজুমদার)-র কাছে শুনেছিলাম। 'একদিন শক্তি এসে বলল, *কবিতা সাপ্তাহিকী* বেরোবে। তারপর কী হ্যাপা, কী হ্যাপা, বান্ডিল বান্ডিল কবিতা আসতে শুরু হল। শক্তি মাঝে মাঝে এসে সেগুলো নিয়ে যেত।' ইন্দ্রদার মতে, সে এক পাগলামি। তার ওপর কবিতা সিংহের স্বামী, বিমল রায়চৌধুরী নিজেও কবি এবং কবিতার প্রতি বিষম ঝোঁক। *কবিতা দৈনিক*, সেখান থেকে *কবিতা ঘণ্টিকী*, তারপর *কবিতা মুহূর্তিকী*— কবিতা নিয়ে কতই না মহোৎসব। এর মধ্যে অন্য এক কৃত্তিবাসী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মনে হয় ১৯৭৭-৭৮-এ বইমেলায় বার করলেন মিনিবুক, দেশলাই সাইজের। একটি মিনি বই বিক্রি হলে একবার করে ঘণ্টা বাজবে। এইসব উন্মাদনার মধ্যে থেকেই কী আশ্চর্য, সমীর সেনগুপ্ত কোনোদিন কবি হবার কথা ভাবেন নি। যেন এক নিবিড় দার্শনিকতায় নিরপেক্ষ মন নিয়ে থেকে গিয়েছেন এঁদের সঙ্গে। কৃত্তিবাসের কবি ও লেখকদের নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে *কবিতা সাপ্তাহিকী*-তেই (১ম বর্ষ, তৃতীয় সংকলন, ২১ জানুয়ারী, ১৯৬৬ সাল /বীক্ষণ প্রকাশ ভবনের পক্ষে শ্রীযুক্ত মৃণাল দেব কর্তৃক ১২৪, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা ৫ থেকে প্রকাশিত এবং শশাঙ্ক শেখর হাজরা কর্তৃক মহাশক্তি আর্ট প্রিন্টার্স ২২-এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা-

৬ থেকে মুদ্রিত। দাম ২৫ পয়সা)। নিবন্ধটির নাম *কবিতা বিষয়ক নিভৃত চিন্তা* (পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই, হয়তো দরকার ছিল না) থেকে একটু ছেঁড়া ছেঁড়া উদ্ধৃতি দিয়ে নিবন্ধকারের 'নিভৃত চিন্তা'র কথা বললেও মনে হয় বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

> 'প্রেম, প্রকৃতি; শিল্প, ঈশ্বর ও মৃত্যু; কাব্যরচনার এই প্রিয় বিষয়গুলি এখন কেমন পুরোনো বলে মনে হয়। ভাবা যায় না, একটি দৃশ্য বা একজন রমণীকে ভালোবেসে বা তাকে উপজীব্য করে একটি সুঠাম, সুন্দর ও সৎ কবিতার জন্ম দেওয়া সম্ভব। বিশেষণগুলি ভুল হ'ল; কবিতার আগে কোনও বিশেষণও বসানো যায় না আর। বসানো সম্ভব ছিল যখন কবি একটি বিশেষ 'বিষয়' নিয়ে কবিতা রচনা করতেন।' সমীর সেনগুপ্ত বলছেন, বিষয় থাকলে 'অকবি অথচ সংবেদনশীল অন্য মানুষের অনচ্ছ ভাবনার' কতখানি পরিস্ফুটন করতে পারলেন, তার ওপর নির্ভর করে নাকি বোঝা যেত কবিতাটি 'ভালো', 'খারাপ', 'মাঝারি', 'অসামান্য' এমন কি 'মহৎ' কি না। নিবন্ধকারের মতে 'বিষয়টি' চুরি হয়ে গেছে গদ্যের সন্নিকটে। 'কবিতাকে হ'তেই হয় নির্বিষয়, কেননা এখনকার কবি জানেন, বলার মতো বিষয়ই কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কবি কিছু প্রমাণ করতে চান না, কারণ, তিনি জানেন প্রমাণ করাও যায় না, আর ক'রে কোনও লাভও নেই।'
>
> এই বিষয়হীনতার বিষ সংক্রমিত হতে হতে কি অবস্থা ঘটেছে কবিতায় তাই নিয়ে সমীর সেনগুপ্তের হতাশা সত্যিই অবাক করেছে আমাকে। তিনি এর মধ্যেই 'মানবেতিহাসের সম্মিলিত ভয়' (অর্থাৎ 'মাস'-এর) কথা বলছেন যা গড়িয়ে দিয়েছে কবিতার চাকাকে। তিনি লিখছেন, 'কোনো একজন কবি কি কোনও একযুগের সমস্ত কবির সমস্ত উৎকাঙ্ক্ষার সাধ্য নেই তার গতিরোধ করার। এই গতিকে রোধ করতে গিয়ে মায়াকভস্কি আত্মহত্যা করেছেন, কবিতা লেখা ত্যাগ করে বিদেশী ভাষায় খবরের কাগজ সম্পাদনা করেছেন সমর সেন, আর নিজের দেশ থেকে বহুদূরের কোনও একটা শহরে নাকি এজরা পাউন্ড-কে এখনও লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখা যায়, বৃদ্ধ, পরিত্যক্ত, অনিমন্ত্রিত।'

এই 'নিভৃত চিন্তা'-র গুণাগুণ বিচার না করেও বলা যায় সমীর সেনগুপ্ত কবিতার মধ্যে বিষয়ের অমৃত সন্ধান করে গরল আবিষ্কার করলেন, কেননা তাঁর যুক্তিবাদী মন হয়তো বন্ধুদের এই অনিয়ন্ত্রিত আবেগ মেনে নিচ্ছে না। তিনি কবিদের মধ্যে যুক্তিবাদী মন নিয়ে এক নৈর্ব্যক্তিক কালেকটিভ্‌কে অনুসন্ধান করে চলেছেন, যা শেষ হচ্ছে তাঁর, শেষ জীবনের প্রায় বছর দশেক নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্রচর্চায়। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে 'কবিতা সাপ্তাহিকী'র একটি সংখ্যা পরেই পঞ্চম সংকলনে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) 'সুরজিৎ দাশগুপ্ত' একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'আজকের কবিতা বিষয়ক চিন্তা'/(শ্রী সমীর সেনগুপ্তের 'কবিতা বিষয়ক নিভৃত চিন্তা' পড়ে)।

সমীর সেনগুপ্তের নিভৃত ভাবনা পড়ে কেউ যদি ভাবেন তিনি কাঙ্ক্ষিত কালেকটিভ্‌ প্রগতি চিন্তক কবিতায় আস্থাবান, তাহলে তিনি ভুল করবেন। সমীর সেনগুপ্তকে ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা দীর্ঘকাল চিনেছেন, জেনেছেন, গল্প করেছেন এমনকি মদ্যপানও করেছেন তাঁদের কাছে সমীর সেনগুপ্তর পরিচয় কতটা প্রকট সে-বিষয়ে আমার সামান্য হলেও সংশয় আছে। সমীর সেনগুপ্ত বরাবর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করেছেন, বিষয় ও চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তিনি যখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র কবিতার সংকলনে সম্পাদনার কাজ করেন তখন তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন কবিকে বুঝতে। কেননা তিনি জানেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর একান্ত ও একত্র মদ্যপানের বন্ধু হলেও কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন এক ব্যক্তি, যাঁকে বিষয় হিসেবে অনুভব ও বিশ্লেষণ করে থাকেন একজন সম্পাদক। ঠিক তেমন ভাবেই তিনি সম্পাদনা করেন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা এবং লেখেন তাঁর জীবনী। সারা জীবন তিনি বুঝতে চেয়েছেন কবি, কবির জীবন ও তাঁর কবিতাকে। সে বুদ্ধদেব বসুই হোন, বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শেষ অবধি তাঁর আশ্রয় যে রবীন্দ্রনাথ হতে পারে তা তাঁর জীবনবীক্ষা থেকে অনুমান করা হয়তো সম্ভব।

কবিদের মধ্যে থাকতে থাকতে তুলনামূলক সাহিত্যের এই ছাত্রটি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কমলকুমার মজুমদার মহাশয়ের *সুহাসিনীর পমেটম* নামক উপন্যাসের তীব্র সমালোচনায়। কাউকে চ্যালেঞ্জ করা সমীর সেনগুপ্তর ধাতে ছিল না, রূঢ়তা ও আত্মশ্লাঘায় তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে আমার কোনও দিন মনে হয়নি। তাই তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে অনেকটা না বুঝেই তিনি 'আঁতলেমি' দেখিয়েছেন।

> 'এই যে—সমীরবাবু—' কমলদা তাঁর সহৃদয় হাসিটি হেসে, বুকের ওপর দুহাত জড়ো করে অভ্যর্থনা করলেন। 'বাবু'র ওপর সামান্য বেশি ঝোঁক পড়ল কিনা ঠিক ধরা গেল না— 'আপনাকে আমি যে কবে থেকে খুঁজছি (বাক্যগুলো অবিকল মনে নেই তবে কমলদা প্রায় সবাইকেই 'আপনি' বলতেন) শক্তিকে দিয়ে খবরও পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, বলেনি?' আমি মিনমিন করে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করি, কমলদা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো একটা ভঙ্গি করে বলে চললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম *কৃত্তিবাস*-এ আপনার লেখাটা নিয়ে— ওটা যে কী ভালো হয়েছে— আপনি যে আমার কত ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন—বাস্তবিক, আপনার লেখা পড়ে আমি যে কী উপকৃত হয়েছি— ঠাকুর আপনাকে মঙ্গলে রাখুন (কমলদা রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন, চিঠিও পেয়েছি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' পাঠ দিয়ে, অনেকেই পেয়েছেন)। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি, তলপেটের কাছে দুই হাত জড়ো করা, আর কমলদা আরতি করার মতো আমার সামনে দুই হাত শূন্যে ভাসিয়ে বলে চলেছেন, কেউ কেউ বুঝতে না পেরে একটু বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে, প্রাণ খুলে হোহো করে হাসছে বেলাল আর শক্তি। এততেও হল না, কমলদা পুনরায় কাউন্টারের দিকে ফিরলেন, অনেক চেষ্টায় আমাকে ধরতে পেরেছেন এই সুবাদে সবাইকে কান্ট্রি হাইবল খাওয়ালেন একপাত্র করে, তারপর ছুটি পেলাম। জীবনে কারো কাছে এমন তিরস্কৃত আর কখনও হইনি।
>
> *(ক্রোড়পত্র : ২ অমল, আমার সময়? ব্যক্তিগত : পাঁচের দশক অনুষ্টুপ, শীত-গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০০৫)*

কমলকুমার মজুমদার তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও তিনি তা নীরবে হজম করে নিয়েছেন। সমীর সেনগুপ্ত ছিলেন আত্মসমালোচক। তিনি নিজের গণ্ডি বুঝতেন। ভুল করলে আত্মসমালোচনা করতে বাধত না তাঁর। আমরা এটুকু তাঁর কাছ থেকে শিখতে পারতাম, কিন্তু শিখিনি।

অমল, আমার সময়? পড়লে যে সমীর সেনগুপ্তকে আমরা চিনতে বা বুঝতে পারি সেখানেই তিনি আমাদের সকলের বন্ধু ও প্রশ্রয়দাতা।

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাঁর এই একটি লেখাতেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায় তিনি মানুষটি কেমন। মা, বাবা, রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির, তুলনামূলক সাহিত্যের ক্লাস, কৃত্তিবাসী সঙ্গ, শক্তি, বুদ্ধদেব ও শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথ সব কিছু মিলে আমরা যে সমীর সেনগুপ্তকে পাই তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরের মানুষ নন। তিনি একটি বিষয়ই খুঁজেছেন, বিষয়টি হল মানুষ ও মানুষের সৃষ্ট এই সমাজ।

তাই হয়তো রবীন্দ্রনাথেই তাঁর সেই খোঁজা সার্থকতা লাভ করেছিল।

ভেঙে-যাওয়া আসরের সামনে দাঁড়িয়ে

কালীকৃষ্ণ গুহ

একজন প্রয়াত বন্ধুর কথা কীভাবে শুরু করব ভাবতে ভাবতে অনেকগুলি দিন কেটে গেল। সমীর সেনগুপ্তের চলে যাবার পর (২৩ ডিসেম্বর, ২০১১-র মধ্যরাত্রি) কত-যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, কতবার যে ঝরাপাতাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, কত-যে গান শুনলাম, কত-যে বিকেল হয়ে-আসা দেখলাম, কত পথনাটকের আসরের দৈনন্দিনে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলাম! যেন জীবনের নশ্বরতার নিয়মের পাঠ নিলাম নতুন ক'রে!

আমার বন্ধু শক্তি বইটির শুরুতে সমীর লিখেছিলেন, 'ধরে নিয়েছিলাম শক্তি থাকবে চিরকাল, মানুষকে চিরদিন ভালোবাসবে, পশুপাখিকে ভালোবাসবে, গাছপালাকে ভালোবাসবে। হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, ওর বিরোধ সব শুধু ওর নিজের সঙ্গে, ও পালাতে চায় শুধু নিজের কাছ থেকে– নিজে ছাড়া আর সকলেই ওর বন্ধু। সমস্ত মানুষের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, অথচ ভিতরে ভিতরে এত সুদূর, এমন মানুষ আর দেখব না। সামাজিকতার সম্পর্ক পার হয়ে, বাক্ ও অর্থের হানাহানি শেষ হবার পর একটা জায়গায় শক্তির মতো নিঃসঙ্গ কেউ ছিল না, অমন অনুপস্থিত মানুষ আর কখনও দেখিনি।' এই কথনের ধারায় মনে হয়েছিল সমীরের বিষয়ে আমার কথাও শুরু করতে পারি। আমিও সত্যিই ভেবেছিলাম সমীর সেনগুপ্ত চিরদিন (অর্থাৎ আমার জীবনকাল পর্যন্ত, কেননা তার পরের সময়ের সঙ্গে তো আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না!) থাকবেন, মানুষ গাছপালা ও পশুপাখিকে ভালোবাসবেন, জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার কারণে একজন দার্শনিকের পরিসর অর্জন করবেন। অবশ্য শক্তির মতো নিজের কাছ থেকে পালিয়ে-বেড়ানো 'অনুপস্থিত মানুষ' তিনি ছিলেন না। গত পাঁচ-ছয় বছর তাঁকে নিয়মিত দেখে এসেছি– তাঁর সামনে কমপিউটার, ডানদিকে খোলা জানালা। তিনি কমপিউটার থেকে মুখ তুলে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে দেখতেন রোদ্দুরের রং কেমন হলো, চড়াইপাখিগুলি তাঁর ছড়িয়ে-দেয়া চাল খাচ্ছে কিনা (নাকি তাঁর পোষা বেড়ালের ভয়ে দূরত্ব বজায় রেখে আড়চোখে উড়ে উড়ে দেখছে!), আকাশে আজ কতটা মেঘ বা কতখানি নীলের ঘনত্ব– হয়তো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভেবে নিতেন, শূন্যতার শেষ কোথায়! তাঁর ছিল না ঈশ্বরবিশ্বাস, আত্মা-পরমাত্মার ধাঁধা, পূজাপার্বণের বালাই। জ্ঞানচর্চা ও সর্বতোভাবে জীবনের ব্যঞ্জনাগুলি বুঝে নেবার মধ্যেই ছিল তাঁর ধর্মপালন। তাই তাঁর স্মরণসভার নিমন্ত্রণপত্রে তাঁর স্ত্রী মায়া সেনগুপ্তের চিঠিতে লেখা ছিল এই কথাগুলি, *তিনি রবীন্দ্রচর্চাসহ সাহিত্যের গবেষণাকাজে দীর্ঘকাল নিমগ্ন থেকে গান শুনে জীবন ও প্রকৃতিকে ভালোবেসে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন আমাদের মধ্যে। এই কথা ভেবে আমরা অশ্রুসংবরণের চেষ্টা করছি। বিশ্বপ্রকৃতি ও পার্থিব জীবনেই ছিল তাঁর যাবতীয় আগ্রহ। মানবধর্মের মধ্যেই ছিল তাঁর ধর্মবোধের পরিসীমা। তাঁর নির্দেশ মেনে কোনও পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়নি। এই নির্দেশ আমি ও আমাদের কন্যা কুসুমি সানন্দে গ্রহণ করেছি।* মায়া—যাঁকে নিরীশ্বর সমীরের সাধনসঙ্গিনী হিসেবে বর্ণনা করতে ইচ্ছে হয়– যা বলেছিলেন ওই চিঠিতে, তাতে রয়েছে সমীরের সংক্ষিপ্ততম সত্য পরিচয়, বলা বাহুল্য। তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে আমার নিজের ধর্মবোধ মিলে গেছিল বলেই তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল। তাঁর কাছে অবশ্য যত বেশি যেতে ইচ্ছে করত তত বেশি যাইনি, কেননা চাইতাম না যে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হোক। তাঁর সময় আর ইচ্ছে হলে তাঁর আহ্বান আসত—সপ্তাহে অন্তত দুবার। সব সময়ই তাঁর ভাণ্ডার থেকে একটি-দুটি বই আনতাম—প্রধানত রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার কারণে— যা দিয়ে তিনি আনন্দ পেতেন। একজন জিজ্ঞাসুকে একটি বই পড়তে দেয়ার মধ্যে যেন মিশে ছিল একজন পিছিয়ে পড়া সহযাত্রীর প্রতি মঙ্গলকামনা। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবিশ্বাস শেষপর্যন্ত কীভাবে 'চিরজীবন শূন্যখোঁজা'য় পৌঁছেছিল তা আমরা দুজনেই বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। আমার প্রস্তাব ছিল, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা সম্প্রসারিত হয়ে অন্তহীন বিশ্বপ্রকৃতিতে এসে মিশেছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে যা ছিল নিরীশ্বর। এই প্রস্তাবনায় তাঁর সমর্থন ছিল বলে এ বিষয়ে লিখতে উৎসাহবোধ করেছি, যদিও, বলতেই হবে, অমিয় চক্রবর্তীই বোধ হয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

২

চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে সমীর তাঁর সওদাগিরি অফিসের যোগ্য পোশাক প্যান্ট-শার্ট-টাই ছেড়ে ফেলে, বিলিয়ে দিয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে পড়তে বসেন একটি স্থায়ী আসনে। সাধারণের পড়াশোনা নয়, একজন গবেষকের পড়াশোনা। বুদ্ধদেব বসুর জীবনী লিখে গুরুঋণ শোধ বা স্বীকার করেন। তার আগেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত কবিতা সংগ্রহ করে, তাঁর উপর অজস্র নিবন্ধ লিখে, গুণমুগ্ধ বন্ধুর কাজ সমাপ্ত করেন আর সেইসঙ্গে বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে ওঠেন।

কিন্তু তাঁর গবেষক মন ক্রমশ আরও একটা বিপুল আকার ধারণ করে। তিনি রবীন্দ্রচর্চা শুরু করেন এবং বাংলা-সাহিত্যের পাঠককে চিরঋণী করে প্রথমে *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন* এবং পরে, মৃত্যুর অল্প কিছু আগে, *রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশিরা* নামের দুখানি মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এই বইদুটির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘটেছে তাঁরা জানেন কত শ্রম ও মেধার কাজ তিনি করে গেছেন। আর তার সবটাই করেছেন বিনা পারিশ্রমিকে, শুধু জ্ঞানচর্চার আনন্দে। সরকারি অনুদান পেয়ে কত নির্বোধ কত অপাঠ্য বই লেখে, শুনতে পাই। বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান অবশ্যই পেতেন বলে আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু তা হবার ছিল না। এই কথা ভেবে আমাদের কিছু অতিরিক্ত মনস্তাপ হয়। এ যুগের রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশান্তকুমার পাল ও শঙ্খ ঘোষের পাশেই হয়তো তাঁর নাম করতে হবে আমাদের। কিন্তু এসব বিচার আপাতত নয়। আপাতত আমরা তাঁর লেখা থেকেই তাঁর জীবনের কথা– তাঁর গড়ে-ওঠার কথা—কিছুটা জেনে নিতে পারি।

৩

সমীর ছিলেন একজন যুক্তিবাদী তথা মুক্তচিন্তার মানুষ। আমাদের সমাজে যুক্তিবাদী চিন্তা তথা মুক্তচিন্তা করার জন্য, আর অবশ্যই তা প্রকাশ করার জন্য, যে সাহস লাগে সমীরের তা ছিল।

> বেঁচে থাকলে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান অবশ্যই পেতেন বলে আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু তা হবার ছিল না। এই কথা ভেবে আমাদের কিছু অতিরিক্ত মনস্তাপ হয়। এ যুগের রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশান্তকুমার পাল ও শঙ্খ ঘোষের পাশেই হয়তো তাঁর নাম করতে হবে আমাদের।

এই ব্যাপারটা প্রথমেই বুঝে নিতে পারি। ইস্কুলের পর তিনি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। 'বিদ্যামন্দির' নামের একটি নিবন্ধে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে লিখছেন, 'সংস্থাটি সম্পূর্ণরূপে নারীবর্জিত—রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানে কোনও সন্ন্যাসিনী নেই, অন্তত আমি দেখিনি, যদিও বিবেকানন্দের এক ধনী আমেরিকান মহিলাভক্তের দানেই মিশনের জমি কেনা ও মন্দির তৈরি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সংস্থাটিকে বলা যায় প্রায় মহিলাবিদ্বেষী... কোনও মহিলা কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাইলে করতে পারেন, কিন্তু প্রণাম করতে হলে পাদস্পর্শ অবিধেয়... সমস্ত আবহাওয়াটি নারীভীতিতে সিটিয়ে আছে। রামকৃষ্ণদেব যে-কোনো কারণেই হোক মেয়েদের ভয় পেতেন, তাঁর ধর্মমত শুধুমাত্র পুরুষদেরই পালন করবার জন্যে; সমগ্র কথামৃতে কতবার যে 'কামিনীকাঞ্চন' ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ভাবখানা এমন মেয়েরা সংসার করবে, পতিদেবতার নৈশ খাঁই মেটাবে, ছেলেপিলে মানুষ করবে—তাদের আর ধর্মেটর্মে কী প্রয়োজন তাদের জন্মই তো ওই জন্য।' এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে আমাদের মনে হয়েছে বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'কুমারীপূজা'-প্রথাও একধরনের নারীনির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে যা ক্রমশ হিন্দুসমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে! তাছাড়া আরও বলা যায় যে প্রত্যেক ধর্মেই বহু নারীবিদ্বেষী নির্দেশ থাকলেও হিন্দুদের শাস্ত্রে তা ছিল সব থেকে বেশি প্রকট। এই প্রসঙ্গটি টেনে নিয়ে সমীর বলেছেন, 'শ্রীমতী রিশারের যোগ্যতা বলতে, যতদূর বোঝা যায়, তিনি শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে লিভ টুগেদার করতেন, এই পর্যন্ত— কেন তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের অবতারের মতো পুজো পান তা আমি বহু ভেবেও বুঝে উঠতে পারিনি।' এ বিষয়ে সমীরের সঙ্গে কখনও কথা হলে বলতাম যে এর একমাত্র কারণ, অরবিন্দ বলে গেছিলেন যে তিনি স্বয়ং জগজ্জননী! হ্যাঁ, শুধু এই বলাটুকুর জন্যই তৃতীয় স্বামীকে পরিত্যাগ করে তিনি অবতার হয়েছিলেন পণ্ডিচেরির আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের সাধনসঙ্গিনী হয়ে। বিদ্যামন্দিরে পড়ার কী পরিণতি ঘটেছিল সমীরের জীবনে তা তাঁর কথায়, 'ঢুকেছিলুম চিন্তাহীনভাবে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু হিসেবে, বেরিয়ে এলুম মানবতাবাদী কট্টর নাস্তিক হিসেবে।' সমীর সেনগুপ্তর জীবন গড়ে উঠেছিল প্রধানত দুজন ব্যক্তির প্রভাবে— একজন তাঁর চিকিৎসক পিতা শিশিরচন্দ্র, অন্যজন তাঁর প্রধানতম শিক্ষাগুরু বুদ্ধদেব বসু। ১৯৫৮ সালে, মাত্র ১৮ বছর বয়সে, তিনি যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এম.এ.-তে ভর্তি হন। তিনি লিখছেন, 'আমার জীবদর্শনের মূল ধাঁচটা পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছে, যিনি প্রায় যে-কোনো বিষয়ের অন্তত অআকখটুকু জানতেন, চাষ করতে পারতেন, নিজের হাতে বাড়ি বানিয়ে বাস করেছেন নেফায়, ... তাঁর সংগ্রহের করাত প্লায়ার্স র‍্যাঁদা আর শিরিষকাগজের সঞ্চয় নষ্ট করেই আমার যন্ত্রপাতির কাজে হাতেখড়ি হয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।' এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, 'প্রথম যৌবনে অর্থাৎ উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে বুদ্ধদেব বসুর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হবার ফলে আমার নিজের জীবনে বেশ বড়ো ধরনের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকটেরও উদ্ভব হয়েছিল', কারণ, 'বুদ্ধদেব ছিলেন, যাকে বলা যায় খাঁটি অর্থে গজদন্ত মিনারের অধিবাসী মানুষ, সাহিত্য ছাড়া কিছুই বুঝতেন না।' তাঁর কাছ থেকে বুদ্ধদেব বসুর কথা আরও একটু শুনে নিতে হবে, 'বু-ব-র প্রভাবে বহুদিন পর্যন্ত আমি ছিলুম বিশুদ্ধ স্নব। যত ভালো কথাই কেউ বলুক, সেটা ভালো উচ্চারণে বলা না হলে আমি মন দিয়ে শোনবার যোগ্য বলে ভাবতে পারতুম না, হাস্যকর মনে হত।' আমরা জানি, উচ্চারণের কী ঘনঘটা তৈরি করেছিলেন বুদ্ধদেব তাঁর তোতলামি ও বাঙালত্ব ঢাকবার জন্য! তু.সা ও কবিতাভবন নামের একটি নিবন্ধে তাঁর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিয়ে অসাধারণ প্রতিবেদন আছে যার কথা সবিস্তার এখানে বলার নয়। আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ফাদার ফাঁল ফাদার আঁতোয়ানের কথা, নরেশ গুহ অলোকরঞ্জনের কথা, তাঁর অন্যান্য সহপাঠীর কথা—তুলনামূলক সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংসারের কথা। ফাদার ফাঁল গ্রে স্ট্রিট থেকে যাদবপুরে যেতেন সাইকেল চালিয়ে, পড়াতেন গ্রিক সাহিত্য। আঁতোয়ান পড়াতেন মধ্যযুগ। আর গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত; সুধীন্দ্রনাথের মৃতদেহের পাশে তিনি গেয়েছিলেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি। তাঁর শিক্ষক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পর্কে সমীরের বক্তব্যটি এখানে উদ্ধার করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'অলোকরঞ্জন পড়াতেন বাংলা সাহিত্য, আমাদের চেয়ে সামান্যই বড়ো ছিলেন। তাঁর ক্লাসে নোট নেব বলে খাতা পেন্সিল বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকতাম, কিন্তু তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে লিখে নেবার কথা ভুলে গিয়ে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হত। একজন মানুষ কী করে এমন শিল্পিত বাংলা বলে যেতে পারেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা? মুখের কথায় অমন তাৎক্ষণিক রূপসৃষ্টি করতে আর কাউকে দেখিনি।' বলা বাহুল্য, কেউই কখনও দেখেনি বলে ধরে নেয়া যায়। এখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে যখন তিনি কথা বলেন। মনে পড়ছে গতবছর এক সন্ধ্যায় আমাদের আস্তানায় অলোকরঞ্জন এসেছিলেন। সারাক্ষণ তিনিই কথা বললেন আর কবিতা পড়লেন। পাশে নির্বাক শঙ্খ ঘোষ, নির্বাক সমীর সেনগুপ্ত। নির্বাক সভা। শুধু শুচিশ্রী নামের একটি মেয়ে একটি খেয়াল গান গেয়ে সেই সভার আবহ তৈরি করে দিয়েছিল। তারপর থেকে সমীরের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রায়ই অলোকরঞ্জনের কথা উঠত। শক্তির সঙ্গে জীবন কাটানোর বহু আশ্চর্য বিবরণ সমীর রেখে গেছেন, যেকথা আগেই তুলেছি। শক্তির সঙ্গে রামকিংকরের আস্তানায় ঘোর মত্ত অবস্থায় রাত্রি কাটানোর বিবরণটির কথা অনেকেই জানেন। এই বিবরণটি স্পর্শ করতেই হবে। সেই রাত্রিযাপনের শেষভাগে সমীর তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় হঠাৎ জেগে উঠে দেখেছিলেন, 'বাঁদিকে, দরজাটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, আন্দাজ ৩০° কোণ করে একটা টুলের ওপর কিংকরদা বসে আছেন, সম্পূর্ণ নগ্ন। লুঙ্গিটা কোমর থেকে কোথাও খসে পড়ে গেছে, টের পাননি। তাঁর সামনে একটা টুলের ওপর—সেটা টার্ন-টেবিল ছিল কিনা মনে নেই— বসানো একটা অর্ধসমাপ্ত মাটির ভাস্কর্য, সীলিঙের একটা বাঁশের বরগা থেকে লণ্ঠনটা ঝুলছে। ডান হাতের মুঠোয় ভাতের গ্রাসের আকারের একটা মাটির তাল। টুলে বসে স্তব্ধ হয়ে কাজটার দিকে তাকিয়ে আছেন রামকিংকর, স্থির। লক্ষ লক্ষ মশা ছেঁকে ধরেছে, তিনি টের পাচ্ছেন বলে মনে হয় না। চোখে একটা অদ্ভুত ফ্যালফেলে ভাবলেশহীন দৃষ্টি— চেয়ে আছেন কিন্তু চর্মচক্ষে কিছু দেখছেন বলে মনে হচ্ছে না। রামকৃষ্ণদেব যাকে বলেছেন যোগীর দৃষ্টি।'

যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ খুলে সাহিত্যপাঠের যে নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, তা নিশ্চয় অতুলনীয়। ফরাসি জার্মান বা রাশিয়ান ভাষার প্রধান লেখক-কবিদের রচনা বাংলা-ইংরেজি অনুবাদে বাঙালি কবি-লেখকদের হাতে চলে এল রাতারাতি। বোদলেয়ার র‍্যাঁবো রিলকে হোল্ডারলিন কাফ্‌কা কামু দস্তয়ভস্কি রাতারাতি বাঙালি কবিলেখকদের ঘরে চলে এল, অনেকটাই বুদ্ধদেব বসুর সৌজন্যে। এ ব্যাপারে

সমীর সেনগুপ্ত ও দ্বিজেন চক্রবর্তী।

সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের অবদানও মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর অবদান। শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল একটি আশ্চর্য গ্রন্থ—সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত—এই একই ধারায়— যাকে হয়তো বলা যায় তুলনামূলক সাহিত্য-আন্দোলনের ধারা। এই ব্যাপারটি আলোচনা করতে গিয়ে সমীর সুন্দর মন্তব্য করেছেন, ‘ক্রমে বাংলায় এই মত প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করল যে সাহিত্য ব্যাপারটা ভাষা থেকে ভাষায় আলাদা আলাদা করা কোনও ব্যাপার নয়, বস্তুত বিশ্বসাহিত্য বৈচিত্র্যে বহুধাজটিল হয়েও সারত এক, ও অবিভাজ্য।’

৪

এবার একান্ত ব্যক্তিমানুষ সমীরকে নিয়ে দু’একটা কথা বলে আমাদের এই দ্রুত-লিখিত প্রতিবেদন শেষ করব। সমীর নাস্তিক ছিলেন, বলেছি। কথাটার কিছু বিস্তার তাঁর ভাষায় শোনা যেতে পারে, ‘ঠিক বুঝি না আমি নাস্তিক কিনা। আমি ঈশ্বরে, অলৌকিকে, পরলোকে, পুনর্জন্মে, অবতারে, স্বর্গে ও নরকে, আত্মার অবিনশ্বরত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি। ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা—শব্দ দুটো আমার কাছে একই অর্থ বহন করে। ...আমাকে কেউ প্রসাদ দিতে এলে আমি বলি প্রসাদ ছাড়া কিছুই খাই না, কারণ আমি যা খাই সবই প্রসাদ—তিনি প্রসন্ন হন বলেই খেতে পাই। খাবার আগে যদি ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তাহলে তো প্রত্যেকবার নিশ্বাস নেবার আগে একবার করে প্রণাম করে নেওয়া দরকার... ভালোবাসা থেকে যা কিছু করি সবই তাই তো প্রণাম... অজস্র স্ববিরোধ নিয়ে আমার আমিত্ব তৈরি হয়েছে—সেই আপতিক বিরোধগুলির অন্তর্লীন সামঞ্জস্যের সুরটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে যাওয়ার নামই পূজা।’ *নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা* নিবন্ধে সমীর শেষ স্তবকে যা বলেছেন তা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বলেছেন, ‘আমি নাস্তিক হতে পারি কিন্তু অধার্মিক নই। আমি মানুষের ধর্মে বিশ্বাস করি। ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাখায় বিশ্বাস করি। বরং মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকতে রাজি আছি, কিন্তু অবিশ্বাস করে মনের শান্তি নষ্ট করতে রাজি নই। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু সর্বজীবের মঙ্গলকামনায় বিশ্বাস করি, মানুষের চিরকাল ধরে হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করি। স্বপ্ন দেখি এমন এক পাসপোর্টহীন পৃথিবীর, যেখানে কোনও শিশুকে পেটে খিদে নিয়ে ঘুমোতে যেতে হয় না।’ আমাদের হাতের কাছে রয়েছে সমীরের ‘অমল, আমার সময়?’ নামের বইটি যা অনেকগুলি নিবন্ধের তারকাখচিত একখণ্ড আকাশের মতো একটি সংকলন, যেখানে সমীরের যৌবনের কথার পাশাপাশি পাওয়া যায় তাঁর পরিণত বয়সের নানা উপলব্ধির কথা—যেখানে দেখা যায়, একজন যৌবনের স্তবের বহু আগেই উত্তরণ ঘটে গেছে একটা দার্শনিক পরিসরের সরলতায়, চর্যায়।

দিন যায় নামের নিবন্ধে সমীর লেখেন, ‘সাধারণভাবে আমার যেটুকু চোখে পড়ে, হিংসা এড়িয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সমস্ত জীবজগৎ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত; খাদ্যশৃঙ্খল অর্থই হিংসা, আমি প্রতিবার নিশ্বাস নিলে অজস্র প্রাণী নিহত হচ্ছে। সমস্ত জগতে, যতদূর বোঝা যায়, মানুষের মনে ছাড়া ন্যায়বোধ সৌন্দর্যবোধ ভালোবাসা বিবেক নামক বৃত্তিগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই কোথাও। তা-ই যদি হবে, তা হলে সমস্ত মানবসভ্যতার এত দার্শনিক চিন্তা কোন উদ্দেশ্য সাধন করছে?... তাই কোনও কথা ভাবতে যাওয়া, কোনও তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা অর্থহীন মনে হয়। আমি শুধু জানলায় বসে থাকি, পাখি দেখি, পোকামাকড় দেখি, রাস্তার কুকুরদের দেখি। ওই যে সুন্দর শালিকটি পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে, কল্পনা করতে পারি, আমার কাছে ডাইনোসর যেমন বীভৎস মৃত্যুর প্রতীক, পোকাদের কাছে ওই শালিকটিও তেমনই। কিন্তু তা জেনে আমার কী হবে, পূর্ণ সত্যে তো আমার অধিকার নেই, খণ্ডসত্যের বাইরে আর কিছু জানবার এখতিয়ারও নেই আমার। পোকারা শালিকটিকে কী চোখে দেখে তা জেনে আমার কী হবে, আমার চোখের সামনে রোদজ্বলা শিশিরভেজা ঘাসের ওপর শালিকেরা নেচে নেচে বেঁচে চলেছে, এই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?’

বোঝা যায় একটা দর্শন-পরিসরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলছেন সমীর, যা ছিল হয়তো তাঁর জীবনে তোলা শেষ প্রশ্ন, শেষ উত্তরও। তাঁর কাছে গীতাপাঠের সমাধান ছিল না; শুধু বুলি আওড়ে-যাওয়ার কোনও সমাধান ছিল না। এই অন্তহীন স্থানকালের পরিসরে, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের অনিবার্য আর নিরপেক্ষ একটা অন্ধত্বের মধ্যে বসবাস করে জীবন অতিবাহিত করাই শেষ কথা। এই অসহায়তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেয়ার মধ্যেই যুক্তিবাদীর মুক্তি, সমীরের মতো প্রজ্ঞাবানের মুক্তি।

৫

ঘটনাচক্রে সমীরের চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে থেকে জেনেছিলাম কত গভীর তাঁর জীবনসংকট যা তিনি হয়তো নিজেকে বোঝেননি। বলতাম, ‘গবেষণামূলক কাজ অনেক করেছেন।

আর নয়। এখন থেকে আর কোনো তথ্য ঘাটবেন না। শুধু মুক্তভাবে লিখুন জীবনের আরও কিছু উপলব্ধির কথা।' তিনি চুপ করে থেকে কী যে ভাবতেন!

সমীরের মৃত্যুর পর আমাদের বার্ধক্যের স্থবির ও বহু-প্রতীক্ষিত জিনপানের আসরটি ভেঙে গেল। এই ভেঙে-যাওয়া আসরের সামনে দাঁড়িয়েও বলতে হবে যে সমীরের সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার মধ্যে কোনও তির্যকতা ছিল না, এমন নয়। দুটি প্রান্তিক জায়গা ছিল কিছু তির্যক। সমীর দুঃখ পেতেন এই ভেবে যে আমি যথেষ্ট বুদ্ধদেব বসু পড়িনি। ঠিকই। তবু আমি ভাবতাম, তাঁর প্রবন্ধ তো প্রায় সবই পড়েছি, কবিতাও তো পড়েছি অনেক, কাব্যনাটকগুলি পড়েছি। কিন্তু আমার মধ্যে এমন উচ্ছ্বাস তৈরি হয়নি যা বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে সমীরের মূল্যায়নের উত্তুঙ্গতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। বস্তুত এ বিষয়ে আমরা নীরবতাই পালন করেছি শেষপর্যন্ত। বলিনি, যে, বুদ্ধদেব বসু যে মধুসূদন পড়াতে দিতেন না তা ছিল নিতান্তই অরসিকোচিত, অন্ধত্ব-শাসিত! এ বিষয়ে সমীর জানাচ্ছেন :

> সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতেও মাঝে মাঝে ক্লাশ করতে গিয়েছি আমরা। তাঁর কাছে আমরা মাইকেল পড়তে চেয়েছিলাম, বললেন, 'বুদ্ধদেব তো এখানে আমাকে মাইকেল পড়াতে দেবেন না, তোমরা যদি আমার বাড়িতে আসতে পারো তো পড়াতে পারি।'
>
> *(তু.সা. ও কবিতাভবন)*

সমীর দুঃখ পেতেন এই ভেবে যে আমি যথেষ্ট বুদ্ধদেব বসু পড়িনি। ঠিকই। তবু আমি ভাবতাম, তাঁর প্রবন্ধ তো প্রায় সবই পড়েছি, কবিতাও তো পড়েছি অনেক,কাব্যনাটকগুলি পড়েছি। কিন্তু আমার মধ্যে এমন উচ্ছ্বাস তৈরি হয়নি যা বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে সমীরের মূল্যায়নের উত্তুঙ্গতার সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

অন্য বিষয়টি ছিল সংগীতে, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতে, আমাদের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে। সমীর যে রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। তিনি নিজেও একসময় গান গাইতেন অর্গান বাজিয়ে। যৌবনে কিছুদিন বেহালা শিখেছিলেন। বাঁশিও বাজাতেন। তাঁর ভাণ্ডার থেকে কত-যে গান উপহার হিসেবে পেয়েছি, তা ভাবলে আজ মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তিনি চাইতেন গান হবে উদাত্ত, খোলা-গলায় বড়ো আওয়াজে গাওয়া, যেমন শক্তি গাইতেন। আমি চাইতাম, সেই খোলা-গলার উদাত্ত গান যেন নিমগ্নতা না হারায়, তা যেন সুরের শুদ্ধতা বজায় রাখে, যেন ভিতরের কান্নাটি না হারিয়ে ফেলে; যেন চিৎকৃত না হয়—তা যেন শ্রোতার উপস্থিতির বাইরে দাঁড়িয়ে গায়কের নিজের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়। আসলে এ বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য ছিল শুধু ঝোঁকের প্রশ্নে। ফলে তিনি যেমন দেবব্রত বিশ্বাসের গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে রাজি ছিলেন, তেমন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুবিনয় রায় শুনতে রাজি—ষাটোর্ধ্ব সুবিনয় রায়।

এই কথাগুলি শুধু বলার জন্যই বলা। তিনি যে কাজ রেখে গেলেন দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 'চিরস্থায়ী' লিখতে গিয়ে 'দীর্ঘস্থায়ী' লিখলাম, যেহেতু 'চিরস্থায়ী' শব্দটি অনুচ্চার্য। তাঁর নাম বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে, এই বিশ্বাস নিয়ে শুনতে পাচ্ছি সুবিনয় রায়ের কণ্ঠ : এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে। বসন্তকাল। দিনের আলো নিভে আসছে।

অনলাইনে কিনতে ▸ www.swarnakshar.in

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বগত

দেশের প্রতি আমার কোনো আনুগত্য নেই—আমার আনুগত্য ভাষার প্রতি। জন্মেছিলাম বরিশাল শহরে, বেয়াল্লিশ বছর পর একদিন সেখানে ফিরে গিয়ে শহরটার প্রতি কোনো বিশেষ টান অনুভব করিনি। জীবন কেটে গেল কলকাতায়। কলকাতার বদলে কালিকট হলে বা কানেকটিকাট কিম্বা ক্যানসাসা সিটি হলে খুব একটা এসে যেত না কিছু।

আমি যে-পৃথিবীতে বাস করি, তারও আড়ালে এই রকম কোনো দ্বিতীয় সত্য লুকিয়ে আছে কিনা, আমি জানি না তো; কেন এই পৃথিবী, কেন সূর্যচন্দ্রগ্রহতারা, কেন গ্রীষ্মের পর বর্ষার পর হেমন্ত আসে, কিছুই তো বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি, আমার ভালোর জন্যে এই ব্যবস্থাগুলো তৈরি হয়নি...।

জীবন বয়ে চলেছে, শুধু মানুষের মধ্য দিয়ে নয়, পশুপাখির মধ্য দিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে— সেই বহতা স্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে কোনোভাবে যুক্ত করে দিতে পারলেই হৃদয়ের ভিতর থেকে জীবন আপনিই কথা বলে উঠবে।

বুড়ো না হবার হাজার আকর্ষণেও আমি মেনে নিতে পারব না আমার রুচির উপর জনগণেশের বলাৎকার; তার চেয়ে আমি বরং থাকব নিজের ঘরে প্রবাসী। লোকের কাছে বরঞ্চ আমার পরিচয় হোক কুতার্কিক বলে, আশাহীনভাবে অবাস্তববাদী বলে, এমনকি খিটখিটে বুড়ো বলে। সমস্ত দেশ যখন পেটজোড়া খিদে আর হাতজোড়া কম্পিউটার নিয়ে একুশ শতকের দিকে মিছিল করে এগিয়ে চলেছে, আমি তখন নিজের ঘরে জানলা বন্ধ করে পুরোনো অ্যালবাম খুলে হলদে হয়ে যাওয়া ছবি দেখব, কিন্তু মিছিলে সামিল হব না। কারণ, আমারও নেই ঘর— আছে ঘরের দিকে যাওয়া।

এতকাল ধরে শক্তির সঙ্গে বন্ধুতা—পরস্পরের বহু আনন্দবেদনার সঙ্গী।... কিন্তু তবুও ওকে ভালো করে চিনিনি কখনো। আমাদের জীবনবৃত্ত অতি ক্ষুদ্র জ্যা-তে পরস্পরের কক্ষ অতিক্রম করে। আমি সামান্য মরণশীল, সরস্বতীর পদতল থেকে খসে পড়া শুকনো পাপড়ি বুকপকেটে রেখে জীবন কাটাই। সরস্বতীর মথিত চুম্বনে যার ওষ্ঠ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাকে কেমন করে চিনব? ...কবি শক্তি তার রচনার আড়ালে অপরিচিত থেকে গেছে।

কবিতা পড়তে শিখেছিলাম বাবার কাছ থেকে। সাহিত্যচর্চা যাকে বলে বাবা তা করতেন না ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছিল, বিয়ের পর মাকে প্রথম উপহার দিয়েছিলেন একটি তৃতীয় সংস্করণ *সঞ্চয়িতা*, নীল সিল্কে বাঁধানো ভারি মলাটটির ডানদিকের নিচের কোনায় সোনার জলে মায়ের নাম লেখা, ঈষৎ ব্রাউন হয়ে যাওয়া অ্যান্টিক কাগজে ছাপা বইটি এখনো আছে আমার কাছে।

তাই কোনও কথা ভাবতে যাওয়া, কোনও তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা অর্থহীন বলে মনে হয়। আমি শুধু জানলায় বসে থাকি, পাখি দেখি, পোকামাকড় দেখি, রাস্তার কুকুরদের দেখি। ওই যে সুন্দর শালিকটি পোকা ধরে ধরে খাচ্ছে, কল্পনা করতে পারি, আমার কাছে ডাইনোসর যেমন বীভৎস মৃত্যুর প্রতীক, পোকাদের কাছে ওই শালিকটিও তেমনই। কিন্তু তা জেনে আমার কী হবে, পূর্ণ সত্যে তো আমার অধিকার নেই, খণ্ডসত্যের বাইরে আর কিছু জানবার এখতিয়ার নেই আমার। পোকারা শালিকটিকে কী চোখে দেখে তা জেনে আমার কী হবে, আমার চোখের সামনে রোদজ্বলা শিশিরভেজা ঘাসের ওপর শালিকেরা নেচে নেচে বেঁচে চলেছে, এই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

সুধীন্দ্রনাথের বাড়িতেও মাঝে মাঝে ক্লাশ করতে গিয়েছি আমরা। তাঁর কাছে আমরা মাইকেল পড়তে চেয়েছিলাম, বললেন, 'বুদ্ধদেব তো এখানে আমাকে মাইকেল পড়াতে দেবেন না, তোমরা যদি আমার বাড়িতে আসতে পারো তো পড়াতে পারি।'

বর্ষায় ভরা গঙ্গায় বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে সাঁতরে চুঁচড়ো থেকে নৈহাটির মাটিতে পা না ঠেকিয়ে ফের এপারে ফিরে আসা, অশথ গাছের ডাল থেকে কোটালের বানের ঠিক মুখটায় লাফিয়ে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে কিছুদূর গিয়ে ভেসে ওঠা, প্রিয় কুকুর লালুর গলা জড়িয়ে ধরে সাঁতার কাটা, গঙ্গার বুকে সাঁতরে বেড়ানো আর মাঠে ঘাটে রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো আমাদের দলটার কাছে একই রকম সহজ ও স্বাভাবিক ছিল।

এখন তো বেশির ভাগ গানই কারো গলায় শুনতে ভালো লাগে না, একটা কলি শুনলেই ক্লান্তি আসে, পুরো গানটা কীভাবে গাওয়া হবে এক লহমায় বুঝে যাই। কোনো চমক নেই, অবাক হওয়া নেই। এখন ভালো লাগে শুধু মনে মনে গানটাকে ভাবতে।

ফাদার ফালঁ গ্রীক সাহিত্য পড়াতেন আর *ডিভাইন কমেডি*। দীর্ঘ কৃশ শরীর, সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তখন গ্রে স্ট্রিটে থাকতেন, সেখান থেকে যাদবপুর সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আসা করতেন...। পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে ওপর দিকে চোখ তুলতেন, তখন ত্রিনয়নের মতো অদ্ভুত বাঁকা বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠত, দেখে মনে হত সত্যি সত্যি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। প্রথম যেদিন বললেন গ্রীক ট্র্যাজেডির মূল কথা পিটি আর ফিয়ার, না বুঝে বোকার মতো তর্ক করেছিলাম তাঁর সঙ্গে, ধৈর্য হারাননি।

কৃত্তিবাস-এর দলে বোহেমিয়ান, বাউন্ডুলে, উড়নচণ্ডী বলতে তাঁরা জানেন শক্তিকে— তার উদ্ধত ও তির্যক পরিহাসবোধ, নিজের স্বার্থের অপরিমেয় ক্ষতি করেও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার রুখে দাঁড়ানোর ধারাবাহিক ইতিহাস, তার তৃপ্তিহীন পানাসক্তি, মোড়ের মাথা থেকে সিগারেট কিনে আনতে গিয়ে তিনমাস পর বাড়ি ফেরা— এসব বিষয়ে অপরিমিত গল্প শুনে শুনে সেইরকম ধারণাই মোটামুটি জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। অথচ শক্তি খাঁটি বোহেমিয়ান নয়, প্রতিবাদী চরিত্র মাত্র, খাঁটি বোহেমিয়ান বলতে একমাত্র দীপকই ছিল কৃত্তিবাস-এর দলে।

দেশপ্রেম ধর্মমত রাজনীতি এসব বাদ দিয়েও যে বেঁচে থাকা যায়; এমনকি এগুলোকে বর্জন করতে পারলে তবেই যে বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে অর্থময় করে তোলা সম্ভব, কম্প্যারেটিভ লিট্রেচার পড়তে না এলে এই বোধ হয়তো চিরজীবন আমার অধরা থেকে যেত।

দুরূহের প্রতি আকর্ষণও চলে যায়নি, বরং বেড়েছে। মনের মধ্যে বড়ো বড়ো পরিকল্পনা ফাঁদি, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যে পাখিকে ধরবার চেষ্টা আরম্ভ করা উচিত ছিল তার ডবল বয়সের কাছাকাছি পৌঁছে তার জন্যে যত্ন করে জাল বিছাই। পাওয়া নাই বা গেল, চাইতে দোষ কী? আর কিছু না হোক, নিজের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকা তো যাবে? বার্ট্রান্ড রাসেল নাকি ছিয়াশি বছর বয়সে চীনে ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বইপত্র সংগ্রহ করি, নোট নিই, কাজও আরম্ভ করে দিই, শেষে কী হবে, করে উঠতে পারব কিনা, আমার ক্ষমতায় বিদ্যেয় অভিজ্ঞতায় কুলোবে কিনা এসব না ভেবেই রাত জাগতে আরম্ভ করে দিই। মনে মনে জপ করি সোনার হরিণ চাই, আমার সোনার হরিণ চাই—

ভ্রমণপথের পাঁচালি ডিসেম্বর, ১৯৯৬

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দূর-অদূর

মাথায় ঘন কাশফুলের ধাপচাষ, মুখে ভুবন ভোলানো হাসি, প্রবীণ পুরস্কৃত প্রথিতযশা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদেরই বাড়িতে একদিন ভ্রমণকেন্দ্রিক আড্ডায় বলেছিলেন, যে লোক টালায় থাকে সে টালিগঞ্জে তার কোনও বন্ধুর বাড়িতে কয়েকটা দিন ঝাড়া হাত-পা কাটিয়ে গেলে সেও কিন্তু খুব চমৎকার একটা ভ্রমণ হয়ে যায়। কলকাতার একেক জায়গার বৈশিষ্ট্য একেক রকম, গন্ধ ভাষা অলি-গলি পরিবেশ এতই আলাদা যে এক জায়গার লোকের কাছে আরেক জায়গায় গিয়ে কদিন থাকা একটা নতুন দেশ দেখার মতোই। দিব্যি মন ভরে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথাটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল এই জন্য যে সেই আড্ডায় উপস্থিত কবির স্ত্রী লেখিকা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আঠেরো বছর বয়সে সাইবেরিয়া থেকে ট্রেনে দীর্ঘ পাড়ি দিয়ে তখনকার পিকিং, এখনকার বেইজিংয়ে পৌঁছেছিলেন। সেদিনের ঘরোয়া আড্ডায় অন্য অতিথি 'আজকাল' পত্রিকার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক প্রতাপকুমার রায় চিন-রাশিয়ায় গিয়েছেন একাধিকবার, পি টি আইয়ের চেয়ারম্যান, কি ভারত সরকারের নিউজপ্রিন্ট পারচেজ কমিটির সদস্য হিসাবে। গোটা বিশ্বভ্রমণেরও তাঁর খুব বেশি আর বাকি নেই, তা সত্ত্বেও সামান্য ফাঁক পেলেই আজও বেরিয়ে পড়েন কৃষ্ণনগর বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর রায়চকে।

সামান্য 'ভ্রমণ'-সম্পাদককেও সংবাদপত্র-সম্পাদকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বা বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হিসাবে ইউরোপের নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, এই তো মাস কয়েক আগেও বাসে করে ঘুরে এলাম স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন (স্থানীয় উচ্চারণে লিসবোয়া)।

সেইসব ভ্রমণ ও তার স্মৃতির পাশে বারুইপুর বারাসত ধপধপি ফুলিয়া শান্তিপুর কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ ডায়মন্ডহারবার ক্যানিং গোসাবা ভ্রমণের কথাও ভুলতে পারি না। গোসাবায় বিদ্যাধরী, নাকি দুর্গাদোয়ানি নদীতে ভরা জ্যোৎস্নায় কবি-অধ্যাপক ও দুঃসাহসিক পর্যটক নবনীতা দেবসেন, তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা ও ভ্রাতৃপ্রতিম দীপঙ্করকে আমাদের নৌকোয় তুলে নিয়ে অলৌকিক জলযাত্রা ও যাত্রা শেষে একের পর এক নদীতীরে একহাঁটু কাদায় আছাড় খাওয়া এতদিন পরেও আমার মনে একটি মধুর ভ্রমণস্মৃতি হয়ে আছে। এমনকী ডায়মন্ডহারবার লাইনে ধামুয়ায় স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদিগন্ত ধানখেত চিরে চলে যাওয়া খালে তালগাছের ডোঙায় যেন এক অচিন দেশের দিকে পাড়ি দেওয়া— সে কি কোনও দিন ভোলা যায়? শুনেছিলাম ওই খাল নাকি ডায়মন্ডহারবারের নদীর আত্মীয়।

গোসাবায় বিদ্যাধরী, নাকি দুর্গাদোয়ানি নদীতে ভরা জ্যোৎস্নায় কবি-অধ্যাপক ও দুঃসাহসিক পর্যটক নবনীতা দেবসেন, তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা ও ভ্রাতৃপ্রতিম দীপঙ্করকে আমাদের নৌকোয় তুলে নিয়ে অলৌকিক জলযাত্রা ও যাত্রা শেষে একের পর এক নদীতীরে একহাঁটু কাদায় আছাড় খাওয়া এতদিন পরেও আমার মনে একটি মধুর ভ্রমণস্মৃতি হয়ে আছে।

আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণ আরও রোমাঞ্চকর। নিউ মার্কেট থেকে রুকস্যাক মনে করে যেটা কিনেছিলাম সেটা, এখন বুঝি, ছোটদের স্কুল ব্যাগ। তাতে একসেট জামা-প্যান্ট নিয়ে ট্রেনে বাসে পৌঁছে যাই ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ হয়ে নামখানায়। নামখানায় নদীর ধারে টাল দিয়ে রাখা কুমড়োর পাহাড়ই আমার প্রথম পর্বতদর্শন। সেটা ছিল আমার কাছে সন্ন্যাস আর অভিযানের জগাখিচুড়ি। তখন আমার ১৩ বছর বয়স। নামখানার পাগলকরা নদীর গন্ধমাখা হাওয়া আজও মনে হয় আমার দেহ মন ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়ার কথায় মনে পড়ল, একদিন, কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিছু ভাবিওনি, হঠাৎ একটা কোনও লোকাল ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম, পথে প্রায় ওপারহীন মাঠ ভেঙে হাওয়ার ঝাপটা এসে এই-বুঝি-দম-বন্ধ-করে-দেয়-ভাব করে আমার শরীর টলিয়ে দিচ্ছিল, একটু পরেই সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেনটা থামতেই আমি সেই মাঠে নেমে পড়ি। এক সময় মাঠেই ঘুমিয়েও পড়ি।

ঘুম ভাঙতে দেখি একটা শিমুল গাছের তলায় শুয়ে আছি, সামান্য দূরে একটা ছাগলছানা ঘাস খাচ্ছে, তার সঙ্গী এক বালিকা অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। এটা হয়তো আমার জীবনের স্মরণীয় ভ্রমণগুলিরই একটি।

তাই মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়তো ঠিকই বলেছেন, ভ্রমণ মানেই দূরযাত্রা নয়। আমার আজকাল খুব মনে হয়, ভ্রমণের আসল কথা মন, আসল কথা মনের নবজন্ম। দূরত্ব নয়, স্নেহ ও শুশ্রূষা দেবার মতো কোনও পরিবেশ, মনকে রাঙিয়ে দেবার মতো, জাগিয়ে দেবার মতো যে কোনও জায়গা মানুষের আন্তরিক গন্তব্য। ঢিমে গতির কয়েক ঘণ্টার সামান্য রেল ভ্রমণের অসামান্য বিবরণ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দুয়ার হতে অদূরে' আমার মতে ভ্রমণের একটি মহাকাব্য।

যত কাছেই হোক, যত দূরেই হোক, প্রাণ চায়, অচেনা পথে অজানা দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। দেখে বেড়াই তার নিসর্গের সৌন্দর্য, ইতিহাসের আঁকিবুঁকি, ভূগোলের বৈভব। কী বিশাল আর বিচিত্র এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও প্রাণলোক!

রজতশুভ্র মজুমদারের চারটি কবিতা

আ ছে দুঃ খ, আ ছে মৃ ত্যু...

'I stung back the tears and felt her so strongly inside me that I could not bear it ...'

-'The Slow Sound of His Feet'
Dambudzo Marechera

লাল টকটকে সন্ধ্যা। ধর্ষকাম বাতাস
ও নির্জনতা। অনেক দূরে বিড়াল ঘুমিয়ে
পড়েছে। তার ঠান্ডা রক্ত চাপা আছে
শান্ত থাবায়, বুকের পাঁজরে...
বরফের ছোবলে ছোবলে রক্তাক্ত মাটি
কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু। গড়িয়ে
নামছে ক্ষরণলিপি। শান্ত। শব্দহীন।
তোমার মাথা ভর্তি ক্যান্থারাইডিনের

মতো—চলকে নামছিল তোমার হিমেল
গ্রীবা বেয়ে ...। সেই ঝুলন্ত সন্ধ্যায় –
লাল টকটকে সন্ধ্যা আর নিরবচ্ছিন্ন
ক্যান্থারাইডিন ... .

মা, তুমি ডিসিশন নেবার আগে
একবারও আমাকে ভাবলে না? ...

একটি মৃত্যুর কাহিনি

সাহাদাত ওপার বাংলার ছেলে
বাঁচার আশায় সে এসেছিল
এখানে, এই বাংলায়
শহর কলকাতার একটি ঝকঝকে
বেসরকারি হাসপাতালে—
ত্রিশ হাজার টাকার প্যাকেজে
যেরকম প্যাকেজে আমরা টুরে যাই
কিংবা রেস্তোরাঁয় খেতে
অনেকটা সেরকম ...
সম্পত্তি বিক্রি করে চলছিল তার চিকিৎসা
কিন্তু সাহাদাত বাঁচল না ...

গল্পটা এই পর্যন্ত একই রকম ছিল,
আর পাঁচটা অকালমৃত্যুর মতোই।
কিন্তু বাদ সাধল হাসপাতাল—
মোট বকেয়া আশি হাজার টাকা
— এই মর্মে ডেডবডিটা
আটকে রাখল তারা
টানা সাতদিন সাতরাত ...

সাতদিন সাতরাত ধরে ওরা দেখিয়ে দিল
সাহাদাতের পচাগলা মৃতদেহ
আসলে সাহাদাতের নয়,
হাজার বছর ধরে যে সভ্যতা
মৃতকে সম্মান করতে শেখায়
তার ...।

কদমফুল

ফেরার পথে বাস থেকে নেমে
সোজা ঢুকে গেছ বাজারে,
কচি লাউ লাল শাক দুটো পাতিলেবু ...
তারপর সাইকেলে উঠে
এতটা রাস্তা বিধিবদ্ধ রোদে, ঘামে—
বাড়ি ফিরেছ থমথমে পদক্ষেপে...
কুয়োতলায় শুকোতে দেওয়া
মেয়ের ফ্রক, বালিশের ওয়াড়
ভীষণ খরাপ্রবণ, ফ্যাকাশে ...।
তারপর হাঁড়ি চড়িয়ে চান
সেদ্ধ ভাতের গন্ধে যখন বেলা গড়াচ্ছে,

সহজ নিয়মানুগ ছায়া একটু একটু খেয়ে নিচ্ছে
দুপুরের রোদ
মেয়েকে খাইয়ে,
নিজে কোনোরকমে দু-মুঠো গুঁজে,
হাতে তুলে নিচ্ছ ঠান্ডা জল ও সারিডন ...।

সহসা গভীর মেঘ জমছে আকাশে
বৃষ্টি নামল বলে...
তার নিভৃত প্রস্তুতির নীচে
স্থির সংসারগাছের আগায়
কদমফুলের মতো ফুটে আছে
তোমার মুখ...

ওল্ড এজ হোম

আজ এই চাঁদে ঢাকা ছাদে এসে
কত চাঁদ আগের কথা মনে পড়ে
তুমি ছিলে দুর্দান্ত জোৎস্নাবান আর সেই প্রকাণ্ড বাহুপাশে
পোয়াতি বউ তোমার ছাদ থেকে হাতে করে চাঁদ পেড়ে
এনেছিল —

খোকা বড়ো জেদি বড়ো একরোখা হল ...

তোমার ছত্রপতি শিবাজি আর আমার দুধের পাঠ
এইভাবে প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় বড়ো হয় ছোট্ট জীবন
আমাকে ছাড়া থাকতেই
পারত না ও —
একবার মনে আছে সাতদিন ... সাতরাত ...
সে কী কান্না তোর!
খোকা বড়ো জেদি বড়ো একরোখা ছিল ...

আজ এই হোমের ছাদে উঠে
এই চাঁদে ঢাকা ছাদে এসে —
কত চাঁদ আগের সেই
মায়াময় সংসার মনে পড়ে যায়

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সেকালের কবিতা

বাঁ কু ড়া র ঘো ড়া গু লি

মাটি ক্রমে জল রৌদ্র অগ্নি সঙ্গ করে
অশ্বজন্ম পায়
দৃপ্তগ্রীবা ঘোড়াগুলি
বাজারে ভিক্ষার ঝুলি পেতে বসে থাকে
সারাদিন খোঁজে তার পিতা বা মাতাকে

জী ব ন স্মৃ তি

আমার জন্মের বর্ষ মনে পড়ে
নদীর কঙ্কালও যেন মনে পড়ে
আগুন দেবতা ছিল মনে পড়ে
দীঘি দয়া মায়া আজও মনে পড়ে
ওষধিবৃক্ষের ঘ্রাণ মনে আছে
মনস্কামনা বাঁধা ছিল গাছে
দানব ছিল না তাও মনে আছে
গৃহদেবতার মতো ঋতু ছিল
অপরাজিতার নীল ঝরে গেছে
রক্তজবার রঙে দিন কাটে

জী বি তে র প্রা র্থ না

মাঝেমাঝে যেমন আসে, ঘুমের মধ্যে এসেছিল মা
পরনে শেষ নতুন শাড়িটা।
মানুষ যাতে সুখে থাকে
বৃক্ষ ভালোবাসায় থাকে
জল আর্সেনিকমুক্ত থাকে—
উপায় কী তার? মিলিয়ে যাবার আগেই বলি মাকে।

জী য় ন গা থা

সংসার বলতে এখন মেঘের ঘুলঘুলি জুড়ে পায়রার ফোঁপানি

তুমি বারান্দায় নেই
বাগানে নেই
বাথরুমে নেই
কোনও গ্রন্থেও তুমি নেই

পালংশাকের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তোমার মাথার চুল
শাখানদীর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে তোমার মাথার চুল
নিশাচরের নখে ঝুলছে তোমার মাথার চুল
ধূপের আগুনে পুড়ছে তোমার মাথার চুল

তুমি আর কোনওদিনও জেগে উঠবে না?

বৃ ষ্টি ভা বা প ন্ন আ কা শে র নী চে

আমি ছাতা আনতে ভুলে গেছি
না কি আমার ছাতা হারিয়ে গেছে
না কি কেউ চুরি করেছে
বৃষ্টিভাবাপন্ন আকাশের নীচে
এইসব ভেবে লাভ কী!

সচিত্র সংবাদ

সত্য মিথ্যা হালফ্যাশনের সাজে যমজ বোনের মতো হাসে
ভাঙা মংলার হাট ছ'কলম-জোড়া পোড়া ঘাসে।
মাফিয়ার ছবি দেখি, দেশনেতা, তারকাও দেখি,
ফ্লাইওভারের নীচে ন্যাংটো ছেলেকে দেখে বলি—
এসবই তোদের জন্য রেখে যাচ্ছি। আম-জাম-বিছুটির বনে
তোদের খেলার জন্য স্টেডিয়াম করে দেবে কাগজে দিয়েছে।

নিরাবরণকথা

তুমি যে প্রেমের কথা বলো
তুমি যে তারার কথা বলো
তুমি যে জীবনকথা বলো
তুমি যে ঈশ্বররূপ বলো
লেবুপাতার মতো আমি সবই
হাতের তালুতে ডলে দেখে নিতে চাই।

আগুন জ্বলে

কোনও কিছুই আর আমার ভালো লাগছে না—
এ কাদের দেশ?
কোথায় গেল সেই আমাদের ঘাসের দেশ
যেখানে শুধু পাশাপাশি বসে থাকাই ঢের!
একটা বাচ্চা ছেলের চোখের মতো আকাশ
কারা পচা ডিমের মতো ঘোলাটে করে দিয়ে গেল!
দেখে দেখে
চোখে আর
জল আসে না
মেঘ ভাসে না
আগুন জ্বলে

সাক্ষরতা

তোমাকে আমার বাড়ি সেধে নিয়ে যাবো,
জানলা দিয়ে মেঘ দেখবে, টিয়া দেখবে, সপ্তঋষি দেখো।
পিতা লেখো, মাতা লেখো, ভালোবাসা লেখো,
তোমাকে অন্তর থেকে অক্ষর শেখাবো।

এই নিত্যহলদিনদীতীরে

দিদিমার মতো নদীতীর
আজ দেখি মূক ও বধির

গাছপালা সমুদ্র পাহাড়
কিছুই যথার্থ নেই আর

ভাই পোড়ে, বোন পোড়ামুখি
মার-মার শব্দ মুখোমুখি

এই নিত্যহলদিনদীতীরে
বাধ্যতামূলক আসি ফিরে

কোথাও কি কিছু নেই তবে?
আছে বাক্যে, ধানে, তিলে, যবে।

মরুভূমিতে একা

গলা শুকিয়ে কাঠ

শুধু মনে পড়ে কত করুণা লেখা হয়েছে
শুধু মনে পড়ে কত আগুন লেখা হয়েছে
শুধু মনে পড়ে কত ধুকপুকি লেখা হয়েছে
শুধু মনে পড়ে কত ধর্ম লেখা হয়েছে

ছবি : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পাগলা গাছের শেকড়

আপনার কষ্টিপাথরে ঠিক ধরা পড়ে গেছি। পত্রিকার সম্পাদনা, বিষয়ের সম্ভার, বিন্যাস, ঝরা পাতাদের ফিরিয়ে আনা পাতায় পাতায় খচিত। ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন, প্রদীপ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র— সব কিছুর টুকরো আলতো স্মৃতিই বিম্বিত হচ্ছে পত্রিকাগুচ্ছে। স্তম্ভিত বসন্তের ঋত্বিক, ভ্রামণিক, আলোকচিত্রী, সম্পাদক, স্বাপ্নিক, অক্ষরঘটক অমরেন্দ্রকে সমরেন্দ্রর অভিনন্দন। এমনি করেই আপনার সৃষ্টিবৃক্ষ পত্র-পুষ্পে-ফলে বর্ণময় মহীরুহ হয়ে উঠুক।

বৃক্ষের প্রসঙ্গে মনে পড়ল, এই সংখ্যায় আপনি পাগলা গাছের কথা খুবই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন। মোহরকুঞ্জের স্মৃতিও চারণ করেছেন। নতুন তথ্য পেলাম আপনার লেখায়। পাগলা গাছ বা Mad Tree– বৈজ্ঞানিক নাম PTERYGOTA ALTA DIVERSIFOLIA, গ্রিক ভাষায় Pterygota অর্থ Wind Shaped— বাতাসের আদরে গলে যাওয়া নিজস্ব জ্যামিতি হারানো আহ্লাদী পত্রযূথ, আর ইংরেজি Divesofilia-রও উৎস Diverse, বিচিত্রতা, যা আপনি লিখেছেন। এই গাছ বার্মা অঞ্চল থেকে ইংরেজবাহিত হয়ে বঙ্গভূমির আতিথ্য নিয়েছে। ভূমধ্যসাগরের বিন্দুসম দ্বীপে বা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ধারে মহাবৃক্ষ বাওবাবের ধ্যানভঙ্গ করছে, এই তথ্যমণি দারুণ মূল্যবান।

"মানুষের যাবার দিনের চোখ, বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ, মানুষের যাবার দিনের মন, ছানিয়ে নেবে রস।" জন্মান্তরে অবিশ্বাসীদের কাছে রবীন্দ্রনিঃসৃত এই স্তবকটিই জীবনবেদ। আপনি এই ধারারই সতত স্ফূর্ত বৈদিক।

সমর নাগ

বিধান নগর, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

৭ জুন ২০১৪

লেখকের কথা: পাগলা গাছ সম্পর্কে গূঢ় তথ্যাবলি জানিয়ে আপনি আমার মতো অনেক পাঠককেও হয়তো উপকৃত করেছেন। আপনার বৃক্ষবোধ বা উদ্ভিদবিদ্যার এক কণাও আমার নেই। আমি দেশ-বিদেশের বনে-জঙ্গলে আমাদের এই পৃথিবীর হারানো আদিমতার ঘ্রাণ নিতেই ঘুরে বেড়াই। কত গাছপালা, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ দেখে তন্ময় হয়ে যাই, কখনও কখনও আরও জানতে কৌতূহলও হয়, কিন্তু শেষ অবধি বৃক্ষজগতের বিশ্বকোষ বা কীটপতঙ্গের তথ্যগ্রন্থ আর দেখা হয় না। দিনানুদিনের

অভিশপ্ত ব্যস্ততায় মনে অজানার অন্ধকার বাসা বেঁধে থাকে। একটাই সান্ত্বনা, শহর-সভ্যতার নাগালের বাইরে জঙ্গলে বৃক্ষজীবনের স্বরূপ কিছুটা হলেও দেখা হয়।

পাগলা গাছ দেখার আশায় অবশ্য কোনও জঙ্গলে যাইনি। জিম্বাবোয়েতে জাম্বেজি নদীর ঝোপঝাড় লতাগুল্মময় পাড়ে দাঁড়িয়ে বহু দূরে চিরঝাঁপরত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দর্শন করেছিলাম। রাস্তা থেকে নদীতীরের দিকে নেমে যাবার সময় পথের উল্টোদিকে বাওবাব গাছের কাছাকাছি আর একটা যে গাছ দেখেছিলাম, সেটাই পাগলা গাছ ভেবেছি, পাতাগুলোর পারস্পরিক আকারবিভ্রাটের জন্য। সেটা কিন্তু আপনি যেমন ধরে নিয়েছেন, 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ধারে' তেমন নয়, জাম্বেজি নদীর উৎসস্থলে ভিক্টোরিয়া যেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তার থেকে অনেক দূরেই। পাগলা গাছের দ্বিতীয় দর্শনস্থলও কিন্তু 'ভূমধ্যসাগরে' নয়, আমার লেখায় দেখবেন, 'আটল্যান্টিক মহাসাগরের বুকে' এক বিন্দুসম দ্বীপে।

তবে আমার গাছপালার জ্ঞান সত্যিই শূন্য, পাগলা গাছ দর্শন কতটা নির্ভুল, কতটাই বা আন্দাজি, সে-বিষয়েও আমার বিচার অচল। ভবিষ্যতে আপনি নিজে ওই দু'টি জায়গায় ঘুরে এসে রায় দিলে তবেই ভ্রান্তি নিরসন হতে পারবে।

বুদ্ধদেব গুহ

এই চিঠি অনেকদিন থেকে লিখব ভাবছি কিন্তু ঋতুর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ ছাড়াও আমার চোখের অসুখের জন্যে লেখা পড়া প্রায় বন্ধই আছে বহুদিন হলো। যাই হোক যে কারণে তোমাকে লিখতে চেয়েছিলাম তা হলো তোমার 'বিষাদগাথা'। এমন একটি ঠাসবুনোনের সাহিত্যকর্ম অনেক দিন পড়িনি। তোমার অনেক দিন আগেই সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত হওয়া উচিত ছিল। তুমি যে এমন পাকা সাহিত্যিক তা আমার জানা ছিল না। ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখাতেও তুমি দিকপাল কিন্তু Proper Literature-এও যে তোমার এমন মহীময়তা তা আমার জানা ছিল না। প্রথম সংখ্যা থেকেই কিনে পড়ছি 'কালের কষ্টিপাথর' তোমার লেখা পড়তে পাব বলেই। বিষাদগাথা তাড়াতাড়ি শেষ কোরো না, করলে আমার মতো বহু পাঠকই বিষাদগ্রস্ত হবে। তোমার লেখা হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুরণন তুলছে। তোমার এই বই অবশ্যই পুরস্কার পাবার যোগ্যতা রাখে। আমার অগ্রিম অভিনন্দন জেনো।

হাতের লেখা এখনও অপাঠ্য আছে। চোখ কবে ঠিক হবে জানি না।

শুভার্থী ইতি,

বুদ্ধদেব গুহ, *কলকাতা-৭০০ ০১৯*

২৩ এপ্রিল ২০১৩

পশ্চিম সাগরতীরে শেষ প্রশ্ন

আপনার 'কবিতা-পরিচয়' (সংকলন) পড়ছি। খুব ভালো লাগছে। আর সেই সঙ্গে নিজের মনে বিদগ্ধজনদের প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু কিছু রচনা লিখে চলেছি। বইটিতে 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটির দুইজন দিকপালের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে আমি কবিতাটি নতুন করে বুঝলাম। শঙ্খদা লিখেছেন, 'সমস্ত কবিতার নিঃশ্বাসের জন্য এই সূর্যাস্তই তৈরি করতে পারে উপযুক্ত আবহ এবং প্রতীক, যে-প্রতীক আবার একই সঙ্গে ব্যক্তি আর ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের। এ-বিষয়ে আরো অবশ্য ভাবতে হবে আমাদের, দেখতে হবে কোন্ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে কবিতাটির স্বরে, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হবে শব্দপরম্পরার এই কৌশল কতটা ধরতে পারল সেই স্বরভঙ্গি।' আমি, এই খোঁজে গিয়ে মনে হচ্ছে, এমন কিছু পেয়েছি যা আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারছি না কারণ এর মূলে রয়েছে আপনার সম্পাদিত এক অসামান্য পত্রিকা। আমার ব্যাখ্যাটির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে অন্তিমশয্যায় শুয়ে কবি নিজের জীবনের মূল্যায়ন করছেন, যেমন সঙ্গের 'প্রশ্ন' কবিতায় তিনি জানতে চেয়েছেন নক্ষত্রলোকের প্রতিতুলনায় জলবিম্বসম মানবজীবনের সার্থকতা 'কোন কাজে' লাগে?

'প্রথম দিনের সূর্য': রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় শয্যাশায়ী কবি তাঁর মনের এক

গভীর বেদনাকে মুক্তি দিয়েছেন।

প্রথম স্তবক: পশ্চিম তার আসন্ন যুদ্ধোলিপ্ত জীবনে নিতান্ত আকস্মিকভাবে কবির গীতাঞ্জলি-কাব্যে শান্তি ও বিশ্বাসের ভূমি পেয়ে যায় এবং কবি ইয়েট্‌স্‌-এর আগ্রহাতিশয্যে পশ্চিমদেশ কবিকে সাহিত্যসম্মানশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে পরবর্তী জীবনে কবির সাহিত্যকৃতির প্রতি পশ্চিমজগৎ সেই ইয়েট্‌স্‌ মাধ্যমেই উপেক্ষা দেখিয়ে গেল। অন্তিমশয্যায় শুয়ে অশক্ত শরীরে অভিমানী কবি জানতে চাইছেন তাহলে কোন দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে অতটা মর্যাদায় পশ্চিম তাঁকে ১৯১৩-তে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল? একটি সন্দেহ তাঁর মনকে ক্লিষ্ট করছে যে তাঁর নূতন সত্তার প্রতিষ্ঠা নিতান্তই যুক্তিছাড়া এক হঠাৎ-প্রাপ্তি। কবির কাছে এতদিন এই প্রাপ্তি নিতান্তই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক মনে হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাক্রম আজ তাঁকে অন্য ভাবনায় নিয়ে যাচ্ছে তাই তিনি নতুন করে তাঁর সেই বিশ্বসভায় উল্লেখযোগ্য প্রথম কবি-সত্তার পরিচিতির প্রতি পশ্চিমের আদরের মূল্যায়ন করতে বসেছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত নন। এত ভাবনা-চিন্তার পরও তাঁর উত্তর মিলল না। ('মেলেনি উত্তর'— এর দু'রকম অর্থ হতে পারে— (এক) উত্তর পাননি, (দুই) যে উত্তর মনে মনে পেয়েছেন সেটি ঠিক নয়। সেটি সঠিক উত্তরের সঙ্গে মেলেনি।)

দ্বিতীয় স্তবক: রোগশয্যায় শুয়ে কবি শেষবারের মতো বুঝে নিতে চান যে, যে-পশ্চিমকে তিনি এত মান্যতা দিয়েছেন সেই পশ্চিম সত্য সত্যই তাঁকে কতটা সম্ভ্রম করে থাকে। (একসময় তাঁর হিতৈষীরা তাঁকে বিদেশভ্রমণে নিরস্ত করেছিলেন কারণ ইংরাজের প্রচার ছিল তিনি হিটলারের গুপ্তচর।) কিন্তু তাঁর মন এখানেও দ্বিধাপীড়িত। তাঁর মনে হচ্ছে পশ্চিম তাঁর সম্পর্কে কিছুটা যেন উদাসীন। এই বেদনা আবার পুরোপুরি মেনে নিলে পশ্চিমি নিকট বন্ধুদের প্রতি অবিচার করা হয়। তাই মন হ্যাঁ বা না কোনও উত্তরই 'পেল' না। কবি কিছুতেই তাঁর সেই অপমানবোধ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না— যে জন্য এই কবিতায় 'প্রথম দিনের' সত্তা প্রচ্ছন্ন ভাবে এবং 'শেষ প্রশ্ন' সোচ্চারে 'পশ্চিম সাগরতীরে' উপস্থিত। কবি মনে করেছেন পশ্চিমের কাছে তাঁর আরও কিছু প্রাপ্য ছিল যা তিনি পাননি— এই কবিতায় সেই অপূর্ণতার প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। শঙ্খদা কিংবা আইয়ুব স্যর কেউই 'পশ্চিম সাগরতীরে' নিয়ে শব্দব্যয় করেননি।

রণধীরকুমার দে, *প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোড, গল্ফ গার্ডেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৬*
২৪ মে ২০১৪

প্রসঙ্গ মার্কেজ

প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার পাঠক। প্রকৃত সাহিত্যপত্রিকা বলতে যা বোঝায়, এই সময়ে তার একান্ত অভাব। সেই হিসেবে 'কালের কষ্টিপাথর' যেন সাহিত্যের মরূদ্যান। পত্রিকার প্রত্যেকটি লেখাই অত্যন্ত যত্ন নিয়ে নির্বাচন করেন ও ছাপেন আপনারা। ফলে ইতিমধ্যেই পাঠক মহলে এই পত্রিকাটির একটি স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের মৃত্যুর পর গত জুন ২০১৪ সংখ্যায় তাঁরই একটি সাক্ষাৎকারের বাংলা অনুবাদ ছেপে আপনারা যেভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন তা এককথায় অভিনব। এই সাক্ষাৎকারটিও আগে কখনও পড়িনি। ফলে, মার্কেজের একাধিক উপন্যাসের গড়ে ওঠার নেপথ্যে যে কাহিনি, তা জেনে অনেক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট উপন্যাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গিয়েছে। মার্কেজ তাঁর কিংবদন্তিসম জনপ্রিয়তা নিয়ে যে কতখানি বিব্রত ছিলেন, তাও জানতে পারলাম। বিশ্ববাজারে মার্কেজ নামটাও যে ধনতান্ত্রিক দেশের সুবাদে একটা পণ্য এটা উপলব্ধি করে তাঁর যে ব্যক্তিগত অনুভব, অর্থাৎ যে-লাইনটি সাক্ষাৎকারের শিরোনাম ('বইগুলো মৃত্যুর পর প্রকাশ পেলে খুশি হতাম')— সত্যিই মন ছুঁয়ে গেল। সেইসঙ্গে কিছু বেদনাও থেকে গেল, এই পণ্যময় পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই অসহায়তার কথা মনে করে। সেইসঙ্গে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাতভর 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড' পাঠের যে পোস্টারটি ছাপা হয়েছে এই সংখ্যায়, সেটিও অদেখা।

ড. অমল কে ভৌমিকের 'লৌকিক প্রবাদে গাণিতিক উপাদান'ও অত্যন্ত উপভোগ্য লেখা। বাংলার লৌকিক জীবনে আলো ফেলার লোক দিন দিন কমে আসছে। তাছাড়া নাগরিক সংস্কৃতি এবং বিশ্বায়িত পৃথিবী যেভাবে থাবা ফেলছে আমাদের জীবনযাত্রার ওপর তাতে স্বতন্ত্র লৌকিক জীবন বলতে সত্যিই আর কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা সেটাই একটা বড় প্রশ্ন। সেই দিক থেকে সংশ্লিষ্ট রচনাটি একটি নথি হয়ে থাকল বলা চলে।

আরও একটি লেখার কথা না বললেই নয়। সেটি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'ভ্রমণে ভূমিকম্প'।

'কালের কষ্টিপাথর'-এ 'কেন লিখি' শীর্ষক রচনা আগেও পড়েছি। ব্যাপারটা বেশ অভিনব। এ সংখ্যায় পেলাম আমার প্রিয় কবি মণীন্দ্র গুপ্তর লেখা। কবির লেখা পড়ে কবির জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, এমনকী তাঁকে কেমন দেখতে হতে পারে, সে সম্পর্কে সত্যিই আমরা কত ছবি-ই না মনে মনে ভেবে নিই। কিন্তু পরে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সেই ভাবনাটা নাও মিলতে পারে। সেটাই আশ্চর্য গদ্যে বর্ণনা করেছেন সুরসিক মণীন্দ্রবাবু। পড়ে ভালো লাগল। এবং সেইসঙ্গে ফের মনে পড়ে গেল এই সংখ্যারই গোড়ার দিকে ছাপা হওয়া গার্সিয়া মার্কেজের সাক্ষাৎকারটির শেষের দিকের একটা অংশ। যেখানে উনি বলছেন, 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড' নিয়ে তিনি কখনও সিনেমা করার অনুমতি দেবেন না। কারণ, বহুপঠিত এই উপন্যাসটি পড়ার সময় পাঠক তাঁর মতো করে মনে মনে চরিত্রগুলির ছবি এঁকে নেন। সিনেমায় চলচ্চিত্র পরিচালকের একক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপায়িত চরিত্রগুলি তার সঙ্গে মিলতে নাও পারে।

আসলে 'কালের কষ্টিপাথর'-এর একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে লক্ষ করেছি, এতে ছাপা হওয়া যে-কোনও লেখাই মনের মধ্যে অনেক রকম প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়। ভাবনার রসদ যুগিয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'কেন লিখি' পর্যায়ে ছাপা হওয়া এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সাহিত্যিক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সরল দে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের লেখাগুলিও খুবই সুন্দর এবং অর্থবহ।

এই সংখ্যায় ছাপা হওয়া, নাসের হোসেনের চারটি কবিতাই মন ছুঁয়ে গিয়েছে। প্রচ্ছদটিও অত্যন্ত শিল্পসম্মত। পরিশেষে বলি, আপনারা আমার ধন্যবাদ পাবেন এই সংখ্যাটি আমার প্রিয় কবি মণীন্দ্র গুপ্তকে উৎসর্গ করায়। ওঁর লেখা নতুন কবিতা অদূর ভবিষ্যতে 'কালের কষ্টিপাথর'-এ দেখতে পাব, এই আশা রেখে শেষ করলাম।

মহুয়া দত্ত, *ডানকুনি, হুগলি*
৬ জুন ২০১৪

কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

৯

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারটুলি স্ট্রিট

দেবীপক্ষে তৃতীয়ার বিকেলে কুমারটুলি গিয়ে দেখি— একেবারে জমজমাট। কাছে-দূরের মণ্ডপে প্রতিমা রওনা হচ্ছেন- সেই যাওয়াকে ঘিরেই যেন এক আগাগোড়া উৎসব। বনমালী সরকার লেনের গলিটি সরু এবং বাঁকা। তাতে কী? ওই চওড়ার মধ্যেই সবার জন্য জায়গা ছেড়ে চলাচলের একটা স্টাইল গড়ে উঠেছে। গলির মুখে সাজের দোকান। প্রতিমার মাথার চুল, গায়ের বসন, চাঁদমালা। বাঁদিকে অস্ত্রের দোকান— খাঁড়া থেকে ত্রিশূল— ধাতুর পাতলা চাদর কেটে তৈরি। আজ আরও জুটেছে মানুষের ঘাড়ে অস্থায়ী দোকান— দেবী ও দেবতাদের মধ্যে মাথার চক্র বিক্রি হচ্ছে— লাল হলুদ কাগজ দিয়ে তৈরি।

(বড় পুজোর জোগাড়-যন্ত্র/কলকাতার প্রতিমাশিল্পীরা: অনিতা অগ্নিহোত্রী)

অনিতা অগ্নিহোত্রীর বইটা পড়তে পড়তে জেনে ফেলছিলাম কুমোরটুলির মানুষজনের রোজনামচা। লেখিকা বড় হয়েছিলেন কলকাতার যে-জায়গায় তার অনতিদূরে ছিল কালীঘাটের মৃৎশিল্পীদের বসবাস, মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ, সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মৃৎশিল্পীদের আর এক তীর্থ কুমোরটুলির মানুষদের কথা জানতে।

সেই কাহিনি পড়তে গিয়ে আমার জানার ইচ্ছে হল আরও একটু আগের কথা। কীভাবে একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল কুমোরটুলি।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দেখতে পাই ১৭৫৮ সালে লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাব অনুসারে সূচনা হয় নতুন কেল্লা নির্মাণের। সেই কেল্লা বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নয়, গোবিন্দপুরে গড়ে ওঠা কেল্লাটি আর নেই। কিন্তু যে-স্থানে কেল্লা গড়ে উঠবে বলে ভাবা হল সেখানে তখন এক বিশাল বসতি। আর নতুন নির্মাণ মানেই উচ্ছেদ। তখন তো এখনকার মতো কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না যে, উচ্ছেদ হলেই প্রতিবাদ হবে, অবরোধ হবে। অতএব সরকারের নোটিস পেতে তারা নিজেদের বসতবাড়ি ভেঙে দিয়ে চলে গেল নতুন বসতির খোঁজে। তাঁরা কেউ চলে গেলেন উত্তর কলকাতায়, কেউ মধ্য কলকাতায়। তখনও দক্ষিণ কলকাতার বসতি গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু অধিবাসীরা একেবারে বঞ্চিত হয়েছিলেন তা নয়। উচ্ছেদের সঙ্গে দাবি ছিল ক্ষতিপূরণ। নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন রেস্টিটিউশন মানি বা ক্ষতিপূরণের টাকা, তার উদ্বৃত্তাংশ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেওয়া হয় গোবিন্দরামপুরের অধিবাসীদের। সেই অর্থ পাওয়ার পর অধিবাসীরা উত্তর ও মধ্য কলকাতার যে-সব জায়গায় বসতি গড়েছিলেন তাদের কোনওটা তালতলা, কোনওটা শোভাবাজার, কোনওটা কুমারটুলি।

কিন্তু কুমারটুলির নাম তখন কুমারটুলি ছিল না। কুমারটুলি নামকরণের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

১৮৭৬ সালে যখন আদমশুমারি শুরু হয়, তখন মানুষের সংখ্যা গোনার সঙ্গে সঙ্গে চালু হল তাঁদের পেশার কথা লেখা। যিনি জনগণনার দায়িত্বে ছিলেন সেই মি. বিভার্লি আদমশুমারির পেশার তথ্য বিশ্লেষণ করে জানালেন উত্তর কলকাতায় একটি অঞ্চলে বহুসংখ্যক মানুষ জীবিকা অর্জন করেন মাটির প্রতিমা গড়ে। পেশায় তাঁরা কুম্ভকার। প্রচলিত নাম কুমোর।

সেই আবিষ্কারের ফলে এলাকাটা পরিচিত হয়ে গেল কুমারটুলি নামে। কালক্রমে রাস্তাটা কুমারটুলি স্ট্রিট।

সেই যুগে প্রতিমা নির্মাণের কারিগরদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন গোপেশ্বর পাল, লোহারাম পাল, হরিপদ পাল, মধুসূদন পাল, নিতাইচরণ পাল ইত্যাদি। তাঁরা প্রতিমা তৈরির যে ঐতিহ্য শুরু করে গিয়েছিলেন, আজ এত বছর পরেও অটুট রেখেছেন তাঁদের উত্তরাধিকারীরা। আজও কুমারটুলি মানেই প্রতিমাশিল্পীদের বাস। এখন সেই বংশের পুত্র-পৌত্ররা কেউ স্বশিক্ষিত, কেউ কেউ পড়েন সরকারি আর্ট কলেজে ও তাঁদের মৃৎশিল্পকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন এক অসাধারণ উচ্চতায়। আর্ট কলেজে পড়া পটুয়াপাড়ার সুধীর পাল, কিংবা মোহনবাঁশি রুদ্রপালের কাজের ঘরটিকে তাঁরা এখন বলেন 'স্টুডিও', নামী চিত্রশিল্পীরা তাঁদের আঁকার ঘরটিকে যেমন বলেন।

কিন্তু সে সময় কুমারটুলিতে বাস করতে শুরু করলেন আরও বহু নামীদামি মানুষ। বহু বিচিত্র পেশার মানুষও। যেমন গোবিন্দরাম মিত্র, নীলাম্বর সেন, বনমালী সরকার— যাঁরা প্রত্যেকেই সেকালের কলকাতার এক-একজন নামী মানুষ। তাঁরা নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন কলকাতার ইতিহাসের এক-একটি অধ্যায়।

তবে যেহেতু কুমারটুলি নিয়ে এবারের এই লেখা, তাই প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিই সেকালের মৃৎশিল্পী গোপেশ্বর পালের সঙ্গে। তাঁর জন্ম কৃষ্ণনগরে, যে-শহরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে মৃৎশিল্পের বিচিত্র কারুকাজ। গোপেশ্বর ছিলেন উচ্চাভিলাষী,

তরুণ বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন জীবিকার সন্ধানে, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে কাজ পেলেন রানিগঞ্জে বার্ন কোম্পানির পটারি ওয়ার্কসে। সেখানে তার হাতের কাজ দেখে আকৃষ্ট হন এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী। তিনি তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়, সেখানে তাঁর সহায়তায় গোপেশ্বর স্থাপন করলেন একটি শিল্পশালা। তাঁর উত্থানের সেই শুরু, অচিরেই তিনি আরও নানাজনের প্রশংসা কুড়োনোর ফলে সুযোগ পেলেন ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে যোগ দেওয়ার, তখন ১৯২৪ সাল। সেখানে পৌঁছে নানাজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, এভাবেই একদিন সুযোগ পেলেন ডিউক অফ কনটের পোর্টেট আঁকার। তাতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কিছুকাল পরে দেশে ফিরে এসে সুযোগ পেলেন কলকাতার টাউন হলে এক সভায় যোগ দিতে যেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে তাঁর একটি পোর্টেট এঁকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন গোপেশ্বর। এই মৃৎশিল্পীই দীর্ঘকাল ধরে তৈরি করেছেন কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা।

একালের নামী শিল্পীদের কথা সবিস্তারে বলেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, তাই চলে যাই সেকালের অন্য পেশায় খ্যাত মানুষজনের কথায়।

তখন একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত ছিল, গোবিন্দরামের ছড়ি/বনমালী সরকারের বাড়ি /উমিচাঁদের দাড়ি।

উমিচাঁদের নাম খ্যাত নবাবের বাংলা হারানোর কাহিনির সঙ্গে। কুমারটুলির সঙ্গে জড়িত অন্য দু'জন, গোবিন্দরাম মিত্র ও বনমালী সরকারের।

এই দুই বিখ্যাত 'বাবু'র মধ্যে এক অলিখিত প্রতিযোগিতা ছিল অট্টালিকা নির্মাণের। দু'জনেই তৈরি করেছিলেন দু'টি বিখ্যাত বাড়ি যা ছিল তখনকার কলকাতার দু'টি অবশ্যদর্শনীয় স্থান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'বাবু'দের মধ্যে বৈভব প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলত তা আমরা জেনেছি নানা সূত্রে। কুমারটুলির এই দুই বাসিন্দার মধ্যেও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রথম জন গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলির বাসিন্দা, তিনি ছিলেন গভর্নর হলওয়েল সাহেবের ডেপুটি। পেশায় তিনি ডেপুটি জমিদার, কিন্তু লোকে বলত ব্ল্যাক জমিদার। তাঁর তখন এমন প্রতাপ ছিল যে, তাঁর নাম শুনলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হত চোর-ডাকাতদের। তাঁর হাতে সর্বক্ষণ ধরা থাকত একটি লিকলিকে ছড়ি। ছড়ির জোরই ছিল তাঁর দাপট।

কুমারটুলিতে তাঁর ছিল প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা। মন্দিরসহ বাড়িটির নাম ছিল নবরত্ন। তখন একরত্ন, নবরত্ন, পঞ্চরত্ন ইত্যাদি মন্দিরের প্রচলন ছিল। রত্ন বলতে বোঝায় চূড়া। ঢালু ছাদ ও কার্নিসযুক্ত মন্দিরের ওপরে চূড়া বসিয়ে নির্মিত হত রত্ন-মন্দির। যতগুলি চূড়া তত-সংখ্যক রত্ন। একটি চূড়া থাকলে তা একরত্ন। তার চারকোণে আরও চারটি চূড়া থাকলে তা পঞ্চরত্ন। মধ্যস্থলের চূড়াটির জায়গায় একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে তার ওপরে যদি চারটি চূড়া বসানো হয়, তবে মোট চূড়ার সংখ্যা হয় নয়, তাই সেই মন্দিরকে বলা হয় নবরত্ন। গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়িটিতে ছিল নয়টি চূড়া। তাঁর মন্দিরটির সবচেয়ে উঁচু চূড়াটি 'নাকি' ছিল অক্টারলোনি মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু। কলকাতার পূর্বতন এক কালেক্টর বলেছিলেন নবরত্নের চূড়ার উচ্চতা একশো পঁয়ষট্টি ফুট। বাড়ির ভিতরে ছিল একটি দোচালা মন্দির। এই মন্দিরকে বলা হত নবরত্নের জগমোহন। পলাশি যুদ্ধের কুড়ি বছর আগে, ১৭৩৭ সালে কলকাতার বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এক মহাঝড়ে। তাতে ভেঙে পড়েছিল নবরত্নের চূড়া। পরে তা পুনর্নির্মিত হলেও চূড়ার সেই খ্যাতি আর ধরে রাখা যায়নি।

সেই বিখ্যাত অট্টালিকার গগনভেদী স্পর্ধা না-থাকলেও রয়ে গিয়েছে সেই বাড়ির পেন্টিং। উইলিয়াম হিকি ও ড্যানিয়েলদ্বয়ের আঁকা ছবিতে দেখা যায় যে অট্টালিকাটি, সেটি একটি বিশালাকায় পঞ্চরত্ন। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন তাঁর বাড়িটি ছিল পঞ্চরত্নই, নবরত্ন নয়।

এই গোবিন্দরাম মিত্রই নির্মাণ করেছিলেন বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন, সেসময় কলকাতার বহু বিশিষ্ট মানুষ সপরিবারে পালিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার বসতবাড়ির মায়া ত্যাগ করে, কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্র নিজের বসতিতেই ছিলেন, তিনি কিছুতেই চাননি তাঁর অতিযত্নে ও প্রভূত ব্যয়ে নির্মিত বাড়িটি ধ্বংস হোক নবাবের সৈন্যদের হাতে। কোম্পানির বরকন্দাজ ও সিপাহিদের সহায়তায় প্রতিহত করেছিলেন নবাবের আক্রমণ।

যাই হোক, গোবিন্দরাম মিত্র তাঁদের বসতবাটির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন চার লক্ষ বারো হাজার ছশো আশি টাকা। ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন মাত্র সাঁইত্রিশ হাজার ছশো আশি টাকা। তাঁর ক্ষতিপূরণ কম পাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল তিনি কোম্পানির সহায়তায় রক্ষা করেছিলেন সম্পত্তি, তাই—

কুমারটুলির আর এক বিখ্যাত বাসিন্দা ছিলেন বনমালী সরকার। বনমালী সরকারের মতো প্রাসাদতুল্য বাড়ি সেকালের কলকাতার আর কারও ছিল না। গোবিন্দরাম মিত্রের সঙ্গে টেক্কা দিয়েই তাঁর এই প্রাসাদ নির্মাণ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবের মন্দিরটি টেরাকোটা মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অলিন্দবিহীন ত্রি-খিলান এই মন্দিরটির সাবেক প্রবেশপথের ওপরে ছিল কয়েকটি গুণিতক চিহ্নের মতো পোড়ামাটির ফলক। পোড়ামাটির আরও নানা কারুকাজ করে দর্শনীয় করে তোলা হয়েছিল মন্দিরটি। সেই সঙ্গে ছিল সাহেবের তামাকসেবন বা মেমসাহেবের মূর্তি। মন্দিরটির এই প্রবেশপথটি পরবর্তীকালে বন্ধ করে দেওয়া হয় একটি পাঁচিল তুলে। ফলে মন্দিরের নীচের দিকের ফলকসজ্জা ক্রমে বিনষ্টের পথে। ২/৫ বনমালী সরকার স্ট্রিটের আটচালা মন্দিরটি এখন সংস্কারের অপেক্ষায়।

কুমারটুলির সঙ্গে জড়িয়ে আর এক বিখ্যাত বাসিন্দা নীলাম্বর সেনের নাম। তৎকালীন ঢাকায় একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত ছিল 'নীলাম্বরের বড়ি, গণি মিক্সার ঘড়ি'। ঢাকার নবাব গণি মিক্সার একটি বিশাল ঘড়ির খ্যাতি ছিল সঠিক সময় দেওয়ায়, তেমনই বিখ্যাত চিকিৎসক নীলাম্বর সেনের খ্যাতি তাঁর বড়িতে। তিনি ছিলেন সেকালের ধন্বন্তরী।

ঢাকা থেকে নীলাম্বর সেন পুত্র গঙ্গাপ্রসাদকে নিয়ে আসেন কুমোরটুলিতে, বসবাস শুরু করেন শোভাবাজার রাজবাড়ির গঙ্গাতীরস্থ আটচালায়। নীলাম্বরের বয়স তখন নব্বই, গঙ্গাপ্রসাদের বয়স উনিশ।

নীলাম্বরের তখন এতই খ্যাতি যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ বিখ্যাত মানুষরাও চিকিৎসা করাতে আসতেন নীলাম্বর সেনের কাছে। কিন্তু কলকাতায় আসার দু-বছর পরে প্রয়াত হন নীলাম্বর সেন। বাবাকে মৃত্যুশয্যায় দেখে তরুণ গঙ্গাপ্রসাদ কাঁদছেন, তখন নীলাম্বর বলে গিয়েছিলেন, 'তোমাকে যে বিদ্যা শিখিয়েছি, তাতে তুমি ভারতখ্যাত চিকিৎসক হবে।'

গঙ্গাপ্রসাদ পরে সত্যিই খ্যাতনামা চিকিৎসক হয়েছিলেন। ১৬ ও ১৭ নম্বর কুমোরটুলি স্ট্রিটের জমি কিনে তিনি নির্মাণ করেছিলেন নিজ বসতবাটি ও দুর্গাদালান। দুর্গাদালানের কারুকার্য করেছিলেন কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী যদুনাথ পাল। তিনিই প্রতি বছর প্রতিমা গড়তেন এই দুর্গাদালানে। খুবই বিখ্যাত ছিল সেই দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে নানা উৎসবের সূচনা করেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। তাঁর পুত্র-পৌত্ররাও অব্যাহত রেখেছিলেন সেই উৎসব। তাঁর পুত্র ভগবতীপ্রসন্ন সেনের সময় 'কুরুক্ষেত্র' অবলম্বনে লেখা যাত্রাপালা দেখতে এসেছিলেন কবি নবীনচন্দ্র সেন। আবার ভগবতীর পুত্র গিরিজাপ্রসন্ন সেনের উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু।

কুমারটুলি স্ট্রিট আজও বহু দেশি-বিদেশি পর্যটকের দ্রষ্টব্যস্থান।

ছি ন্ন বি চি ন্তা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঙ্গামাঙ্গা রেল স্টেশন

পর্ব: ৫

> ক্ষীণ আলো দুলিয়ে মন্থর
> একটা গোরুর গাড়ি।
> তার ছইয়ের মধ্যে
> কোনওরকমে ঢুকে শেষ
> পর্যন্ত যেখানে গিয়ে
> পৌঁছনো, তাকে বলা হয়েছে
> ম্যাজিক রিয়ালিজমের
> দেশ, সে বাস্তবও বটে
> কিন্তু আপনার
> অনধিগম্য বাস্তব।

যোগীনদাদাকে মনে আছে?

ডেরাস্মাইলখাঁয়ের সেই যোগীনদাদা? মিলিটারি জরিপের কাজে পশ্চিমের গাঁয়ে-শহরে অনেক ঘুরতে হয়েছিল একসময়। কী কাণ্ড দেখ! একবার চলেছেন ট্রেনে চেপে। ছন্দৌসির গাড়ি— হোসিয়ারপুর পেরিয়ে গেল, রাত দেড়টায় ছাড়ল সরহরোয়া স্টেশন, ভোর থাকতেই বুলন্দশর আম্লোলিসর্সার পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এসেছে, ভারি খিদে পেয়ে গেল যোগীনদাদার। এক ঠোঙা পকৌড়ি আর মটরভাজা খাচ্ছেন স্টেশনে নেমে— কোত্থেকে হঠাৎ লোকলস্কর বিশ-পঁচিশটা হাতি নিয়ে জৌনপুরের মন্ত্রী এসে মাথায় মস্ত তাজ চড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে, যুবরাজ আর কতকাল তোমার মোতিমহল ছেড়ে থাকবে? সঙ্গে সঙ্গে বিপুল রবে রামশিঙা আর ঝাঁঝর বেজে উঠল।

আসলে ব্যাপার হয়েছে, রাজপুত্র আজ তেরো বছর পুরী-ছাড়া। নাথদোয়ারার সেগুনবনে শিকারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আর ফেরেননি। কত খোঁজ করা হল— পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, লালামুশায়, লুধিয়ানায়, চঙ্গামঙ্গায়, সরাই আলমগিরে, রাওলপিণ্ডিতে— কেঁদে কেঁদে রানির দু-চোখ অন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মাস-পাঁচ আগে একদিন হাংরাশ জংশনে নেমে যোগীনদাদা পাউরুটিতে সবে কামড় বসিয়েছেন, হঠাৎ সেলাম করে এসে দাঁড়াল জৌনপুরের চর, রাজাসাহেব, কঁহা আপকা ঘর? অমন আকস্মিক সম্মানের মুখে নিজের পরিচয়টা দিতে কুণ্ঠাই হয়েছিল। চর ফিরে গেল গভীর সন্দেহ নিয়ে। এতগুলো রাজলক্ষণ যার দেহে, সে রাজপুত্র না হয়েই যায় না।

তারপরেই এই ঘটনা। দেখতে দেখতে ঘিরে ফেলেছে গোর্খা ফৌজ, চেয়ে দেখেন স্টেশন ছেয়ে গেছে আফগান আর শিখে। তাঁকে নিয়ে গেল ইটার্সিতে, সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছমনঝোলায় চাপিয়ে দিল দশ কাহারের ঝোলায়, আরও পঁচিশ কাহার চলেছে পাশে পাশে। ভাটিণ্ডাতে দাঁড় করিয়ে খেতে দিল আমের শরবত, তারপর সেখান থেকে সোজা জৌনপুর। তখন বেলা এক প্রহর, রোদ্দুর পড়ে এসেছে।

তারপরে কী হল?

তারপরে কী হল সে তো জানা নেই। তবে এখন যোগীনদাদা জমিয়ে বাচ্চাদের গল্প শোনাচ্ছেন। আর সে গল্পের আসরে তাদের হাজিরা যাতে নিয়মিত হয় তার জন্য ঢালাও ঘুষ দিচ্ছেন— কাউকে মার্বেল, কাউকে গণেশের ছবি, আবার কাউকে লজঞ্জুস।

করুন যা খুশি। কিন্তু এক-একটা স্টেশনের কথা যে বললেন তার নামেই যেন ঘোর লেগে যায়। রাজার লোকেরা যখন খুঁজতে খুঁজতে লালামুসা লুধিয়ানা পার করে এসেছে চঙ্গামঙ্গা— চনমন করে উঠল মনটা। কেন? না, যোগীনদাদাকে পাওয়া যাবে সম্ভাবনাতে নয়, সে অন্য আর-একটা আরেক রকম জায়গা, বোধ হয় সেই কারণে। পরিযায়ী পাখি উড়ে চলেছে অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে। সেখানে ঝিলে আছে তাপ, পাড়ে অনুপদ্রুত নীড় বাঁধার আরও সুবিধা। নাও থাকতে পারে, তবু ভিন্ন অচেনা দেশে থাকে অনেক প্রত্যাশা। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, আমি সুদূরের পিয়াসী। কোথায়, কতদূরে সে সুদূর? তাঁর নিজেরও হয়তো জানা নেই।

তবু ক্লান্তিকর জুগুপ্সাউদ্রেকী এই স্থান-কাল ছেড়ে আর কোথাও চলে যাওয়ার একটা চোরা ইচ্ছা অনেককেই খোঁচা দেয় কখনও কখনও। যদিও বিবেকী কবির কটাক্ষও আছে এর ওপরে: 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।'

ওপারও হয়তো এপারেরই মতো, তবু রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিতে দেখি গৌলবর্জিনী পড়ে বিনি চোখের জল ফেলেছিলেন: 'আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত। সে যে মধুর মরীচিকা এই বিভ্রম-বোধ অনেক পরের। যৌবন বয়সেও পোষ-মানা, শিষ্ট, অলস দেহ। ক্লিষ্টগতি, স্তন্যপায়ী জীবের সদৃশ গৃহগতপ্রাণ অন্নপায়ী বঙ্গবাসীর জীবনযাত্রায় তিক্ত হয়ে লিখেছেন, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, সেই 'ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি' বর্শা হাতে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়া।— এই বিপরীত জীবন যেন অনেক স্পৃহনীয়। দুটিই উনিশ শতকীয় অভিলাষ।

পিয়ের লোতি

উনিশ শতকে ফরাসি নাভাল অফিসার, ঔপন্যাসিক ও প্রসিদ্ধ ভ্রমণিয়া পিয়ের লোতি অনেক ভ্রমণ-বিবরণের বই লিখেছিলেন— মরক্কো তাহিতি জেরুসালেম তুরস্ক জাপান এবং ভারতও আছে তার মধ্যে। অধিকাংশত সচিত্র সে সব ভ্রমণকাহিনিতে ভিন্ন দেশের রমণীয় দৃশ্য ও কৌতূহলকর লোকযাত্রার বিবরণ তাবৎ পাঠকের মনেই মধুর মরীচিকা বিস্তার করত। আমাদের এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ের লোতির বই থেকে 'ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' অংশত অনুবাদ করেছিলেন। যে সময়ে ওসব লেখা সে সব স্থান তখন পাঠকের অনায়াসগম্য ছিল না। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের আচার-ব্যবহার জানাও ট্যুরিস্টদের সময়ে কুলাবে না।

আশ্চর্য, ভিন্ন দেশ থাকতে হবে আপনার বাসঘরের কাছেই, সে মায়াদেশ আবিষ্কার করে নিতে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' মনে আছে? জিনিসে-মানুষে ঠাসাঠাসি একটা দিশি বাসে মোটে ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা। জনহীন স্টপেজের সামনে একটা নিচু জলার মতো জায়গা দিয়ে ঘর্ঘর শব্দ তুলে বাস চলে গেল। বিকেলসন্ধের ঘনায়মান অন্ধকারে সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে সেখান থেকে ক্ষীণ আলো দুলিয়ে মন্থর একটা গোরুর গাড়ি। তার ছইয়ের মধ্যে কোনওরকমে ঢুকে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে পৌঁছনো, তাকে বলা হয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজমের দেশ, সে বাস্তবও বটে কিন্তু আপনার অনধিগম্য বাস্তব। তার ঘোর আপনাকে পরবশ করে নিয়ে যাবে সেখানে। সে যেন জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে ক্রীতের কোম্বনা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোক। কিংবা অতীতের জীবিত বিধ্বংস। সব স্বাভাবিক বাস্তব এখানে, এমনকী যামিনীর পরিস্থিতি, গারসিয়া মার্কেসের মাকোন্দো গ্রামের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপও এখানে নেই, শুধু পুরাতন ক্ষয়িত একটুকরো দৃশ্য-পরিস্থিতি জাগ্রত করে তোলা যা শুধু দু'ঘণ্টা বাসরাস্তার দূরত্বে কিন্তু সে যে কোথাকার কোন রুটের বাস এই প্রহেলিকার মধ্যে এর কৌতূহলকর ভিন্নতাবোধ যেখানে ঘুরে আসার রোমাঞ্চ প্রস্তুত করেছে গল্প।

তেলেনাপোতা ঠিক আর-এক নয়। আপন পরিস্থিতিরই ভাঙাচোরা পুরাতন। ভাঙাচোরা সারিয়ে পূর্ণাবয়ব করে তোলা যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসে, যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নয়-দশ শতকের বাংলাদেশ পুনর্গঠন করেছেন 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে। সে নয়-দশ শতকের বাংলা কবি ও তাঁদের লেখা তিনিই সন্ধান করে এনেছিলেন। এ হল ফিরে যাওয়া। যদিও ফিরে যাওয়ার যে আধুনিক আতুরতা, হরপ্রসাদের লেখায় তা নেই। পিয়ের লোতি যা তাঁর সগোত্রদের লেখা মার্কো পোলো ইবন বতুতার পরিশিষ্টের মতো। নতুন নতুন দেশ, সেখানকার নিসর্গ আর লোকজন এবং তাদের আনন্দের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সে বিবরণ। আর এক দেশ দৃশ্য লোকযাত্রার বৈচিত্র আমাদের আকর্ষণ করে, কিছুদিনের জন্যও স্থানান্তরের রোমাঞ্চে আমাদের লোভ আছে, এই দুর্বলতা ভরসা করে দেশে দেশে ট্যুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে।

এমন দুনিয়া আজ কি আর মিলবে কোনওখানে? শিল্পবিপ্লব আর পুঁজিবাদী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর-পাঁচটা দেশের মতো আশ্চর্য অলৌকিক যে প্রাচ্যদেশ, সেও যখন ক্রমাগত হয়ে উঠেছে পশ্চিমি বা ইঙ্গমার্কিন সভ্যতার আউটপোস্ট, বা কলোনি? ভিন্নতার বৈচিত্র ঘুচিয়ে সকল স্থান যখন একায়তন হয়ে উঠেছে? বৈচিত্রেই বনে ওঠে আর একটা বস্তু, বা সত্তা। নানা জন, নানা স্থান নানারকমের— এই বৈচিত্রেই সৃষ্টি হয় Strangeness, এবং তার রোমাঞ্চ।

সে আজ কোথায়? আদিম অন্ধকার লোকবলয়ের দেশেও আদিম বা অন্ধকার কিছু নেই, লোকেও আজ গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী নয়, রাষ্ট্র-নাগরিক। যত দূর বা দুর্গম দেশই হোক, যাওয়া-আসার কোনও অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। একই ধারার হোটেল, খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা। একই ধারার সুপার-মল, একই ভাষা। ইংরেজি আজ কেবল ভারতের নয়, দুনিয়ারই *lingua franca*।

জনবিস্ফার হয়নি তখনও। রেল কোম্পানি পুজোর ছুটিতে কনসেশন টিকিট বিক্রি করতেন। দলে দলে বাঙালিসন্তান বেরিয়ে পড়ত পশ্চিমে। সে চারদিন সাতদিনের Compact ট্যুর নয়, রয়ে বসে, ভালো লাগলে কোথাও কিছুদিন হাওয়াবদলেরও ব্যবস্থা করে থেকে আসা। আজ কতদিন আগে ঘোরবার প্ল্যান, টিকিট করা, ঘর বুকিং— এত করেও কোথায় তাঁদের যাওয়া? আর একটা একই নিজের শহরে। যাঁরা বৈচিত্র টিকিয়ে রেখেছেন। নিম্নবিত্ত। তাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় না।

কেন লিখি

গত সংখ্যায় লিখেছেন

- মণীন্দ্র গুপ্ত
- শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
- সরল দে
- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- দেবেশ রায়
- বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এই সংখ্যায়

- বাণী বসু
- কালীকৃষ্ণ গুহ
- সাধন চট্টোপাধ্যায়
- শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

কেন লিখি

বাণী বসু

(জন্ম: ১৯৪০)

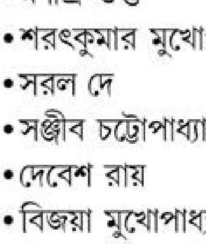

অনেকে এ ভাবে বলেন— লেখার ভূত চাপল, কিম্বা আঁকার ভূত চেপেছিল। ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ এ রকম নয়। কাউকে যদি টানতেই হয় তো ভূতকে নয়, ভগবানকে টানা উচিত সে তিনি জিন হোন, বা কোনও বিশেষ গ্র্যান্ড হোন, বা কোনো কণা। অনেকে বিশেষ ক্ষমতা আর ইচ্ছে নিয়ে জন্মান। লেখার ক্ষমতা, আঁকার বা গড়ার ক্ষমতা, গাইবার ক্ষমতা, অঙ্ক বা বিজ্ঞান বিষয়ক ক্ষমতা। এ গুলো ভূত নয়, ঘাড়ে চাপে না। জন্মসূত্রে পাওয়া ঈশ্বরদত্ত, যা বলেন। ক্ষমতাটার সঙ্গে ইচ্ছেটাকে মিলতে হয়, তবেই শেষ পর্যন্ত একজন লেখক বা শিল্পী বা বিজ্ঞান-প্রতিভার জন্ম হয়। কেন না, ইচ্ছেটা না থাকলে চর্চা হয় না, লেগে থাকার ধৈর্য থাকে না। এ রকম বহু মানুষ আছেন, তেমন জোরদার ইচ্ছের অভাবে যাঁদের পথ বেঁকে গেল, যা হওয়ার কথা ছিল কোনওদিনই আর তা হওয়া হয়ে উঠল না।

নিজের কথা বকবক করতে আমার একদম ভালো লাগে না। তবু যখন এত করে শুনতে চাইছেন তখন বলি। ছোটবেলা থেকেই আমার প্রধান কাজ ছিল গল্পের বই পড়া। গল্পের বই মানে শুধু গল্প নয়, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি যা কিছু সাহিত্য পদবাচ্য সব। পড়তে পড়তে অন্য জগতে চলে যেতুম, কোথায় আছি, কখন আছি, সমস্ত স্থানকাল বিস্মরণ হয়ে যেত। আর ভেতরটা কেমন লিখিলিখি করত। জীবন ছিল খুব গণ্ডিবদ্ধ। তবু নিজেদের বড় পরিবার, আত্মীয়স্বজন পাড়া, বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে নেহাত কম মানুষ তো দেখিনি! তারা সবাই ছিল এক একটা রহস্যগল্প, তাদের জীবনের ঘটনাগুলো এক একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার, যতটা বাস্তব তার চেয়ে বেশি কল্পনা দিয়ে গড়া। বেশ পাকাও ছিলুম, মানুষগুলোকে পড়ে ফেলতে চাইতুম, পারতুমও খানিকটা। এ ছাড়া, কে কেমন ভাবে লেখেন সেটার দিকে মন চলে যেত। বিভূতিভূষণ আর অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন আমার খুব প্রিয় লেখক। এঁদের খুব অনুকরণ করতুম। রবীন্দ্রনাথকে কখনও নয়। কেন জানি না। হয় তো আমার আত্মপুরুষ আধুনিকতর হতে চেয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু... এঁরা বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু আমার ভেতরে বসে যাচ্ছিলেন। নিজের অজান্তেই তাঁর লেখার স্টাইল আমাকে প্রভাবান্বিত করছিল। কবিতা লেখার খেলা কত সকাল সকাল শুরু হয়েছিল বলতে পারব না। একটা পত্রিকা বার করতুম আমি আর আমার ওপরের দিদি, আশ মিটিয়ে লিখে নিতুম সেখানে। আমাদের ছোড়দি, গৌরী যেমন জ্যোতিষ্ক ছাত্রী ছিলেন তেমনি ছিলেন লেখক। দিদির কবিতা, প্রবন্ধ লেখা, আমাদের জন্য পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ এই সবের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি। লেখক ছাড়া আর কী-ই বা হবার ছিল আমার। কে হতে চেয়েছিল অধ্যাপক? দিনের পর দিন ক্লাসে গিয়ে একই জিনিস পড়ানো। আমি তো একেবারেই চাইনি। ভেবেছিলুম সাব-এডিটর হয়ে সাহিত্য পত্রিকায় চাকরি করব, লেখার একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাব। হা হতোস্মি। মেয়েদের তখন কাগজের অফিসে নিতই না। সে-ই পড়াতে ঢুকতে হল। তারপরে দেখলুম, সাহিত্য পড়ানোটাও তো লেখার কাছাকাছি একটা কাজ। ব্যাখ্যা করছি, পুনঃসৃজন করছি। ভালোই উপভোগ করতে লাগলুম পড়ানোটা, বিশেষ করে ছাত্রীদের বা সহকর্মীদের সঙ্গটা।

এই এতটা সময় কিন্তু তেমন কিছু লিখিনি। লিখতুম, ছিঁড়ে ফেলে দিতুম, হয় তো হেলায় পড়ে থাকত ডায়েরির পাতায়, যা চলে যেত বাজে কাগজের ঝুড়িতে। নিজেরই পছন্দ হত না, শেষ করবার ধৈর্য থাকত না। অথচ মাথায় মাঝরাত্তিরে বিদ্যুৎ, উঠে বসে দু'চার লাইন লিখে ফেললুম, বা লয় পেয়ে যেতে দিলুম। আমি জানতুম, আমি এই রকমই থেকে যাব, এক হারানো ছড়ানো আধা খ্যাঁচড়া লেখক। বাইশ পঁচিশটা উপন্যাস, একশর অধিক ছোটগল্প, ডজন দুয়েক অন্তত বড় গল্প লিখে ফেলব, কল্পনাও করিনি।

লেখা গজগজ করছে মগজের মধ্যে, সন্ধের ছাতে হু হু হাওয়ার মধ্যে বেড়াচ্ছি, আর সেইসব লেখা তোলপাড় করছে মাথা। যেখানে যা দেখেছি, তার মধ্যে যা কিছু মজাদার, দুঃখময়, আনন্দময়, প্রতিবাদের যোগ্য সব কিছুই মনের মধ্যে ঢেউ তুলতো, সেগুলো নিয়ে মাথার মধ্যে লোফালুফি খেলা চলছে। তারপর খেলা শেষ, তখন নীচে নেমে এসে প্রতিদিনের কাজে লেগে যেতুম, ওই সব ভাবনা, চরিত্র, এ সব লিপিবদ্ধ করবার আর ইচ্ছেও থাকত না, সময়ও না। স্বভাবে লেখক, কিন্তু ভীষণ অধৈর্য, কুঁড়ে মানুষ একটা। কিছুই আমার লিখে ফেলার নাই মানা, কিন্তু মনে মনে। এখনও তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ লেখক হতে পারিনি। কেউ চাইলে, তবেই আমি মাথার মধ্যেকার লেখাটাকে নামাই।

তারপর অনেকগুলো ঘটনা ঘটল। তার মধ্যে কিছু ঠেস ছিল, কিছু বিদ্রুপ, বেশ কিছু শাণিত চ্যালেঞ্জ। ভেতরের লেখাগুলো বলতে থাকল, আমাদের প্রকাশ করছো না কেন? এ কী? তোমার না হয় অ্যাম্বিশন নেই, আমাদের কিন্তু লোভসভায় স্পিকার হবার ইচ্ছে জাগছে। কেন বিপ্লব মেয়েদের আত্মত্যাগকে নেহাত তার প্রাপ্য বলে মেনে নেবে? জীবন কী? যাকে বহু বাসনায় প্রাণপণে চেয়ে আজ গড়পড়তা হয়ে গেছি, নাকি সেই না পাওয়া যা আজও আমাকে নতুন নতুনতর দিগন্তের দিকে ধাবিত করে? একটা মানুষ কখন জ্যান্তে মরে যায়, কখনওই বা তার উজ্জীবন ঘটে? যেসব বয়স্কমানুষ তাঁদের পুরো জীবনটা দিয়ে আমাদের জীবনটা গড়ে দিলেন, তাঁদের নিয়ে আমরা কী করি? এমনকী চিনি কি তাঁদের? তাঁরা বোধহয় থেকে যান ইনকগনিটো। মা নয়, বাবা নয়, নেহাতই বালবিধবা পিসিমা। এই রকম নানান কথা নিয়ে গল্পরা হানা দিতে থাকল, তাদের পাঠিয়ে দিলুম আমার পছন্দের পত্রিকায়, সেগুলো সাদরে ছাপা হতে থাকল। তারপরে এল উপন্যাসরা, এসে আমার সেই প্রথম প্রেম ছোটগল্পকে গিলে নিতে থাকল।

একটা মজার ঘটনা বলি। দু-তিন বছর কলেজে পড়ানো হয়ে গেছে, ড. ভবতোষ

> কত লেখা মকশো করেছি, ভেতরে দেশের প্রতি মানুষের প্রতি মূল্যবোধের প্রতি এক অনপনেয় দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা ছিল।

চ্যাটার্জির কাছে গেছি পি. এইচ. ডি. করব বলে। অনেক আলোচনা হল ওঁর সঙ্গে, তখনও বিষয় নিয়েই ভাবনাচিন্তা চলছে, হঠাৎ উনি বললেন— তোমার হাতটা দেখি! আমি দু'-হাত পেতে দিয়েছি অমনি। ভবিষ্যৎ জানতে কার না ইচ্ছে করে? এ তো একটা ছেলেভুলোনো খেলাও বটে! তা, উনি অবাক হয়ে বললেন— তুমি তো দেখছি লেখক হবে! লেখকরা যা লেখেন, স্কলাররা তাই নিয়ে গবেষণা করেন। তুমি যদি লেখকই হতে পারো, তা হলে মিছিমিছি থিসিস লিখে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন?

আমি যা বোঝার বুঝে নিলুম। উনি যে কারণেই হোক, আমার গাইড হতে রাজি নন। গবেষক হিসেবে হয় তো আমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি। দূর, আর আমার থিসিস লিখে কাজ নেই।

তা এখন তো দেখছি, উনি ঠিকই বলেছিলেন!

যদি বলি— উনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে আমি লিখতে শুরু করলুম— ভুল হবে।

যদি বলি— অনেক কিছু বলার আছে আমার, সমাজকে, দেশকে, মানুষকে, তাই লিখি।— কাছাকাছি যাবে হয় তো, তবু পূর্ণ সত্যটা ধরা পড়বে না। এত কিছু বলার থাকলে তো বক্তৃতা দিলেই পারতুম, বেশ এক সিরিজ বক্তৃতা!

ক্ষমতা ছিল, ইচ্ছে ছিল, প্রস্তুতিটাও ধীরে ধীরে, জান্তে অজান্তে হয়ে যাচ্ছিল। অনুবাদ করেছি, কত লেখা মকশো করেছি, ভেতরে দেশের প্রতি মানুষের প্রতি মূল্যবোধের প্রতি এক অনপনেয় দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা ছিল। যখন সঠিক পরিস্থিতি এল, ভেতর থেকে তাগিদ এল, হয় তো বা সময়, এরা সব আমায় দিয়ে লেখাগুলো লিখিয়ে নিল— উত্তরসাধক, পঞ্চমপুরুষ, অন্তর্ঘাত, অমৃতা, ঝড়ের খেয়া, মৈত্রেয় জাতক...। কেন যে লিখি তার পিছনে হাজার একটা কারণ আছে। আবার একভাবে দেখতে গেলে ওই ক্লিক করে যাওয়া ছাড়া আর কোনও কারণ নেই। পুরো ব্যাপারটাই খুব সহজ, আবার বড়ই জটিল, স্টেপে স্টেপে একটা অঙ্কের সহসা মিলে যাওয়া।

চিরজীবন শূন্য খোঁজা

কালীকৃষ্ণ গুহ

(জন্ম: ১৯৪৩)

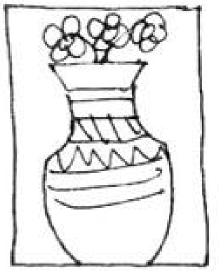

কেন লিখি, এই প্রশ্নের উত্তর একজন লেখককে বারবার দিতে হয়। এ যেন বারবার একটি ভর্ৎসনার মুখোমুখি হওয়া। লেখকও উত্তরে একটি ভর্ৎসনা ছুড়ে দেন প্রশ্নকারীর প্রতি, এই উত্তরটি লিখে, 'না-লিখে পারি না, তাই লিখি।'

বস্তুত 'কেন লিখি' এই প্রশ্নের কোনও উত্তর কোনও লেখকের জানা নেই। জানা আছে ওপরে উদ্ধৃত ওই উত্তরটি, ওই নির্বোধ অহংতাড়িত আপ্তবাক্যটি।

এই প্রশ্নটির সূত্র ধরে অনেক পথপরিক্রমা অবশ্যই সম্ভব। পুরো একটি জীবনকাহিনি বলে ফেলা সম্ভব বা, সম্ভব, একটি জেন গল্প বলে একটি প্রতীকী শূন্যতায় দাঁড়ানো। প্রয়াত কবি বীতশোক ভট্টাচার্যর বলা একটি জেন গল্প শোনা যায় এই সূত্রে:

বুদ্ধশিষ্য সুভূতি। সুভূতি শূন্যতার বোধ অর্জন করেছেন। একদিন সুভূতি শূন্যতায় স্বমহিম হয়ে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। তাঁর ওপর পুষ্প বর্ষিত হতে থাকল। দেবতারা অনুচ্চারে বললেন, 'আপনার শূন্যতাসূত্রকে অভিনন্দন জানালাম।' সুভূতি বললেন, 'আমি শূন্যতাসূত্রতো আলোচনা করিনি।' দেবতারা উত্তর দিলেন, 'আপনি শূন্যতা আলোচনা করেননি। আমরাও শূন্যতা শুনিনি। এই হল সত্যকারের শূন্যতা।' আবার সুভূতির ওপর পুষ্প-বৃষ্টি হল।

বস্তুত প্রত্যেক মনই শূন্যতায় স্থাপিত। এই মনকে জানতে হলে শূন্যতাকে জানার বাসনা তৈরি হয়। এই বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য মনকে জানা, নিরন্তর গড়ে উঠতে থাকা মনকে নিরন্তর জানার চেষ্টা করা। এই চেষ্টাই নিহিত থাকে লেখার মধ্যে। শুধু লেখার মধ্যেই নয়, সমস্ত রকম বাক্যালাপে সৃজনকর্মে সংগীতরচনায় বা পরিবেশনায়, এমনকী ঈশ্বর

সাধনায়ও নিহিত থাকে এই চেষ্টা— মনকে জানার চেষ্টা, যে মন শূন্যতায় স্থাপিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'চিরজীবন শূন্য খোঁজা।' এই শূন্য-খোঁজাই লেখা। 'হায় রে।' এই টুকুই বর্তমান লেখকের বলবার কথা। আশা করি পাঠক এই অনুকথন গ্রহণ করবেন, অন্যথায় মার্জনা করবেন।

কেন লিখি

সাধন চট্টোপাধ্যায়

(জন্ম: ১৯৪৪)

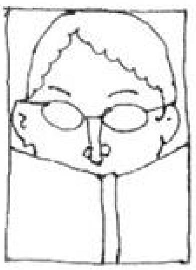

'কেন লিখি' প্রশ্নের মুখোমুখি বলব, একটি শব্দে, একটি বাক্যে এর উত্তর নেই। কারণ প্রসঙ্গটি বিষয়ী নির্ভব— চলতি কথায় বলা চলে Subjective. চারপাশে নিয়ত আমার দু'ধরনের সত্যর মুখোমুখি হই, বিষয়ী নির্ভর সত্য ও বিষয় নির্ভর সত্য। Objective এবং Subjective. যদি জানতে চাওয়া হয়, গরমে দিন দীর্ঘ এবং শীতে রাত লম্বা কেন হয়— উত্তর স্পষ্ট। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণ দর্শিয়ে, ভূগোলের প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন যে-কোনও মানুষ কারণটি বলে দিতে পারবে। মানুষে-মানুষে বোধ-রুচি-উপলব্ধি ভেদে এর উত্তরের কোনও তারতম্য ঘটবে না। চলতি ধারণায় একে বলি আমরা বিষয় নির্ভর সত্য— Objective Truth. কিন্তু দুঃখ কি? সুখ কাকে বলে? কেন এ কর্তব্যটি আমি করি? তাঁরা ওটা করেন না কেন? উত্তরগুলো উত্তরদাতার ওপর বর্তে যায়। তার অভিজ্ঞতা, রুচি, বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি ভেদে মানুষে মানুষে উত্তর নানা কৌণিক ভঙ্গিতে বদলে যাবে। স্থির কোনও নির্দিষ্ট সত্য থাকে না। বলি Subjective Truth. আমার 'কেন লিখি' উপলব্ধিটুকু তাই বিষয়ী নির্ভর অনেক ভাঙা-গড়া ভাবনার পথ ধরে ইদানীং একটা আকার-আয়তন লাভ করে কিছুটা কেলাসিত ভাবে দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে, আজকের ভাবনাটিও যে যথাযথ রূপে থাকবে— বলি কী করে? বয়সের কোনও স্তরে পৌঁছলেই উপলব্ধি চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় না। চেতনা একটি সজীব পদার্থ— দেশ কালের বদলের সঙ্গে ক্রমাগত চূড়ান্তকে ছাড়িয়ে গিয়ে নতুন নতুন চূড়ান্ত তৈরি করে। 'কেন লিখি' বলতে গিয়ে আমার চেতনার সেই চূড়ান্ত একটা অস্পষ্ট আদল গড়ে দিতে পারি।

খুবই প্রস্তুতিহীন, আঁকাড়া অবস্থায় সাহিত্য

> 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়ে মানিকবাবুর প্রভাব-প্লাবনে খড়কুটোর মতো আমার সকল অহং ও সত্তা গেল ভেসে ভুসে। তীব্র, তীক্ষ্ণ বাঁকা একটি পোড়া চোখ তৈরি হয়ে গেল।

স্রোতে নেমে পড়েছিলাম। বিজ্ঞানের ছাত্র, স্বপ্নেও থাকত বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা বা ওই ধরনের রাস্তায় নিজেকে নিয়োজিত করা। পারিবারিক দায় ঘাড়ে তুলতে যে মাঝপথে কোথাও বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে হবে ভাবিনি। তবু স্বপ্ন মরতে চায় না। বিজ্ঞান সংক্রান্ত খোঁজখবর, বই পড়া নিজের মধ্যে একটু আধটু চর্চা বজায় রাখা— চলছিলই। ছেটবেলা থেকেই সাধারণের চাইতে একটু অধিক মাত্রায় পড়ুয়া ছিলাম। তো, এক গ্রীষ্মবকাশের লম্বা সময় কাটাতে লাইব্রেরিতে গিয়েছি বিকালের বই তুলতে। গ্রন্থাগারিক আমার মনোমতো বই হাতের কাছে না পেয়ে, ঢাউস একটা বই গছিয়ে বলেছিলেন, নিয়ে গিয়ে পড়ুন। দেখছি আপনার বই খুঁজে পাই কিনা। বাড়ি ফিরে দেখলাম, উপন্যাসটির নাম 'সাহেব বিবি গোলাম', লেখক বিমল মিত্র। হাজারো অনিচ্ছায় পড়ব-কি-পড়ব না করতে করতে শেষ করে ফেললাম। মনের মধ্যে কে যেন বাজিয়ে দিল, এ-লেখা আমিও লিখতে পারব। আশ্চর্য! এতদিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা ১৮০° ঘুরে গেল। পুরাতন ইচ্ছার সব কিছু ঝেড়েমুছে কাঁচা ও নড়বড়ে হাতে গল্প লিখতে লাগলাম। মনের মধ্যে যা যা আসে! ভূত-রহস্য-চোখে দেখা চরিত্র— সব কিছুই নিয়েই গদ্য রচনা। আবাসিক স্যুভেনিয়রে প্রথম ছাপা নামটি দেখে মুগ্ধ হলাম। ভেতরে ভেতরে খ্যাতনামা লেখকদের সামাজিক সম্মান ও গৌরবের ছ'টার জন্য মনটা লুব্ধ হতে থাকল। আর অযোগ্য লোভ মানুষকে অন্ধ ও উদ্ধত বানায়। বিমল মিত্রের আরও দু-চারটে বই পড়া শেষ হল। বার বার মনে জাগছিল, আমি কমতি কিসে? পাঠক আমাকে লুফে নিচ্ছে না কেন! ফুটে উঠতে থাকেন অহংমন্যতা।

এ অবস্থায় কয়েক বছর পর অকস্মাৎ আমার হাতে এল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। এক বিকেলে টানা পড়ে শেষ করলাম। সত্যি বলতে কি, ভেতরে ভেতরে ভূমিকম্প ঘটে গেল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা তখনও আমার মধ্যে জন্মায়নি। স্কুল-ছাত্রাবস্থায় 'যুগান্তর' পত্রিকার একটি সংবাদ স্মৃতি কুয়াশা ভেদ করে উঁকি দিতে থাকল। মানিকবাবুর পরলোকগমন ও খাটিয়ায় মৃত লেখকের ছবিটি! এর বেশি কিছুই জানা ছিল না আমার। 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়ে মানিকবাবুর প্রভাব-প্লাবনে খড়কুটোর মতো আমার সকল অহং ও সত্তা গেল ভেসে ভুসে। যেখানে যা পাই লেখকের, গো-গ্রাসে অন্ধের মতো গিলে চলেছি। সমগ্র মানিক সাহিত্যের প্রায় বারো আনাই দ্রুত পড়ে ফেললাম। তীব্র, তীক্ষ্ণ বাঁকা একটি পোড়া চোখ তৈরি হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ভাষা-ভঙ্গি উপমা থেকে লেখকের জীবনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কিছু কল্পকাহিনিও আমাকে আন্দোলিত করল। ভাবলাম, সাহিত্য মানেই শোষণ-বঞ্চনা-অসুন্দর ও প্রতিবাদের মূল উপপাদ্যকে তুলে ধরা। কোনও গল্পপাঠের আসরে কোনও শ্রোতা যদি মন্তব্য করত, কিছুটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো, তো শ্লাঘা বোধ করতাম। এ পর্যায়ের গল্পগুলো পরে আমি বাতিল করে দিয়েছি। মনে হয়েছিল, যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হুবহু লিখি, জগতে দুটো মানুষের কী দরকার ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একজনই যথেষ্ট। তাঁর ছাঁচের কী দরকার? একটু একটু করে উপলব্ধি হল, লেখালিখির জগতে নিজস্বতা প্রয়োজন। তখন থেকেই নিজেকে সব কিছুর ধোয়া মোছা সাফসুতোর করে, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও স্টাইল অর্জনের জন্য বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় ফুঁ দিলাম। অভিভাবকস্থানীয় কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিগবেষক অরুণকুমার রায় এবং বিশিষ্ট কলাসমালোচক অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্য— দু'জনের কথা মনে পড়ছে) তালিকা তৈরি করে রুশ, ফরাসি ও আমেরিকার সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করেছিলেন। ওই আমার প্রকৃত চক্ষুউন্মোচন। তখন সত্তরের দশকের বজ্র নির্ঘোষে পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে, 'কেন লিখি' ভাবনায় মন বলল, যেহেতু সরাসরি বন্দুক হাতে সমাজ বদলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি লেখার মধ্য দিয়ে সমাজে বিপ্লব আনব। পরিচিত তরুণ কিছু কবি, সাহিত্যিক সরাসরি আন্দোলনে নামল, জেলে গেল, কেউ কেউ পুলিশের গুলিতে মারাও গেল। বজ্রনির্ঘোষ কিছুটা স্তিমিত, পথভ্রষ্ট। এল ইমার্জেন্সি। তখন 'কেন লিখি' ভাবতে গিয়ে উপলব্ধি হয়েছে, লেখালেখি ধরে

বিপ্লব হয় না। লেখকের দায় মানস-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যাতে সহজেই রাজনীতিবিদ্‌রা কাঙ্ক্ষিত পথে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে। গাছের যেমন গভীর শেকড়, মানুষও চিন্তা চেতনা, ঐতিহ্যের গভীর শেকড় নিয়ে বর্তমানে চলাফেরা করে। সাহিত্যের কাজ সেই শেকড়ের সন্ধান। দেশের ইমার্জেন্সি পর্বে শিখেছিলাম, সোজা ঝাড়াসাপ্টা ভাষার ভঙ্গির বাইরেও লেখককে জানতে হয় কীভাবে চিহ্ন, প্রতীকের মধ্য দিয়ে আড়ালে কথা বলার কায়দা ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ আমার লেখকজীবনে জরুরি হয়ে উঠলেন। বলতে লজ্জা নেই, লিখতে শুরু করার কয়েক দশক অবধি রবীন্দ্রনাথ প্রায় অনাবিষ্কৃতই ছিল। নতুন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, আমি তাঁর নাটক, উপন্যাস, গল্প এবং অন্যান্য লেখালেখির চৌদ্দ আনাই শেষ করে ফেললাম। টের পেলাম লেখালেখির পিছনে সুগভীর একটি ইতিহাসবোধ আয়ত্ত করা দরকার। 'কেন লিখি'-র নানা মাত্রা একের পর এক খুলতে শুরু করল। ১৯৮৬ সালটা ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫তম বছর। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ উপলক্ষে সুলভে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করল। আমার হাতে চলে এল সব ক'টি খণ্ড (যদিও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করতে বেশ কিছু সময় নিয়েছিল)। কবির কাছ থেকেই শিখলাম, যা ঘটে সেটাই শুধু ইতিহাস নয়, যা যা ঘটবার সম্ভাবনা— সবটাই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, কোনও কিছুর খণ্ডতা নয়, পূর্ণতার সন্ধান স্রষ্টার থাকা দরকার— এ বোধ ধীরে ধীরে আমাকে আবিষ্ট করল। আমার সাহিত্য জীবনের বেশ কিছু পর্ব জুড়ে আখ্যানে টের পাওয়া যেত, শিল্পী হিসেবে আমি কোন দিকে ঝুঁকে আছি। ক্রমে, ব্যক্তি পছন্দ-অপছন্দের ভারটি গুটিয়ে নিয়ে, অনেক বেশি নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ অবস্থানে ঝুঁকতে থাকলাম। টলস্টয় কোথায় যেন বলেছিলেন, তিনিই বড় শিল্পী যে নিজেকে যতটা আড়ালে রাখতে জানেন। বা এঙ্গেলস একবার মিনা কাউট্‌স্কিকে লিখেছিলেন, কম বলাটাই লেখকের উৎকর্ষ। এ সব মন্তব্য আমার আগেও জানা ছিল। কিন্তু কোনও কিছু জানা থাকলেই চলে না, উপলব্ধির পর্দাটা সরে গিয়ে একটা বোধ জন্মাতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিবিড়ভাবে গ্রহণের মধ্য দিয়ে, এ-ভাবেই আমার বহু পুরনো জানা, স্তর ভেদ করে নতুন নতুন বোধে রূপান্তরিত হল।

আমার স্বভাবে কোনও সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভ্যেস নেই। কোনও কিছুকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে দ্বিধাবোধ করি। সামান্য ক্ষিপ্রতা ও সংশয় আমার সাফল্য-ব্যর্থতায় সর্বদা খেলা করে বেড়ায়। তাই কোনও একটা বিশেষ কায়দায় বা ঢংয়ে গল্প লিখে হাততালি-প্রশংসা জোটার পর, নিজেকে নতুন করে ভাষার জন্য আকুল হয়ে উঠি। এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ গল্প লিখেছি— কখনই শৈলী বা বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করিনি। গ্যাঁটের কড়ি হিসেবে সাফল্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে ক্লান্ত বোধ হয়। নব নব রাস্তায়, নিজেকে বদলাবার মধ্য দিয়ে যেটুকু স্বীকৃতি আসে— তাই-ই আমার পাথেয়।

কেন লিখি-র ভাবনা এরই মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকে। অপ্রস্তুত ও আঁকাড়া অবস্থায় যাত্রাশুরুর পর্বটুকুকে ছেঁটে ফেললে, আমি কিন্তু নানা পর্যায়ে ভেবেছি, সাহিত্য কর্মের একটি সামাজিক উপযোগিতা আছে, গল্প-উপন্যাস লেখাটা নিছক পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য নয় বা কেউকেটা হয়ে প্রচুর বিত্ত-বৈভব সৃষ্টিও হতে পারে না। এর বাইরে বৃহত্তর একটা কিছু আছে। এই 'একটা কিছুর' পিছনে আমি বহু ঘাটের জল খেয়েছি। আমার শপাঁচেক গল্প (যার পঞ্চাশ ভাগই হারিয়ে গেছে, উদ্ধারের সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, মোট লেখালিখির পনের আনা তিনপয়সাই আমি লিটল ম্যাগাজিনে দিয়েছি। মফঃস্বল, গ্রামগঞ্জ এবং শহর— অতি ক্ষণজীবী পত্রিকার আহ্বানেও আমি সাড়া দিই। এমনও হয়েছে একটি সংখ্যার বেশি বেরোয়নি, তেমন পত্রিকাকেও গল্প দিয়েছি।) এবং 'অগ্নিদগ্ধ' থেকে সাম্প্রতিক 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে', 'অ্যান্থনি কুইনের ছাতা' বা 'দিন আনে দিন খায়' এর মতো গোটা কুড়ি উপন্যাসে আমার নানা চিন্তার ঘাটে জল খাওয়ার চিহ্ন সূচিত।

আজ আমার 'কেন লিখি' ভাবনাটি অনেক বেশি কেলাসিত। বা কাঁকড়-মাটি মেশা ঘোলা জল যেমন ধীরে ধীরে থিতিয়ে যায় প্রস্রবনের মধ্য দিয়ে, আজ বিশ্বাস করি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি লেখালিখির মধ্য দিয়ে বদলায় না। রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে বিপুল যে সমাজজীবন চলছে, তাদের মোটা অংশই কোনও রকম নিয়মিত গ্রন্থ পাঠ ছাড়া দিব্যি জীবন কাটাচ্ছে। তাহলে কি 'কেন লিখি' বলতে বোঝায় সমাজে অতি সংখ্যালঘু অংশের রসচর্চা ও সে-সুবাদে ব্যক্তি হিসেবে প্রচারের আলোতে থাকা?

আমার মনে হয়, ভাষার বিবর্তনে ক্রমাগত যে পরিবর্তনের খেলা চলছে, আমাদের লেখালেখি তাতে নিয়ত কিছু অবদান রেখে যাচ্ছে। ভাষার বিবর্তন আমাদের আবেগের এক ধরনের স্বাধীনতার যোগান দিচ্ছে, যা না হলে আমরা ইঁদুরের মতো অস্বস্তিকর কোনও খাঁচায় ধরা পড়তাম। ইঁদুর যদি কোনও দিন ধরা না পড়ত, খাঁচার যন্ত্রণা টের পেত না। কোনও ভাষা যখন স্রোত হারায় বা মরে, তখনই সেই ভাষাভাষীরা টের পায় কত অসহায় ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে তারা। দাঁত থাকতে যেমন দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না, সাহিত্য আজও সমাজে সৃষ্টি হয়ে চলেছে বলে টের পাওয়া যাচ্ছে না কেন লেখা হচ্ছে। আর এটাও সত্য, সাহিত্যপাঠ না করলে জীবন যে অশিষ্ট ও অসুন্দর হয়— তা আমরা ইদানীং পথে-ঘাটে সমাজের সর্বত্র ঘুরতে ফিরতে টের পাচ্ছি। সাহিত্যপাঠ নাকি সামাজিক উৎপাদনেও অগ্রগতি আনে। এ-সব তো পণ্ডিতদের গবেষণা। কল্পনা ও আবেগ সকলেরই কমবেশি আছে। পাঠের মধ্য দিয়েই একমাত্র, তা স্ফীত হতে পারে, মোচন ঘটতে পারে। মনের বিকাশ ঘটে। অপ্রত্যক্ষ ভাবে লেখালিখি মানুষের প্রয়োজন মেটায় এ ভাবে। চট করে তা চোখে পড়ে না, মাপা যায় না। বর্তমান সমাজে লেখালিখি এত অনাদৃত ও মিডিয়াবঞ্চিত হয়ে যে বেঁচে আছে, প্রধান কারণ এর প্রকৃতিগত উপযোগিতা।

লেখালিখির এই পর্বে এসে এখন 'কেন লিখি' সম্পর্কে আমার ধারণা কী? এখন একসপ্তাহ কিছু না লিখলে, একটি ছত্রও না পড়লে আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। নানা ধরনের ছোটখাটো মনোবিকলন ঘটে। লিখবার শ্রম গ্রহণ করলে, ফের স্বাভাবিক তাজা সুস্থ বোধ হয়।

আমি খাঁচার ইঁদুর হতে চাই না বলেই লিখে চলেছি।

কেন লিখি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

(জন্ম: ১৯৪৭)

'কেন লিখি' শিরোনামটার মধ্যে কোনও প্রশ্নচিহ্ন নেই, অর্থাৎ কথাটা সাজানো হচ্ছে না এভাবে— 'কেন লিখি'? তাহলে দাঁড়াত নিজের কাছেই জানতে চাইছি, কেন লিখি? যেভাবে শিরোনামটা আছে তাতে পাঠক ও সমাজের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে লিখি বা যা লিখি তা কেন লিখি। আমি 'কেন লিখি?' বা 'কেন লিখি' এর কোনওটি থেকেই অব্যাহতি পেতে চাইব না।

প্রথমত, কেন লিখি? লেখা শুরু করেছিলাম, সত্যি বলতে কী, নিজের ছেলেবেলা ও পিতৃস্মৃতিকে সম্মান জানানোর জন্য। বাল্য কৈশোরে দেশি বিদেশি যাঁরেদ লেখা পড়ে পাগল হয়ে যেতাম, নাওয়া-খাওয়া ভুলতাম তাঁদের জন্য এমন একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল যে ওই ক্লাবে নাম লেখানোর জন্য একটা অদ্ভুত বাসনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অথচ জ্ঞান নেই যে, কী করে কেউ লেখে, কী করে তা ছাপা হয়, এবং এক সময় কী করে তা

আমার হাতে পৌঁছে যায়।

আরেকটা উস্কানি এল বাবাকে দেখে। ওকালতির ফাইলটাইল ও আইনের বইপত্তরের পাশাপাশি কত যে সাহিত্য দর্শন অঙ্ক ইতিহাস ও রাজনীতির বই তিনি সারাক্ষণ পড়তেন তা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। আমার প্রতি ভীষণ টান ছিল বাবার, সুযোগ খুঁজতেন কাজকর্ম গুটিয়ে কখন বালকপুত্রকে দেশ-দুনিয়ার আশ্চর্য-আশ্চর্য সব গল্প শোনাবেন। অথচ এই বাবাকেই দেখতাম কোনও বইয়ে মশগুল হয়ে গেলে খেয়ালই করছেন না আমি কতবার এসে ঘুরঘুর করে গেলাম ওঁর মস্ত বড় টেবিলটার আশপাশে। ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছি হয়তো, কী পড়ছে এত বাবা? কে লিখেছে? কী লিখেছে?

এরকমই একদিন একটা পাতায় মনে যা এল লিখেলিখে বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, পড়ে দ্যাখো। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী এটা? বলেছিলাম, আমি লিখেছি। বাবা বললেন, ও তাই? তাহলে তো পড়তেই হবে। এরপর বাবা অনেকক্ষণ সেটা মন দিয়ে পড়ার ভান করেছিলেন (সেটা আরও বড় হয়ে বুঝেছিলেন) এবং শেষে বললেন, খুব ভালো। তোমার মনে যা আসে লিখে দেখাবে, আমি পড়ব।

এর কিছুদিন পরই বাবা দেহত্যাগ করেন, ফলে লেখা দেখিয়ে দেখিয়ে ওঁর নজর কাড়ার সুযোগ বিশেষ হয়নি। তবে ওই ক'দিনেই টের পেয়ে গিয়েছিলাম যে লেখার একটা ভালো দাম আছে লোকের কাছে।

ব্যাপারটা একটু ফ্রয়েডীয় শোনাবে, তবু বাল্যের আর একটা ঘটনা সত্য করে না বললে আজকের বলাটাও সত্য হবে না। বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর এক দুপুরে দেখি মা একটা টেবিলে বসে কী-সব লিখছেন। কোনও সাহিত্য-টাহিত্য অবশ্যই নয়, মা নিতান্ত আট-ন ক্লাস অব্দি পড়া নিটোল গৃহবধূ ছিলেন। সামান্য হিসেবটিসেবই লিখছিলেন হয়তো। আমি টেবিলের এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সুন্দরী মা থেকে থেকে কপালের ওপর থেকে বাঁ হাতে চুল সরাচ্ছেন আর কখনও কোনও বানান বা হিসেবের ভুল হলে মা কালীর মতো জিভ বার করে জিভ কাটছেন।

দৃশ্যটা আমি কোনও দিনও ভুলিনি এবং এমনকী এই পরিণত বয়সে স্বপ্নেও দেখেছি। বাবার পড়া দেখে আর মা'র ওই জিভ কেটে কেটে লেখা দেখে কেনই জানি না নিজের মনে যা খুশি লেখার একটা ঝোঁক এসেছিল। পরে বড় হয়ে ছাপার মতো লেখালেখি শুরুর পরেও ওই স্মৃতিগুলো থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আরও অনেক পরে স্যার উইলিয়ম জোন্সকে নিয়ে 'প্রথম পুরুষ' উপন্যাস লিখি যখন তার মূল অনুপ্রেরণা ছিল বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা বাবার ওই মুখছবি।

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধাদি লিখে মা, বাবা, কাকার (ইনিও আমার বই ও গানের প্রেমে পড়ার একটা বন কারণ) স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করি। আর এও দেখি যে পড়াশুনো আর লেখালেখি করলে আমার স্ত্রী ও কন্যার দিক থেকে ভালোবাসা ও সমাদরটা বাড়ে। টাকাকড়ি, লাইফস্টাইল, গাড়িঘোড়া, খ্যাতি-প্রতিপত্তি তো দিতে পারিনি, ওই লেখালিখিটুকুই ওদের কাছে সুখের হয়েছে। এটা যে কত বড় প্রাণের আরাম তা এই বয়েসে এসে আমি প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি।

অতএব দুনিয়া বদলে সব বলে কলম ধরেছি, এমন নয়। ওসব পারিও না। বরং বলব, লেখালিখি দিয়ে আমার আমার নিজস্ব নির্জনতাটাকেই প্রতিপালন করেছি। তাই উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে নিজের স্মৃতির জগৎটাকে আঁকড়ে ধরে থেকেছি। আমার ছেলেবেলার পাড়া, সেই মধ্যকলকাতা, সেই হারিয়ে যাওয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজ, পাড়ার জলসা, মাস্তানি, খুনখারাপি, মাতাল, লোফার, সিধেখাড়া মানুষ, প্রেমপিরিতি, ভালোবাসা, দুঃখকষ্ট, চোখের জল, বড়মানুষি, ছোটলোকোমি, চান ঘরের গান, রোয়াকের টান— এ সব নিয়ে ক্রমাগত লিখে এলাম এতকাল। কোনও বার্তা রাখার জন্য নয়, কোনও কিছু হয়ে ওঠার জন্যও নয়, শুধু নিজের একটা ক্ষুদ্র জগৎকে লক্ষ প্রেক্ষিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে স্মৃতির মতো সুন্দর করে ধরে রাখতে।

আমার কিছু উপন্যাস ও বেশ কিছু গল্প দিয়ে তৈরি হয়েছে '১০নং মিন্টো লেন' বইটি। যখন একই জিনিস নানা আকারে, ইঙ্গিতে, রসে ও রোমাঞ্চে লিখে গেছি দিনের পর দিন তখন খেয়াল করিনি কীরকম অজ্ঞাতসারে আমি আমার প্রিয় জেমস জয়েসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে বাঁধছি এক ছোট্ট ভূগোলে। এক হারিয়ে যাওয়া সময়ের হারিয়ে যাওয়া পল্লির হারিয়ে যাওয়া জীবনের সঙ্গে। সে বইয়ের ভূমিকায় বলেও ছিলাম, এ আমার নিজস্ব 'ইউলিসিস'।

'কেন লিখি' এই শিরোনামের এটাই উত্তর আমার: এ ভাবে লিখে যাওয়াটাই আমার নিয়তি। বানিয়ে বানিয়ে সাত কাণ্ড রামায়ণ লিখতে পারি, কিন্তু সে-ইচ্ছেটাই তো হল না। একেবারে কল্পনাশ্রিত গল্প অনেক লিখেছি, কিন্তু উপন্যাস লেখার সময় বার বার ফিরে গেছি আমার দেখা, চেনা, ভালোবেসে ফেলা বাস্তবে। স্যার উইলিয়ম জোন্স বা ঋষি বাৎস্যায়নকে নিয়ে উপন্যাস করা বাদ দিলে আমার উপন্যাস মানেই কলকাতার একটা বিশেষ জীবন ও এলাকার কীর্তন। ওই এলাকা ছেড়ে কিছু করতে হলে আমাকে আশ্রয় নিতে হয় বইয়ের। যেমন বাৎস্যায়ন ও জোন্সের বেলায়। হালে আমার সেই পাড়া ও সেখানকার মানুষ লোরেন সুইন্টনকে নিয়ে 'ক্যাবারে' নামের একটা উপন্যাস শেষ করে ফের বই ও ছবির আশ্রয় নিয়েছি মহান আর্জেন্টিনীয় লেখক বোর্হেস ও অতুলনীয় ভারতীয় শিল্পী অমৃতা শের-গিলকে নিয়ে উপন্যাস করার জন্য। এই লেখাগুলো আমার ছুটির সময় মধ্যকলকাতার জীবন থেকে। তবে ওই জীবনের পর্যবেক্ষণ গুলোই আমাকে বল জোগায় মানুষ চিনতে, চরিত্র তৈরি করতে, ঘটনার রহস্য বুঝতে। অন্য ভাবে বললে, আমার মধ্যকলকাতার জীবনই বরাবর কাজ করে এল কখনও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কখনও দূরবীক্ষণের। এরপর আর কিছু বলার থাকে?

আর শুধু একটা কথা। এ বছর যে— মহত্তম একজন লেখকের জন্মশতবর্ষ সেই আলব্যের কামুকে আমি ইস্কুলে থাকতে আবিষ্কার করি লাইব্রেরির তাকে, অর্ধশতাব্দী আগে। সাহিত্য কী এবং কী হতে পারে সেই ধারণা করার জন্য গত পঞ্চাশ বছর ধরে ওঁকে পড়েই চলেছি। ফলে 'কেন লিখি' জাতীয় বক্তব্য রাখতে গভীর লজ্জা বোধ করি। 'কেন লিখি' সমস্যাটা 'আমি কে?' গোছের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এর উত্তর জোগানোর কতটুকু অধিকার আছে তাও জানি না, তবে বাবা ও মায়ের স্মৃতিগুলো কীভাবে আমায় লেখায় টেনে এনেছিল বলতে পেরে মনের আরাম পাচ্ছি। আর সেই আরামটুকু বাড়াবার জন্য ফের একবার শরণ নিচ্ছি কামুর একটি প্যারাগ্রাফের যেখানে তিনি অবিস্মরণীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন তিনি কেন, কী করে সাহিত্যশিল্পে এলেন। তাঁর 'দ্য রং সাইড অ্যান্ড দ্য রাইট সাইড' প্রবন্ধ সংকলনের এক জায়গা থেকে তুলে দিচ্ছি:

"... I was placed halfway between poverty and the sun. Poverty kept me from thinking all was well under the sun and in history; the sun taught me that history was not everything. I wanted to change lives, yes, but not the world which I worshipped as divine. I suppose this is how I got started on my present difficult career, innocently stepping onto the tight rope upon which I more painfully forward, unsure of reaching the end. In other words, I became an artist, if it is true that there is no art without refusal or consent."

সৌজন্য: ঋত্বিক ত্রিপাঠী সম্পাদিত *'জ্বলদর্চি'*

জ্বলদর্চি সংগ্রহ করতে চাইলে ঋত্বিককে ফোন করুন: ৯৭৩২৫-৩৪৪৮৪

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

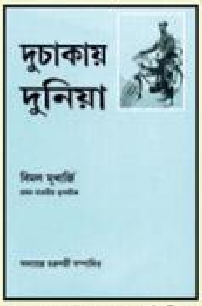

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

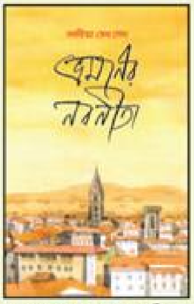

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

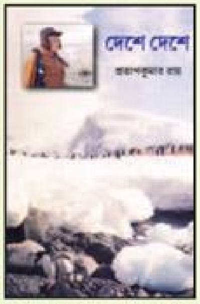

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

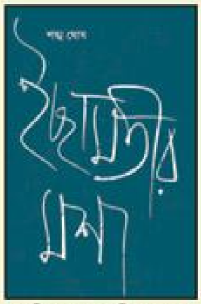

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অনলাইনেও পাবেন: **www.swarnakshar.in**

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড | ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০ **দ্বিতীয় খণ্ড** | ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

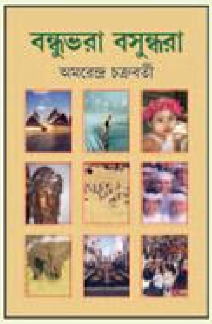

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

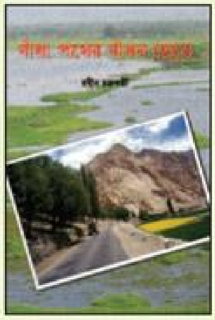

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

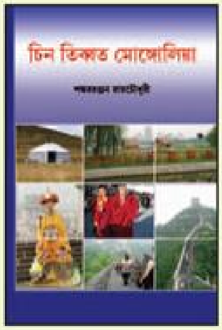

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি

Buy Online ▶ www.swarnakshar.in

তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী

শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী

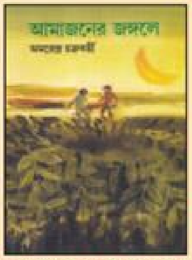
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

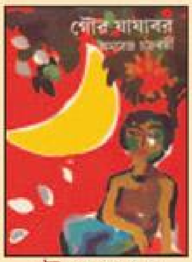
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

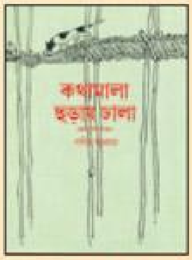
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার

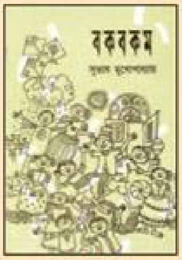
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

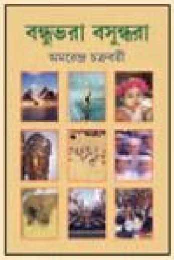
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

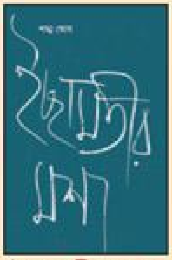
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

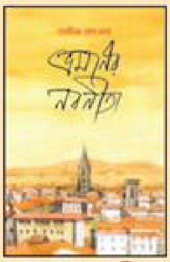
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

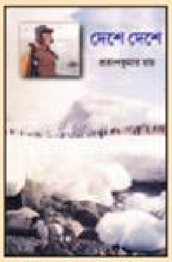
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

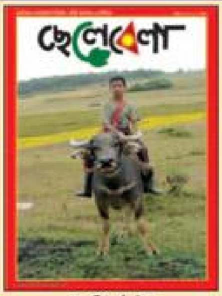
ছেলেবেলা

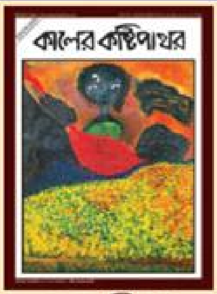
কালের কষ্টিপাথর

পেশাপ্রবেশ

কর্মক্ষেত্র

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 3 No. 1 □ 1 July 2014 □ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069 Postal Regn. No. KOL RMS/460/2014-2016

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

ভ্রমণের স্বপ্নপূরণ

সারা বছর সংগ্রহে রাখার মতো

পুজোর ভ্রমণ গাইড
২০১৪

আপনার প্রানের সখা, পথের সঙ্গী

সারা ভারতের বাছাই করা বেড়াবার জায়গা
সেই সঙ্গে কম খরচে বিদেশ ভ্রমণ

বিপুল ভারত থেকে পছন্দের জায়গা বাছা আর পছন্দসই ভ্রমণকে পরম আনন্দের করে তোলা— এই হল পুজোর ভ্রমণ গাইড।

শুধু মনের মতো জায়গা বেছে নেওয়াই নয়, বেড়াতে যাওয়ার যাবতীয় সুলুকসন্ধান, একেবারে সাম্প্রতিক সব তথ্য-সহ। সঙ্গে অসাধারণ সব ছবি, যা শুধু ভ্রমণ-ই দিতে পারে।

সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে এখনই বলে রাখুন।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে
দাম ৯০ টাকা
সঙ্গে বিনামূল্যে অমূল্য উপহার